রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা ১৬

সূচী

চিত্রসূচী

কবিতা ও গান

গীতাঞ্জলি

বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন
বোলপুর
৩১ শ্রাবণ ১৩১৭

রবীন্দ্রনাথ

গীতাঞ্জলি রচনাকালে

ফোটোগ্রাফ সুপ্রভা রায়ের সৌজন্যে

গীতাঞ্জলি

১

আমার   মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
নিজেরে করিতে গৌরব দান
নিজেরে কেবলি করি অপমান,
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

আমারে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন-মাঝে।
যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরানে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয়পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।

১৩১৩

২

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান—
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।

আমি কখনো-বা ভুলি, কখনো-বা চলি
তোমার পথের লক্ষ্য ধরে;
তুমি নিষ্ঠুর সম্মুখ হতে
যাও যে সরে।
এ যে তব দয়া জানি জানি হায়,
নিতে চাও বলে ফিরাও আমায়,
পূর্ণ করিয়া লবে এ জীবন
তব মিলনেরই যোগ্য করে
আধা-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।

১৩১৩

৩

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চিরজনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর ;
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যেন সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

১৩১৩

৪

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ
এ নহে মোর প্রার্থনা,
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি
নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

১৩১৩

৫

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো উজ্জ্বল করো,
সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো,
অন্তরতর হে।

যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে,
মুক্ত করো হে বন্ধ,
সঞ্চার করো সকল কর্মে
শান্ত তোমার ছন্দ।

চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,
নন্দিত করো হে।
অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।

শিলাইদহ
২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৪

৬

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল-সম ফুটিল পরম হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়প্রান্তে
উদার উষার উদয়-অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪

৭

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে বরনে, এসো গানে।
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে অমৃতময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

এসো নির্মল উজ্জ্বল কান্ত,
এসো সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত,
এসো এসো হে বিচিত্র বিধানে।
এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে ;
এসো সকল-কর্ম-অবসানে।
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ?

৮

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে ;
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা।

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি।
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা

১৩১৩ ?

৯

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই,
টান রে সবাই টান্।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি
যায় যদি যাক প্রাণ।
আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।

কে ডাকে রে পিছন হতে,
কে করে রে মানা,
ভয়ের কথা কে বলে আজ—
ভয় আছে সব জানা।
কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে
সুখের ডাঙায় থাকব বসে ;
পালের রশি ধরব কষি,
চলব গেয়ে গান।
আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।

১৩১৫

১০

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।

চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারি ধন,
কী করবে তা কও।
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস,
এ মোর অহংকার।

১৩১৫ ?

১১

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল
আলো-ঝলমল
বনগিরিপর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল-শিশির-ঢালা।

ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে

ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।

গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা।

শান্তিনিকেতন
৩ ভাদ্র ১৩১৫

১২

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।

ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন—
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
কী মন্ত্র হবে গাওয়া।

শান্তিনিকেতন
৩ ভাদ্র ১৩১৫

১৩

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা-চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।

আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ওই মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ান-ভুলানো এলে।

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।

কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩১৫

১৪

জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণ রূপে।
জননী, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।

তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে ;
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননী, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণ রূপে।

১৩১৫

১৫

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া-মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয়সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

নয়নদুটি মেলিলে কবে
পরান হবে খুশি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব
সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি, এ কথা কবে
জীবন-মাঝে সহজ হবে,
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৬

মেঘের 'পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে,
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।
কাজের দিনে নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে,
আজ আমি যে বসে আছি
তোমারি আশ্বাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

তুমি যদি না দেখা দাও,
কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।
দূরের পানে মেলে আঁখি
কেবল আমি চেয়ে থাকি,

পরান আমার কেঁদে বেড়ায়
দুরন্ত বাতাসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৭

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল রে লিখা—
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।
বিরহানলে প্রদীপখানি জ্বালো।

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি,
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরান মম সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি।
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি।

বিজুলি শুধু ক্ষণিক আভা হানে,
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

জানি না কোথা অনেক দূরে
বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথপানে।
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া,
নিবিড় নিশা নিকষঘন কালো।
পরান দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৮

আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে।
প্রভাত আজি মুদেছে আঁখি,
বাতাস বৃথা যেতেছে ডাকি,
নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি
নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে।

কূজনহীন কাননভূমি,
দুয়ার দেওয়া সকল ঘরে,
একেলা কোন্ পথিক তুমি
পথিকহীন পথের 'পরে।
হে একা সখা, হে প্রিয়তম,
রয়েছে খোলা এ ঘর মম,
সমুখ দিয়ে স্বপনসম
যেয়ো না মোরে হেলায় ঠেলে।

বোলপুর
আষাঢ় ১৩১৬

১৯

আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল,
গেল রে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে
কী ভাবি যে আপন-মনে,
সজল হাওয়া যূথীর বনে
কী কথা যায় কয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে,
খুঁজে না পাই কূল ;
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তুলে
ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরছে রয়ে রয়ে।

শিলাইদহ
আষাঢ় ১৩১৬

২০

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশ-সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,

চাই যে বারে বার।

পরানসখা বন্ধু হে আমার।

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,

তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।

সুদূর কোন্ নদীর পারে,

গহন কোন্ বনের ধারে,

গভীর কোন্ অন্ধকারে

হতেছ তুমি পার।

পরানসখা বন্ধু হে আমার।

'পদ্মা' বোট

শ্রাবণ ১৩১৬

২১

জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে

ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,

সহসা হে প্রিয়, কত গৃহে পথে

রেখে গেছ প্রাণে কত হরষন।

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে

এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,

অরুণ-কিরণে চরণ বাড়ালে,

ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।

সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে

কত কালে কালে কত লোকে লোকে

কত নব নব আলোকে আলোকে

অরূপের কত রূপদরশন।

কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে

ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে

কত সুখে দুখে কত প্রেমে গানে

অমৃতের কত রসবরষন।

বোলপুর

১০ ভাদ্র ১৩১৬

২২

তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী,
অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।
স্বরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
স্বরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়া যায় স্বরের স্বরধুনী।

মনে করি অমনি স্বরে গাই,
কণ্ঠে আমার স্বর খুঁজে না পাই।
কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে;
হার মেনে যে পরান আমার কাঁদে;
আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে
চৌদিকে মোর স্বরের জাল বুনি!

১০ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি

২৩

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।
এবার হৃদয়-মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না।
বিশ্বে তোমার লুকোচুরি,
দেশ-বিদেশে কতই ঘুরি,
এবার বলো, আমার মনের কোণে
দেবে ধরা, ছলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।
জানি আমার কঠিন হৃদয়
চরণ রাখার যোগ্য সে নয়,

সখা, তোমার হাওয়া লাগলে হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না।

নাহয় আমার নাই সাধনা,
ঝরলে তোমার কৃপার কণা
তখন নিমেষে কি ফুটবে না ফুল,
চকিতে ফল ফলবে না।
আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না।

বোলপুর
১১ ভাদ্র ১৩১৬। রাত্রি

২৪

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দু হাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাই নি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

যদি আলসভরে
আমি বসি পথের 'পরে,
যদি ধুলায় শয়ন পাতি সযতনে,

যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি,
ঘরে যতই বাজে বাঁশি,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয় নি আনা
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে॥

১২ ভাদ্র ১৩১৬

২৫

হেরি অহরহ তোমারি বিরহ
ভুবনে ভুবনে রাজে হে।
কত রূপ ধ'রে কাননে ভূধরে
আকাশে সাগরে সাজে হে।
সারা নিশি ধরি তারায় তারায়
অনিমেষ চোখে নীরবে দাঁড়ায়,
পল্লবদলে শ্রাবণধারায়
তোমারি বিরহ বাজে হে।
ঘরে ঘরে আজি কত বেদনায়
তোমারি গভীর বিরহ ঘনায়,
কত প্রেমে হায় কত বাসনায়
কত সুখে দুখে কাজে হে।
সকল জীবন উদাস করিয়া
কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমারি বিরহ উঠিছে ভরিয়া
আমার হিয়ার মাঝে হে।

১২ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি

২৬

আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া
ধরণীতে,
এখন চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।
জলধারার কলস্বরে
সন্ধ্যাগগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের 'পরে
সেই ধ্বনিতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।

এখন বিজন পথে করে না কেউ
আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেম-নদীতে উঠেছে ঢেউ,
উতল হাওয়া।
জানি নে আর ফিরব কিনা,
কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা
তরণীতে।
চল্‌ রে ঘাটে কলসখানি
ভরে নিতে।

১৩ ভাদ্র ১৩১৬

২৭

আজ বারি ঝরে ঝর ঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও না ধরে।

শালের বনে থেকে থেকে
ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেঁকে,
জল ছুটে যায় এঁকেবেঁকে
মাঠের 'পরে।
আজ মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্য কে করে।

ওরে বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন,
লুটেছে ওই ঝড়ে,
বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর
কাহার পায়ে পড়ে।
অন্তরে আজ কী কলরোল,
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল,
হৃদয়-মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।
আজ এমন করে কে মেতেছে
বাহিরে ঘরে।

১৪ ভাদ্র ১৩১৬

২৮

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে ;
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

ধুলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুণা মাগে।
কৃপা নাই পাই,
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

আজি এ জগত-মাঝে
কত সুখে কত কাজে
চলে গেল সবে আগে।
সাথি নাই পাই,
তোমায় চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।
চারি দিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে।
দেখা নাই নাই,
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

১৪ ভাদ্র ১৩১৬
রাত্রি

২৯

ধনে জনে আছি জড়ায়ে হায়,
তবু জান, মন তোমারে চায়।
অন্তরে আছ হে অন্তর্যামী,
আমা চেয়ে আমায় জানিছ স্বামী—
সব সুখে দুখে ভুলে থাকায়
জান, মম মন তোমারে চায়।
ছাড়িতে পারি নি অহংকারে,
ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,
ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়—
তুমি জান, মন তোমারে চায়।
যা আছে আমার সকলি কবে
নিজ হাতে তুমি তুলিয়া লবে।
সব ছেড়ে সব পাব তোমায়,
মনে মনে মন তোমারে চায়।

১৫ ভাদ্র ১৩১৬

৩০

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরন।
এই-যে মধুর আলসভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ-'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।
এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।

প্রভাত-আলোর ধারায় আমার
নয়ন ভেসেছে।
এই তোমারি প্রেমের বাণী
প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ওই:নুয়েছে,
মুখে আমার চোখ থুয়েছে,
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে
তোমারি চরণ।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩১

আমি হেথায় থাকি শুধু
গাইতে তোমার গান,
দিয়ো তোমার জগৎসভায়
এইটুকু মোর স্থান।
আমি তোমার ভুবন-মাঝে
লাগি নি নাথ, কোনো কাজে—
শুধু কেবল সুরে বাজে
অকাজের এই প্রাণ।

নিশায় নীরব দেবালয়ে
তোমার আরাধন,
তখন মোরে আদেশ কোরো
গাইতে হে রাজন্।
ভোরে যখন আকাশ জুড়ে
বাজবে বীণা সোনার সুরে
আমি যেন না রই দূরে
এই দিয়ো মোর মান

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩২

দাও হে আমার ভয় ভেঙে দাও।
আমার দিকে ও মুখ ফিরাও।
পাশে থেকে চিনতে নারি,
কোন্ দিকে যে কী নেহারি,
তুমি আমার হৃদ্‌বিহারী
হৃদয়পানে হাসিয়া চাও।

বলো আমায় বলো কথা,
গায়ে আমার পরশ করো।
দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে
আমায় তুমি তুলে ধরো।
যা বুঝি সব ভুল বুঝি হে,
যা খুঁজি সব ভুল খুঁজি হে—
হাসি মিছে, কান্না মিছে,
সামনে এসে এ ভুল ঘুচাও।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৩

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।
আবার চোখে নামে যে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে,
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে
ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।
সবার মাঝে আমার সাথে থাকো,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,
নিয়ত মোর চেতনা-'পরে রাখো
আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৪

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।

ওগো পথিক, আজকে আমার
সকল পরান ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠছে কেঁপে কেঁপে।

যেন সময় এসেছে আজ,
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ—
বাতাস আসে হে মহারাজ,
তোমার গন্ধ মেখে।

১৬ ভাদ্র ১৩১৬

৩৫

এসো হে এসো, সজল ঘন,
বাদলবরিষনে—
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে
এসো হে এ জীবনে।
এসো হে গিরিশিখর চুমি,
ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি—
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি
গভীর গরজনে।

ব্যথিয়ে উঠে নীপের বন
পুলকভরা ফুলে।
উছলি উঠে কলরোদন
নদীর কূলে কূলে।
এসো হে এসো হৃদয়ভরা,
এসো হে এসো পিপাসা-হরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা
ঘনায়ে এসো মনে।

১৭ ভাদ্র ১৩১৬

৩৬

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

পাতিয়া কান শুনিস না যে
দিকে দিকে গগনমাঝে
মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জলবারই আনন্দে রে।

পাগল-করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই-বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।

সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরন গীতে গন্ধে রে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।

বোলপুর
১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৭

নিশার স্বপন ছুটল রে, এই
ছুটল রে।
টুটল বাঁধন টুটল রে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগৎ-পানে,
হৃদয়শতদলের সকল
দলগুলি এই ফুটল রে, এই
ফুটল রে।

দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে
নয়নজলে ভেসে হৃদয়
চরণতলে লুটল রে।
আকাশ হতে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে, এই
উঠল রে।

১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৮

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়,
আনন্দগান গা রে।
নীল আকাশের নীরব কথা
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে।

শস্যখেতের সোনার গানে
যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্‌ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা রে।

শান্তিনিকেতন
১৮ ভাদ্র ১৩১৬

৩৯

হেথা যে গান গাইতে আসা আমার
হয় নি সে গান গাওয়া—
আজো কেবলি সুর সাধা, আমার
কেবল গাইতে চাওয়া।
আমার লাগে নাই সে সুর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।
আজো ফোটে নাই সে ফুল, শুধু
বহেছে এক হাওয়া।
আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি
শুনি নাই তার বাণী,
কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার
পায়ের ধ্বনিখানি।
আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন
করে আসা-যাওয়া।
শুধু আসন পাতা হল আমার
সারাটি দিন ধ'রে—
ঘরে হয় নি প্রদীপ জ্বালা, তারে
ডাকব কেমন ক'রে।
আছি পাবার আশা নিয়ে, তারে
হয় নি আমার পাওয়া।

কলিকাতা
২৭ ভাদ্র ১৩১৬

৪০

যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে
রইব কত আর।
আর পারি নে রাত জাগতে হে নাথ,
ভাবতে অনিবার।

আছি রাত্রিদিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে,
আসতে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারে বার।

তাই তো কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে।
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।

তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখতে যা চাই রয় না তাও
ধুলায় একাকার।

কলিকাতা
১ আশ্বিন ১৩১৬

৪১

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।
দিনের কাজে ধুলা লাগি
অনেক দাগে হল দাগি,
এমনি তপ্ত হয়ে আছে
সহ্য করা ভার।
আমার এই মলিন অহংকার।

এখন তো কাজ সাঙ্গ হল
দিনের অবসানে,
হল রে তাঁর আসার সময়
আশা এল প্রাণে।

স্নান করে আয় এখন তবে
প্রেমের বসন পরতে হবে,
সন্ধ্যাবনের কুসুম তুলে
গাঁথতে হবে হার।
ওরে আয় সময় নেই যে আর।

১৯ আশ্বিন ১৩১৬

৪২

গায়ে আমার পুলক লাগে,
চোখে ঘনায় ঘোর,
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে
রাঙা রাখীর ডোর।
আজিকে এই আকাশতলে
জলে স্থলে ফুলে ফলে
কেমন করে মনোহরণ
ছড়ালে মন মোর।
কেমন খেলা হল আমার
আজি তোমার সনে।
পেয়েছি কি খুঁজে বেড়াই
ভেবে না পাই মনে।
আনন্দ আজ কিসের ছলে
কাঁদিতে চায় নয়নজলে,
বিরহ আজ মধুর হয়ে
করেছে প্রাণ ভোর।

শিলাইদহ
২৫ আশ্বিন ১৩১৬

৪৩

প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত
রেখো না ঢাকি।
এসেছি তোমারে, হে নাথ,
পরাতে রাখী।
যদি বাঁধি তোমার হাতে
পড়ব বাঁধা সবার সাথে,
যেখানে যে আছে কেহই
রবে না বাকি।

আজি যেন ভেদ নাহি রয়
আপনা পরে,
তোমায় যেন এক দেখি হে
বাহিরে ঘরে।
তোমার সাথে যে বিচ্ছেদে
ঘুরে বেড়াই কেঁদে কেঁদে,
ক্ষণেক-তরে ঘুচাতে তাই
তোমারে ডাকি।

শিলাইদহ
২৭ আশ্বিন ১৩১৬

৪৪

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন।

তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি।
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্নাহাসি।
এখন সময় হয়েছে কি।
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব
এ মোর নিবেদন।

শিলাইদহ
৩০ আশ্বিন ১৩১৬

৪৫

আলোয় আলোকময় ক'রে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।
সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা,
যে দিক -পানে নয়ন মেলি
ভালো সবই ভালো।

তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখির বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্মল হাত
বুলালো বুলালো।

বোলপুর
২০ অগ্রহায়ণ ১৩১৬

৪৬

আসনতলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখ,
চিরজনম এমন করে ভুলিয়ো নাকো,
অসম্মানে আনো টেনে পায়ে তব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।

আমি তোমার যাত্রীদলের রব পিছে,
স্থান দিয়ো হে আমায় তুমি সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কত লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছুই চাইব না তো রইব চেয়ে;
সবার শেষে বাকি যা রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।

শান্তিনিকেতন
১০ পৌষ ১৩১৬

৪৭

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি;
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভামাঝে।

চিরদিনের স্বরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি।

শান্তিনিকেতন
১২ পৌষ ১৩১৬

৪৮

আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।
মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে,
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।

আকাশেতে ঢেউ দিয়ে রে
বাতাস বহে যায়।
চার দিকে গান বেজে ওঠে,
চার দিকে প্রাণ নাচে ছোটে,
গগনভরা পরশখানি
লাগে সকল গায়।
ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে,
ফিরে ফিরে আমায় ঘিরে
বাতাস বহে যায়।

দশ দিকেতে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।
রয়েছে জীব যে যেখানে
সকলকে সে ডেকে আনে,
সবার হাতে সবার পাতে
অন্ন সে দেয় বাঁটি।
ভরেছে মন গীতে গন্ধে,
বসে আছি মহানন্দে,
আমায় ঘিরে আঁচল পেতে
কোল দিয়েছে মাটি।

আলো, তোমায় নমি আমার
মিলাক অপরাধ।
ললাটেতে রাখো আমার
পিতার আশীর্বাদ।
বাতাস, তোমায় নমি, আমার
ঘুচুক অবসাদ,
সকল দেহে বুলায়ে দাও
পিতার আশীর্বাদ।
মাটি, তোমায় নমি, আমার
মিটুক সর্ব সাধ।
গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো
পিতার আশীর্বাদ।

পৌষ ১৩১৬

৪৯

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই,
মনের মতো করে।

গান গেয়ে আনন্দমনে
ঝাঁটিয়ে দে সব ধুলা।
যত্ন করে দূর করে দে
আবর্জনাগুলা।
জল ছিটিয়ে ফুলগুলি রাখ
সাজিখানি ভরে—
আসনটি তাঁর সাজিয়ে দে ভাই,
মনের মতো করে।

দিনরজনী আছেন তিনি
আমাদের এই ঘরে,
সকালবেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠে
নয়ন মেলে চাই,
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে
দেখতে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায়
সমস্ত ঘর ভরে।
সকালবেলায় তাঁরি হাসি
আলোক ঢেলে পড়ে।

একলা তিনি বসে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অন্য কোথাও
চলি কাজের তরে,
দ্বারের কাছে তিনি মোদের
এগিয়ে দিয়ে যান—
মনের সুখে ধাই রে পথে,
আনন্দে গাই গান।

দিনের শেষে ফিরি যখন
নানা কাজের পরে,
দেখি তিনি একলা বসে
আমাদের এই ঘরে।

তিনি জেগে বসে থাকেন
আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অচেতনে
ঘুমাই শয্যা-'পরে।
জগতে কেউ দেখতে না পায়
লুকানো তাঁর বাতি,
আঁচল দিয়ে আড়াল করে
জ্বালান সারা রাতি।
ঘুমের মধ্যে স্বপন কতই
আনাগোনা করে,
অন্ধকারে হাসেন তিনি
আমাদের এই ঘরে।

পৌষ ১৩১৬

৫০

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার,
আজ লব তাঁর দেখা।
সারাদিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহি রে,
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয় নি আমার শেখা।

তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজালোক করে রচনা,
সেথায় আমিও ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা।

শান্তিনিকেতন
১৭ পৌষ ১৩১৬

৫১

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো, ধরায় আস।

এই অকূল সংসারে
দুঃখ-আঘাত তোমার প্রাণে বীণা ঝংকারে।
ঘোর বিপদ-মাঝে
কোন্ জননীর মুখের হাসি দেখিয়া হাস।

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে।
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমারে কাঁদায় যারে ভালোবাস।

তোমার ভাবনা কিছু নাই—
কে যে তোমার সাথের সাথি ভাবি মনে তাই।
তুমি মরণ ভুলে
কোন্ অনন্ত প্রাণসাগরে আনন্দে ভাস।

১৭ পৌষ ১৩১৬

৫২

তুমি আমার আপন, তুমি আছ আমার কাছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।

আমায় দাও সুধাময় সুর,
আমার বাণী করো সুমধুর ;
আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

এই নিখিল আকাশ ধরা
এ যে তোমায় দিয়ে ভরা,
আমার হৃদয় হতে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

দুখি জেনেই কাছে আস,
ছোটো বলেই ভালোবাস,
আমার ছোটো মুখে এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও।

মাঘ ১৩১৬

৫৩

নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়নজলে।
একা আমি অহংকারের
উচ্চ অচলে,
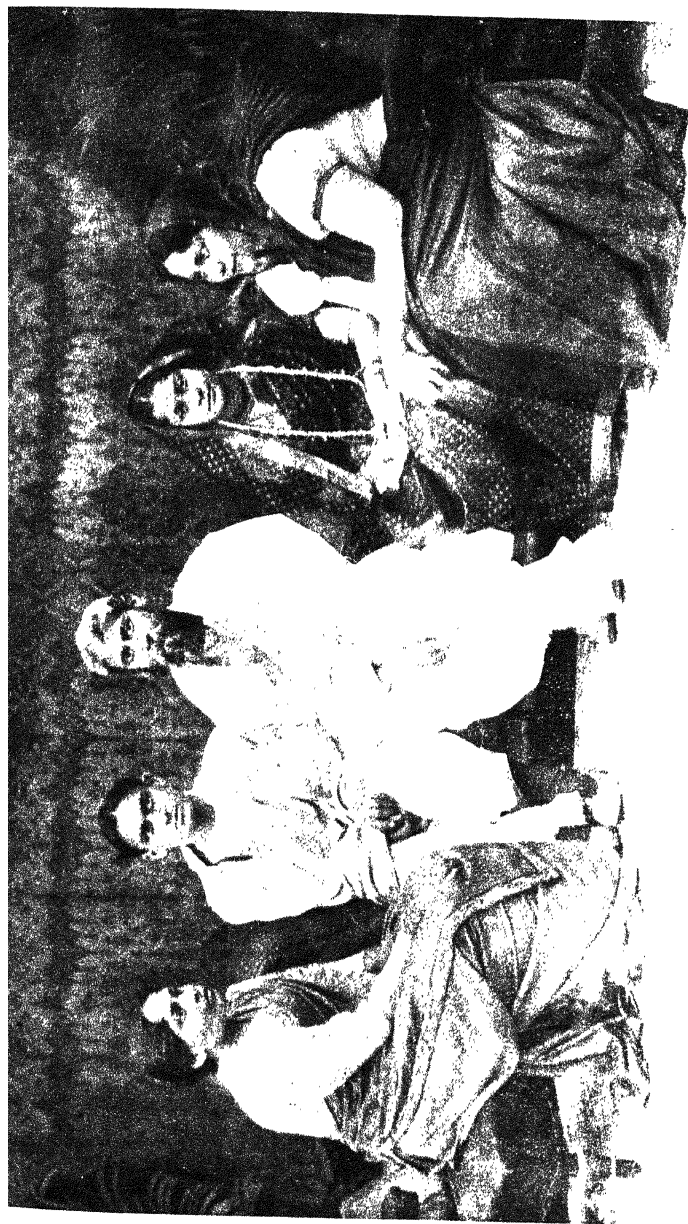
সপরিবারে রবীন্দ্রনাথ, ১৩১৬

বাম দিক হইতে : কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী, জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা দেবী

সুকুমার রায় গৃহীত ফোটোগ্রাফ। শ্রীপ্রণবেশ সিংহের সৌজন্যে

পাষাণ-আসন ধুলায় লুটাও,
ভাঙো সবলে।
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে।

কী লয়ে বা গর্ব করি
ব্যর্থ জীবনে।
ভরা গৃহে শূন্য আমি
তোমা বিহনে।
দিনের কর্ম ডুবেছে মোর
আপন অতলে
সন্ধ্যাবেলার পূজা যেন
যায় না বিফলে।
নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণতলে।

মাঘ ১৩১৬

৫৪

আজি গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে।
আজি ক্ষুব্ধ নীলাম্বর-মাঝে
এ কী চঞ্চল ক্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সকরুণ সংগীত
লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।

ওগো জানি না কী নন্দনরাগে
সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুলসৌগন্ধ্যে,
নব- পল্লব-মর্মর ছন্দে,

চন্দ্র-কিরণ-সুধা-সিঞ্চিত অম্বরে
অশ্রু-সরস মহানন্দে
আমি পুলকিত কার পরশনে
গন্ধবিধুর সমীরণে।

বোলপুর
ফাল্গুন ১৩১৬

৫৫

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপনপর ভুলিয়ো,
এই সংগীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে—
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভবিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে।

বোলপুর
২৬ চৈত্র ১৩১৬

৫৬

তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।
একলা বসে আপন-মনে
গাইতেছিলেম গান,
তোমার কানে গেল সে সুর
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

তোমার সভায় কত-না গান
কতই আছেন গুণী ;
গুণহীনের গানখানি আজ
বাজল তোমার প্রেমে।
লাগল বিশ্বতানের মাঝে
একটি করুণ সুর,
হাতে লয়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

২৭ চৈত্র ১৩১৬

৫৭

তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ, লহো
এবার তুমি ফিরো না হে—
হৃদয় কেড়ে নিয়ে রহো।

যে দিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহি না,
যাক সে ধুলাতে।
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।

কী আবেশে কিসের কথায়
ফিরেছি হে যথায় তথায়
পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে
তোমার আপন বাণী কহো।

কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনো যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তার লাগি আর ফিরায়ো না,
তারে আগুন দিয়ে দহো।

২৮ চৈত্র ১৩১৬

৫৮

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।

কর্ম যখন প্রবল-আকার
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার,
হৃদয়প্রান্তে হে নীরব নাথ,
শান্তচরণে এসো।

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন,

দুয়ার খুলিয়া হে উদার নাথ,
রাজ-সমারোহে এসো।
বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো।

২৮ চৈত্র ১৩১৬

৫৯

এবার নীরব করে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
তার হৃদয়-বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।
নিশীথরাতের নিবিড় সুরে
বাঁশিতে তান দাও হে পুরে
যে তান দিয়ে অবাক কর'
গ্রহশশীরে।

যা-কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন-মরণে,
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে।

বহুদিনের বাক্যরাশি
এক নিমেষে যাবে ভাসি,
একলা বসে শুনব বাঁশি
অকূল তিমিরে।

৩০ চৈত্র ১৩১৬

৬০

বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার ;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাই নে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পুরে,
জানি নে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।
কোন্ বেদনায় বুঝি না রে
হৃদয় ভরা অশ্রুভারে,
পরিয়ে দিতে চাই কাহারে
আপন কণ্ঠহার।

৪ বৈশাখ ১৩১৭

৬১

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী।
এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে,
স্বপনমাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিণী।
জেগে দেখি দখিন-হাওয়া
পাগল করিয়া

গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায়
আঁধার ভরিয়া।
কেন আমার রজনী যায়—
কাছে পেয়ে কাছে না পায়
কেন গো তার মালার পরশ
বুকে লাগে নি।

বোলপুর
১২ বৈশাখ ১৩১৭

৬২

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন-মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার
আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।

কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে,
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।

কলিকাতা
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৩

মেনেছি, হার মেনেছি।
ঠেলতে গেছি তোমায় যত
আমায় তত হেনেছি।
আমার চিত্তগগন থেকে
তোমায় কেউ যে রাখবে ঢেকে
কোনোমতেই সইবে না সে
বারেবারেই জেনেছি।

অতীত জীবন ছায়ার মতো
চলছে পিছে পিছে,
কত মায়ার বাঁশির সুরে
ডাকছে আমায় মিছে।
মিল ছুটেছে তাহার সাথে,
ধরা দিলেম তোমার হাতে,
যা আছে মোর এই জীবনে
তোমার দ্বারে এনেছি।

তিনধরিয়া
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৪

একটি একটি করে তোমার
পুরানো তার খোলো,
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো।
ভেঙে গেছে দিনের মেলা,
বসবে সভা সন্ধ্যাবেলা,
শেষের সুর যে বাজাবে তার
আসার সময় হল—
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো।

দুয়ার তোমার খুলে দাও গো
আঁধার আকাশ-'পরে,
সপ্ত লোকের নীরবতা
আসুক তোমার ঘরে।
এতদিন যে গেয়েছ গান
আজকে তারি হোক অবসান,
এ যন্ত্র যে তোমার যন্ত্র
সেই কথাটাই ভোলো।
সেতারখানি নূতন বেঁধে তোলো।

তিনধরিয়া
৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৫

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরনা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

পুষ্প যেমন আলোর লাগি
না জেনে রাত কাটায় জাগি,
তেমনি তোমার আশায় আমার
হৃদয় আছে ছেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

তিনধরিয়া
৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৬

তোমার প্রেম যে বইতে পারি
এমন সাধ্য নাই।
এ সংসারে তোমার আমার
মাঝখানেতে তাই
কৃপা করে রেখেছ নাথ
অনেক ব্যবধান—
দুঃখসুখের অনেক বেড়া
ধনজনমান।

আড়াল থেকে ক্ষণে ক্ষণে
আভাসে দাও দেখা—
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
রবির মৃদু রেখা।
শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচায়ে দাও তার।

না রাখ তার ঘরের আড়াল
না রাখ তার ধন,
পথে এনে নিঃশেষে তায়
কর অকিঞ্চন।

না থাকে তার মান অপমান,
লজ্জা শরম ভয়,
একলা তুমি সমস্ত তার
বিশ্বভুবনময়।

এমন করে মুখোমুখি
সামনে তোমার থাকা,
কেবলমাত্র তোমাতে প্রাণ
পূর্ণ করে রাখা,
এ দয়া যে পেয়েছে তার
লোভের সীমা নাই—
সকল লোভ সে সরিয়ে ফেলে
তোমায় দিতে ঠাঁই।

তিনধরিয়া
১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৭

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে,
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়নপানে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

স্বপন আমার ভরেছিল কোন্ গন্ধে
ঘরের আঁধার কেঁপেছিল কী আনন্দে,
ধুলায় লুটানো নীরব আমার বীণা
বেজে উঠেছিল অনাহত কী আঘাতে।

কতবার আমি ভেবেছিনু উঠি-উঠি
আলস ত্যজিয়া পথে বাহিরাই ছুটি,
উঠিনু যখন তখন গিয়েছ চলে—
দেখা বুঝি আর হল না তোমার সাথে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে।

তিনধরিয়া
১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৮

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল না ভয় ছিল না লাজ মনে
জীবন বহে যেত অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত না বন-বনান্ত।

ওগো সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান
কোনো অর্থ তাহার কে জানত।
শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,
সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।
হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি,
স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,
তোমার চরণপানে নয়ন করি' নত
ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৬৯

ওই রে তরী দিল খুলে।
তোর বোঝা কে নেবে তুলে।
সামনে যখন যাবি ওরে
থাক্ না পিছন পিছে পড়ে,
পিঠে তারে বইতে গেলি,
একলা পড়ে রইলি কূলে।

ঘরের বোঝা টেনে টেনে।
পারের ঘাটে রাখলি এনে,
তাই যে তোরে বারে বারে
ফিরতে হল গেলি ভুলে।
ডাক রে আবার মাঝিরে ডাক,
বোঝা তোমার যাক ভেসে যাক,
জীবনখানি উজাড় করে
সঁপে দে তার চরণমূলে।

তিনধরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭০

চিত্ত আমার হারাল আজ
মেঘের মাঝখানে,
কোথায় ছুটে চলেছে সে
কোথায় কে জানে।
বিজুলি তা'র বীণার তারে
আঘাত করে বারে বারে,
বুকের মাঝে বজ্র বাজে
কী মহাতানে।

পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভারে
নিবিড় নীল অন্ধকারে
জড়াল রে অঙ্গ আমার,
ছড়াল প্রাণে।

পাগল হাওয়া নৃত্যে মাতি
হল আমার সাথের সাথি,
অট্টহাসে ধায় কোথা সে—
বারণ না মানে।

তিনধরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭১

ওগো মৌন, না যদি কও
না-ই কহিলে কথা।
বক্ষ ভরি বইব আমি
তোমার নীরবতা।

স্তব্ধ হয়ে রইব পড়ে,
রজনী রয় যেমন করে
জ্বালিয়ে তারা নিমেষহারা
ধৈর্যে অবনতা।

হবে হবে প্রভাত হবে
আঁধার যাবে কেটে।
তোমার বাণী সোনার ধারা
পড়বে আকাশ ফেটে।

তখন আমার পাখির বাসায়
জাগবে কি গান তোমার ভাষায়।
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা?

তিনধরিয়া
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭২

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।
যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল,
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।

পূজাগৌরব পুণ্যবিভব
কিছু নাহি, নাহি লেশ,
এ তব পূজারি পরিয়া এসেছে
লজ্জার দীন বেশ।
উৎসবে তার আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশি, সাজে নাই গেহ—
কাঁদিয়া তোমায় এনেছে ডাকিয়া
ভাঙা মন্দির -দ্বারে।

তিনধরিয়া
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৩

সবা হতে রাখব তোমায়
আড়াল ক'রে
হেন পূজার ঘর কোথা পাই
আমার ঘরে।
যদি আমার দিনে রাতে,
যদি আমার সবার সাথে
দয়া ক'রে দাও ধরা, তো
রাখব ধরে।

মান দিব যে তেমন মানী
নই তো আমি,
পূজা করি সে আয়োজন
নাই তো স্বামী।
যদি তোমায় ভালোবাসি,
আপনি বেজে উঠবে বাঁশি,
আপনি ফুটে উঠবে কুসুম,
কানন ভরে।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৪

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।
ভুলব না আর সহজেতে,
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যুমাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝংকারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

তিনধরিয়া
২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৫

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে—
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরান আমার পারি নে তাই
পায়ে থুতে।

এতদিন তো ছিল না মোর
কোনো ব্যথা,
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।
আজ ওই শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে—
দিয়ো না গো, দিয়ো না আর
ধুলায় শুতে।

কলিকাতা
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৬

সভা যখন ভাঙবে তখন
শেষের গান কি যাব গেয়ে।
হয়তো তখন কণ্ঠহারা
মুখের পানে রব চেয়ে।
এখনো যে সুর লাগে নি
বাজবে কি আর সেই রাগিণী,
প্রেমের ব্যথা সোনার তানে
সন্ধ্যাগগন ফেলবে ছেয়ে?

এতদিন যে সেধেছি সুর
দিনেরাতে আপন-মনে
ভাগ্যে যদি সেই সাধনা
সমাপ্ত হয় এই জীবনে—
এ জনমের পূর্ণ বাণী
মানস-বনের পদ্মখানি
ভাসাব শেষ সাগরপানে
বিশ্বগানের ধারা বেয়ে।

কলিকাতা
২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৭

চিরজনমের বেদনা,
ওহে চিরজীবনের সাধনা।
তোমার আগুন উঠুক হে জ্বলে,
কৃপা করিয়ো না দুর্বল ব'লে,
যত তাপ পাই সহিবারে চাই,
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।

অমোঘ যে ডাক সেই ডাক দাও
আর দেরি কেন মিছে।
যা আছে বাঁধন বক্ষ জড়ায়ে
ছিঁড়ে প'ড়ে যাক পিছে।
গরজি গরজি শঙ্খ তোমার
বাজিয়া বাজিয়া উঠুক এবার,
গর্ব টুটিয়া নিদ্রা ছুটিয়া
জাগুক তীব্র চেতনা।

কলিকাতা
২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৮

তুমি যখন গান গাহিতে বল
গর্ব আমার ভ'রে ওঠে বুকে ;
দুই আঁখি মোর করে ছল ছল
নিমেষহারা চেয়ে তোমার মুখে।
কঠিন কটু যা আছে মোর প্রাণে
গলিতে চায় অমৃতময় গানে,
সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে।

তৃপ্ত তুমি আমার গীতরাগে,
ভালো লাগে তোমার ভালো লাগে,
জানি আমি এই গানেরি বলে
বসি গিয়ে তোমারি সম্মুখে।
মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই,
সুরের ঘোরে আপনাকে যাই ভুলে,
বন্ধু ব'লে ডাকি মোর প্রভুকে।

২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৭৯

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

চিত্ত মম যখন যেথায় থাকে,
সাড়া যেন দেয় সে তোমার ডাকে,
যত বাধা সব টুটে যায় যেন
প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে।

বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
প্রভু, তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে।

হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর,
এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর
সকলি আজ বেজে উঠুক সুরে
প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

কলিকাতা
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮০

তারা দিনের বেলা এসেছিল
আমার ঘরে,
বলেছিল, একটি পাশে
রইব প'ড়ে।
বলেছিল, দেবতা সেবায়
আমরা হব তোমার সহায়—
যা কিছু পাই প্রসাদ লব
পূজার পরে।

এমনি করে দরিদ্র ক্ষীণ
মলিন বেশে
সংকোচেতে একটি কোণে
রইল এসে।
রাতে দেখি প্রবল হয়ে
পশে আমার দেবালয়ে,
মলিন হাতে পূজার বলি হরণ করে।

বোলপুর
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮১

তারা তোমার নামে বাটের মাঝে
মাস্থল লয় যে ধরি।
দেখি শেষে ঘাটে এসে
নাইকো পারের কড়ি।
তারা তোমার কাজের ভানে
নাশ করে গো ধনে প্রাণে,
সামান্য যা আছে আমার
লয় তা অপহরি।

আজকে আমি চিনেছি সেই
ছদ্মবেশী-দলে।
তারাও আমায় চিনেছে হায়
শক্তিবিহীন ব'লে।
গোপন মূর্তি ছেড়েছে তাই,
লজ্জা শরম আর কিছু নাই,
দাঁড়িয়েছে আজ মাথা তুলে
পথ অবরোধ করি।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮২

এই জ্যোৎস্নারাতে জাগে আমার প্রাণ ;
পাশে তোমার হবে কি আজ স্থান।
দেখতে পাব অপূর্ব সেই মুখ,
রইবে চেয়ে হৃদয় উৎসুক,
বারে বারে চরণ ঘিরে ঘিরে
ফিরবে আমার অশ্রুভরা গান ?

সাহস করে তোমার পদমূলে
আপনারে আজ ধরি নাই যে তুলে,
পড়ে আছি মাটিতে মুখ রেখে,
ফিরিয়ে পাছে দাও এ আমার দান।

আপনি যদি আমার হাতে ধরে
কাছে এসে উঠতে বল মোরে,
তবে প্রাণের অসীম দরিদ্রতা
এই নিমেষেই হবে অবসান।

বোলপুর
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮৩

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।
কূলহারা সেই সমুদ্র-মাঝখানে
শোনাব গান একলা তোমার কানে,
ঢেউয়ের মতন ভাষা-বাঁধন-হারা
আমার সেই রাগিণী শুনবে নীরব হেসে।

আজো সময় হয় নি কি তার, কাজ কি আছে বাকি।
ওগো ওই-যে সন্ধ্যা নামে সাগরতীরে।
মলিন আলোয় পাখা মেলে সিন্ধুপারের পাখি
আপন কুলায়-মাঝে সবাই এল ফিরে।
কখন তুমি আসবে ঘাটের 'পরে
বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে।
অস্তরবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

বোলপুর
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

৮৪

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে তোমার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।

নিখিল আশা-আকাঙ্ক্ষা-ময়
দুঃখে সুখে,
ঝাঁপ দিয়ে তার তরঙ্গপাত
ধরব বুকে।
মন্দভালোর আঘাতবেগে,
তোমার বুকে উঠব জেগে,
শুনব বাণী বিশ্বজনের
কলরবে।
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।

১ আষাঢ় ১৩১৭

৮৫

একা আমি ফিরব না আর
এমন করে—
নিজের মনে কোণে কোণে
মোহের ঘোরে।

তোমায় একলা বাহুর বাঁধন দিয়ে
ছোটো করে ঘিরতে গিয়ে
আপনাকে যে বাঁধি কেবল
আপন ডোরে।

যখন আমি পাব তোমায়
নিখিলমাঝে
সেই খনে হৃদয়ে পাব
হৃদয়রাজে।
এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল
তারি 'পরে বিশ্বকমল;
তারি 'পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে।

২ আষাঢ় ১৩১৭

৮৬

আমারে যদি জাগালে আজি নাথ,
ফিরো না তবে ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।
নিবিড় বন-শাখার 'পরে
আষাঢ়-মেঘে বৃষ্টি ঝরে,
বাদলভরা আলসভরে
ঘুমায়ে আছে রাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।

বিরামহীন বিজুলিঘাতে
নিদ্রাহারা প্রাণ
বরষা-জলধারার সাথে
গাহিতে চাহে গান।

হৃদয় মোর চোখের জলে
বাহির হল তিমিরতলে,
আকাশ খোঁজে ব্যাকুল বলে
বাড়ায়ে দুই হাত।
ফিরো না তুমি ফিরো না, করো
করুণ আঁখিপাত।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৭

ছিন্ন করে লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়
ধুলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি, জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি তার
ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।

কখন যে দিন ফুরিয়ে যাবে,
আসবে আঁধার করে,
কখন তোমার পূজার বেলা
কাটবে অগোচরে।
যেটুকু এর রঙ ধরেছে,
গন্ধে সুধায় বুক ভরেছে,
তোমার সেবায় লও সেটুকু
থাকতে সুসময়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৮

চাই গো আমি তোমারে চাই
তোমায় আমি চাই—
এই কথাটি সদাই মনে
বলতে যেন পাই।
আর যা-কিছু বাসনাতে
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো
তোমায় আমি চাই।

রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে,
তেমনি তোমায় আঘাত করি
তবু তোমায় চাই।

৩ আষাঢ় ১৩১৭

৮৯

আমার এ প্রেম নয় তো ভীরু,
নয় তো হীনবল,
শুধু কি এ ব্যাকুল হয়ে
ফেলবে অশ্রুজল।
মন্দমধুর সুখে শোভায়
প্রেমকে কেন ঘুমে ডোবায়।
তোমার সাথে জাগতে সে চায়
আনন্দে পাগল।

নাচো যখন ভীষণ সাজে
তীব্র তালের আঘাত বাজে,
পালায় ত্রাসে পালায় লাজে
সন্দেহ-বিহ্বল।
সেই প্রচণ্ড মনোহরে
প্রেম যেন মোর বরণ করে,
ক্ষুদ্র আশার স্বর্গ তাহার
দিক সে রসাতল।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯০

আরো আঘাত সইবে আমার
সইবে আমারো,
আরো কঠিন সুরে জীবনতারে ঝংকারো।
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে
বাজে নি তা চরমতানে,
নিঠুর মূর্ছনায় সে গানে
মূর্তি সঞ্চারো।

লাগে না গো কেবল যেন
কোমল করুণা,
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ কোরো না।
জ্বলে উঠুক সকল হুতাশ,
গর্জি উঠুক সকল বাতাস,
জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ
পূর্ণতা বিস্তারো।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯১

এই করেছ ভালো, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

যখন থাকে অচেতনে
এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই তো পুরস্কার।
অন্ধকারে মোহে লাজে
চোখে তোমায় দেখি না যে,
বজ্রে তোলো আগুন করে
আমার যত কালো।

৪ আষাঢ় ১৩১৭

৯২

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে।
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেমে
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধরে
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে

ভাই তুমি যে ভায়ের মাঝে প্রভু,
তাদের পানে তাকাই না যে তবু,
ভাইয়ের সাথে ভাগ ক'রে মোর ধন
তোমার মুঠা কেন ভরি নে।
ছুটে এসে সবার সুখে দুখে
দাঁড়াই নে তো তোমারি সম্মুখে,
সঁপিয়ে প্রাণ ক্লান্তিবিহীন কাজে
প্রাণসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি নে।

৫ আষাঢ় ১৩১৭

৯৩

তুমি যে কাজ করছ, আমায়
সেই কাজে কি লাগাবে না।
কাজের দিনে আমায় তুমি
আপন হাতে জাগাবে না?
ভালোমন্দ ওঠাপড়ায়
বিশ্বশালার ভাঙাগড়ায়
তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যেন
তোমার সাথে হয় গো চেনা।

ভেবেছিলেম বিজন ছায়ায়
নাই যেখানে আনাগোনা,
সন্ধ্যাবেলায় তোমায় আমায়
সেথায় হবে জানাশোনা।
অন্ধকারে একা একা
সে দেখা যে স্বপ্ন দেখা,
ডাকো তোমার হাটের মাঝে
চলছে যেথায় বেচাকেনা।

৬ আষাঢ় ১৩১৭

৯৪

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

সবার পানে যেথায় বাহু পসারো,
সেইখানেতেই প্রেম জাগিবে আমারো।
গোপনে প্রেম রয় না ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে,
সবার তুমি আনন্দধন, হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।

৭ আষাঢ় ১৩১৭

৯৫

ডাকো ডাকো ডাকো আমারে,
তোমার স্নিগ্ধ শীতল গভীর
পবিত্র আঁধারে।
তুচ্ছ দিনের ক্লান্তি গ্লানি
দিতেছে জীবন ধুলাতে টানি,
সারাক্ষণের বাক্যমনের
সহস্র বিকারে।

মুক্ত করো হে মুক্ত করো আমারে,
তোমার নিবিড় নীরব উদার
অনন্ত আঁধারে।

নীরব রাত্রে হারাইয়া বাক্
বাহির আমার বাহিরে মিশাক,
দেখা দিক মম অন্তরতম
অখণ্ড আকারে।

৭ আষাঢ় ১৩১৭

৯৬

যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।
সোনার ঘটে সূর্য তারা
নিচ্ছে তুলে আলোর ধারা,
অনন্ত প্রাণ ছড়িয়ে পড়ে গগনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।

যেথায় তুমি বস দানের আসনে,
চিত্ত আমার সেথায় যাবে কেমনে।
নিত্য নূতন রসে ঢেলে
আপনাকে যে দিচ্ছ মেলে,
সেথা কি ডাক পড়বে না গো জীবনে।
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে।

৮ আষাঢ় ১৩১৭

৯৭

ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান,
হে আমার নাথ, এই তো তোমার দান
ওগো সে ফুল দেখিয়া আনন্দে আমি ভাসি,
আমার বলিয়া উপহার দিতে আসি,
তুমি নিজ হাতে তারে তুলে লও স্নেহে হাসি,
র প্রভু রাখো মোর অভিমান।

তার পরে যদি পূজার বেলার শেষে
এ গান ঝরিয়া ধরার ধুলায় মেশে,
তবে ক্ষতি কিছু নাই— তব করতলপুটে
অজস্র ধন কত লুটে কত টুটে,
তারা আমার জীবনে ক্ষণকালতরে ফুটে,
চিরকালতরে সার্থক করে প্রাণ।

৯ আষাঢ় ১৩১৭

৯৮

মুখ ফিরায়ে রব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল করো প্রাণে।
কেবল থাকা, কেবল চেয়ে থাকা,
কেবল আমার মনটি তুলে রাখা,
সকল ব্যথা সকল আকাঙ্ক্ষায়
সকল দিনের কাজেরি মাঝখানে।
নানা ইচ্ছা ধায় নানা দিক -পানে,
একটি ইচ্ছা সফল করো প্রাণে।
সেই ইচ্ছাটি রাতের পরে রাতে
জাগে যেন একের বেদনাতে,
দিনের পরে দিনকে যেন গাঁথে
একের সূত্রে এক আনন্দগানে।

১০ আষাঢ় ১৩১৭

৯৯

আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে—
আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।
এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি
পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি
নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে।
আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে

রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের 'পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।
এসেছে এসেছে এই কথা বলে প্রাণ,
এসেছে এসেছে উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে।

১০ আষাঢ় ১৩১৭

১০০

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ;
চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ ক'রে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে,
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

পুঞ্জে পুঞ্জে দূর সুদূরের পানে
দলে দলে চলে, কেন চলে নাহি জানে।
জানে না কিছুই কোন্ মহাদ্রিতলে
গভীর শ্রাবণে গলিয়া পড়িবে জলে,
নাহি জানে তার ঘনঘোর সমারোহে
কোন্ সে ভীষণ জীবন-মরণ রাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

ঈশান কোণেতে ওই যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কী করিছে কানাকানি।
দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা
স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে

ঘনায়ে উঠিছে কোন্ আসন্ন কাজে।
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

১১ আষাঢ় ১৩১৭

১০১

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি,
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।

১৩ আষাঢ় ১৩১৭

১০২

এই মোর সাধ যেন এ জীবনমাঝে
তব আনন্দ মহাসংগীতে বাজে।
তোমার আকাশ, উদার আলোকধারা,
দ্বার ছোটো দেখে ফেরে না যেন গো তারা,

ছয় ঋতু যেন সহজ নৃত্যে আসে
অন্তরে মোর নিত্য নূতন সাজে।

তব আনন্দ আমার অঙ্গে মনে
বাধা যেন নাহি পায় কোনো আবরণে।
তব আনন্দ পরম দুঃখে মম
জ্বলে উঠে যেন পুণ্য আলোকসম,
তব আনন্দ দীনতা চূর্ণ করি'
ফুটে উঠে ফেটে আমার সকল কাজে।

১৩ আষাঢ় ১৩১৭

১০৩

একলা আমি বাহির হলেম
তোমার অভিসারে,
সাথে সাথে কে চলে মোর
নীরব অন্ধকারে।
ছাড়াতে চাই অনেক করে
ঘুরে চলি, যাই যে সরে,
মনে করি আপদ গেছে,
আবার দেখি তারে।

ধরণী সে কাঁপিয়ে চলে—
বিষম চঞ্চলতা।
সকল কথার মধ্যে সে চায়
কইতে আপন কথা।
সে যে আমার আমি, প্রভু,
লজ্জা তাহার নাই যে কভু,
তারে নিয়ে কোন্ লাজে বা
যাব তোমার দ্বারে।

১৪ আষাঢ় ১৩১৭

১০৪

আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে।
নীচে সব নীচে এ ধূলির ধরণীতে
যেথা আসনের মূল্য না হয় দিতে,
যেথা রেখা দিয়ে ভাগ করা নেই কিছু
যেথা ভেদ নাই মানে আর অপমানে,
স্থান দাও সেথা সকলের মাঝখানে।

যেথা বাহিরের আবরণ নাহি রয়,
যেথা আপনার উলঙ্গ পরিচয়।
আমার বলিয়া কিছু নাই একেবারে,
এ সত্য যেথা নাহি ঢাকে আপনারে,
সেথায় দাঁড়ায়ে নিলাজ দৈন্য মম
ভরিয়া লইব তাঁহার পরম দানে।
স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে

১৫ আষাঢ় ১৩১৭

১০৫

আর আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।
আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে
রইব না।
এই বোঝা তোমার পায়ে ফেলে
বেরিয়ে পড়ব অবহেলে—
কোনো খবর রাখব না ওর,
কোনো কথাই কইব না
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।

বাসনা মোর যারেই পরশ
করে সে,
আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে
নিমেষে।
ওরে সেই অশুচি, দুই হাতে তার
যা এনেছে চাই নে সে আর,
তোমার প্রেমে বাজবে না যা
সে আর আমি সইব না।
আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।

১৫ আষাঢ় ১৩১৭

১০৬

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে
নমি নর-দেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যান-গম্ভীর এই যে ভূধর,
নদীজপমালাধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র
ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি
উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত
যারা এসেছিল সবে,
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে
কেহ নহে নহে দূর,
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে
তারি বিচিত্র সুর।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো,
ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো,
বন্ধ নাশিবে, তারাও আসিবে
দাঁড়াবে ঘিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে
দুখের রক্ত শিখা,
হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে
আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন,
শোনো রে একের ডাক।
যত লাজ ভয় করো করো জয়
অপমান দূরে যাক।
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা
তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

১৮ আষাঢ় ১৩১৭

১০৭

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি,
প্রণাম আমার কোন্‌খানে যায় থামি,
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

অহংকার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের'
রিক্তভূষণ দীনদরিদ্র সাজে—

সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি—
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গিহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে,
সব-হারাদের মাঝে।

১৯ আষাঢ় ১৩১৭

১০৮

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে
ধুলায় সে যায় বয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও না কি
নেমেছে ধুলার তলে হীন পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক',
এখনো সরিয়া থাক',
আপনারে বেঁধে রাখ' চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।

২০ আষাঢ় ১৩১৭

১০৯

ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।
অন্ধকার যায় বুঝি কেটে,
ওরে আর নেই ভয়।
ওই দেখ্ পূর্বাশার ভালে
নিবিড় বনের অন্তরালে
শুকতারা হয়েছে উদয়।
ওরে আর নেই ভয়

এরা যে কেবল নিশাচর—
অবিশ্বাস আপনার 'পর,
নিরাশ্বাস, আলস্য সংশয়,
এরা প্রভাতের নয়।
ছুটে আয়, আয় রে বাহিরে,
চেয়ে দেখ্, দেখ্ ঊর্দ্ধশিরে,
আকাশ হতেছে জ্যোতির্ম্ময়।
ওরে আর নেই ভয়।

২১ আষাঢ় ১৩১৭

১১০

আছ আমার হৃদয় আছ ভরে
এখন তুমি যা-খুশি তাই করো।
এমনি যদি বিরাজ অন্তরে
বাহির হতে সকলি মোর হরো।
সব পিপাসার যেথায় অবসান
সেথায় যদি পূর্ণ কর প্রাণ,
তাহার পরে মরুপথের মাঝে
উঠে রৌদ্র উঠুক খরতর।

এই যে খেলা খেলছ কত ছলে
এই খেলা তো আমি ভালোবাসি।
এক দিকেতে ভাসাও আঁখিজলে
আরেক দিকে জাগিয়ে তোল হাসি।
যখন ভাবি সব খোয়ালেম বুঝি,
গভীর করে পাই তাহারে খুঁজি,
কোলের থেকে যখন ফেল দূরে
বুকের মাঝে আবার তুলে ধর।

রেলপথে। ই. আই. আর.
২১ আষাঢ় ১৩১৭

১১১

গর্ব করে নিই নে ও নাম, জান অন্তর্যামী,
আমার মুখে তোমার নাম কি সাজে।
যখন সবাই উপহাসে তখন ভাবি আমি
আমার কণ্ঠে তোমার নাম কি বাজে।
তোমা হতে অনেক দূরে থাকি
সে যেন মোর জানতে না রয় বাকি,
নামগানের এই ছদ্মবেশে দিই পরিচয় পাছে
মনে মনে মরি যে সেই লাজে।

অহংকারের মিথ্যা হতে বাঁচাও দয়া করে
রাখো আমায় যেথা আমার স্থান।
আর-সকলের দৃষ্টি হতে সরিয়ে দিয়ে মোরে
করো তোমার নত নয়ন দান।
আমার পূজা দয়া পাবার তরে,
মান যেন সে না পায় কারো ঘরে,
নিত্য তোমায় ডাকি আমি ধুলার 'পরে বসে
নিত্যনূতন অপরাধের মাঝে।

রেলপথ। ই. বি. এস. আর.
২২ আষাঢ় ১৩১৭

১১২

কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে।
জীবনে তুই যা নিয়েছিস
মরণে সব নিতে হবে।
এই ভরা ভাণ্ডারে এসে
শূন্য কি তুই যাবি শেষে।
নেবার মতো যা আছে তোর
ভালো করে নে তুই তবে।

আবর্জনার অনেক বোঝা
জমিয়েছিস যে নিরবধি,
বেঁচে যাবি, যাবার বেলা
ক্ষয় করে সব যাস রে যদি।
এসেছি এই পৃথিবীতে,
হেথায় হবে সেজে নিতে,
রাজার বেশে চল্ রে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৩

নদীপারের এই আষাঢ়ের
প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।
সবুজ নীলে সোনায় মিলে
যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে,
জাগিয়ে দিলে আকাশতলে
গভীর বাণী—
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

এমনি করে চলতে পথে
ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব
নিস রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস দিবস-রাতে,

প্রতি দিনটি যতন করে
ভাগ্য মানি,
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৪

মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কী ধন দিবে উহারে।
ভরা আমার পরানখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

কত শরৎ-বসন্ত-রাত,
কত সন্ধ্যা, কত প্রভাত
জীবনপাত্রে কত যে রস বরষে ;
কতই ফলে কতই ফুলে
হৃদয় আমার ভরি তুলে
দুঃখসুখের আলোছায়ার পরশে।
যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

শিলাইদহ
২৫ আষাঢ় ১৩১৭

১১৫

দয়া করে ইচ্ছা করে আপনি ছোটো হয়ে
এসো তুমি এ ক্ষুদ্র আলয়ে।
তাই তোমার মাধুর্যসুধা
ঘুচায় আমার আঁখির ক্ষুধা,

জলে স্থলে দাও যে ধরা
কত আকার লয়ে।

বন্ধু হয়ে পিতা হয়ে জননী হয়ে
আপনি তুমি ছোটো হয়ে এসো হৃদয়ে।
আমিও কি আপন হাতে
করব ছোটো বিশ্বনাথে।
জানাব আর জানব তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে ?

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৬

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
সারা জনম তোমার লাগি
প্রতিদিন যে আছি জাগি,
তোমার তরে বহে বেড়াই
দুঃখসুখের ব্যথা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।
যা পেয়েছি, যা হয়েছি
যা-কিছু মোর আশা।
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবনবধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা;
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

বরণমালা গাঁথা আছে,
আমার চিত্তমাঝে,
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই-বা আপন, কেই-বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

শিলাইদহ
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৭

যাত্রী আমি ওরে।
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে,
বাঁধা এ-ঘর রইবে কোথায় পিছে,
বিষয়বোঝা টানে আমায় নীচে,
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে।

যাত্রী আমি ওরে।
চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে।
দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার,
ছিন্ন হবে শিকল বাসনার,
ভালোমন্দ কাটিয়ে হব পার
চলতে রব লোকে লোকান্তরে।

যাত্রী আমি ওরে।
যা-কিছু ভার যাবে সকল সরে।

আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল-সাঁঝে পরান মম টানে
কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে

যাত্রী আমি ওরে—
বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।
তখন কোথাও গায় নি কোনো পাখি,
কী জানি রাত কতই ছিল বাকি,
নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি
জেগেছিল অন্ধকারের 'পরে।

যাত্রী আমি ওরে।
কোন্ দিনান্তে পৌঁছব কোন্ ঘরে।
কোন্ তারকা দীপ জ্বালে সেইখানে,
বাতাস কাঁদে কোন্ কুসুমের ঘ্রাণে,
কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু-নয়ানে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।

গোরাই নদী
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৮

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই যে তিনি, ওই যে বাহির পথে।
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি,
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি।
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নে রে কোনোমতে।

কোথায় কী তোর আছে ঘরের কাজ,
সে-সব কথা ভুলতে হবে আজ।

টান্ রে দিয়ে সকল চিত্তকায়া,
টান্ রে ছেড়ে তুচ্ছ প্রাণের মায়া,
চল্ রে টেনে আলোয় অন্ধকারে
নগর গ্রামে অরণ্যে পর্বতে।

ওই যে চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ।
গাইছে না মন মরণজয়ী গান ?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো
ছুটছে না কি বিপুল ভবিষ্যতে।

গোরাই
২৬ আষাঢ় ১৩১৭

১১৯

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক্ পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে
দেবতা নাই ঘরে।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধুলার 'পরে।

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান থাক্‌ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

কয়া। গোরাই
২৭ আষাঢ় ১৩১৭

১২০

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

তোমায় আমায় মিলন হলে
সকলি যায় খুলে—
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে
উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই তো ছায়া,
আমার মাঝে পায় সে কায়া,

হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

জানিপুর। গোরাই
২৭ আষাঢ় ১৩১৭

১২১

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে
তবু আমার হৃদয় লাগি
ফিরছ কত মনোহরণ-বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।
তাই তো, প্রভু, হেথায় এল নেমে,
তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে,
মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

জানিপুর। গোরাই
২৮ আষাঢ় ১৩১৭

১২২

মানের আসন, আরামশয়ন
নয় তো তোমার তরে।
সব ছেড়ে আজ খুশি হয়ে
চলো পথের 'পরে।
এসো বন্ধু তোমরা সবে
একসাথে সব বাহির হবে,
আজকে যাত্রা করব মোরা
অমানিতের ঘরে।

নিন্দা পরব ভূষণ করে
কাঁটার কণ্ঠহার,
মাথায় করে তুলে লব
অপমানের ভার।
দুঃখীর শেষ আলয় যেথা
সেই ধুলাতে লুটাই মাথা,
ত্যাগের শূন্যপাত্রটি নিই
আনন্দরস ভরে।

গোরাই
২৯ আষাঢ় ১৩১৭

১২৩

প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় ছিল যে লুকানো
বিপুল বল।
কোথায় বর্ম, অস্ত্র কোথায়,
ক্ষীণ দরিদ্র অতি অসহায়,
চারি দিক হতে এসেছে আঘাত
অনর্গল,
প্রভুগৃহ হতে আসিলে যেদিন
বীরের দল।

প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল
সেদিন কোথায় লুকাল আবার
বিপুল বল।
ধনুশর অসি কোথা গেল খসি,
শান্তির হাসি উঠিল বিকশি;
চলে গেলে রাখি সারা জীবনের
সকল ফল,
প্রভুগৃহমাঝে ফিরিলে যেদিন
বীরের দল।

কলিকাতা
৩১ আষাঢ় ১৩১৭

১২৪

ভেবেছিনু মনে যা হবার তারি শেষে
যাত্রা আমার বুঝি থেমে গেছে এসে।
নাই বুঝি পথ, নাই বুঝি আর কাজ,
পাথেয় যা ছিল ফুরায়েছে বুঝি আজ,
যেতে হবে সরে নীরব অন্তরালে
জীর্ণ জীবনে ছিন্ন মলিন বেশে।

কী নিরখি আজি, এ কী অফুরান লীলা,
এ কী নবীনতা বহে অন্তঃশীলা।
পুরাতন ভাষা মরে এল যবে মুখে,
নবগান হয়ে গুমরি উঠিল বুকে,
পুরাতন পথ শেষ হয়ে গেল যেথা
সেথায় আমারে আনিলে নূতন দেশে।

কলিকাতা। ঠিকাগাড়িতে
৩১ আষাঢ় ১৩১৭

১২৫

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার,
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝংকার।

তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি'
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার।

কলিকাতা
১ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৬

নিন্দা দুঃখে অপমানে
যত আঘাত খাই
তবু জানি কিছুই সেথা
হারাবার তো নাই।
থাকি যখন ধূলার 'পরে
ভাবতে না হয় আসনতরে,
দৈন্যমাঝে অসংকোচে
প্রসাদ তব চাই।

লোকে যখন ভালো বলে,
যখন সুখে থাকি,
জানি মনে তাহার মাঝে
অনেক আছে ফাঁকি।
সেই ফাঁকিরে সাজিয়ে লয়ে
ঘুরে বেড়াই মাথায় বয়ে,
তোমার কাছে যাব এমন
সময় নাহি পাই।

বোলপুর
২ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৭

রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে
পরাও যারে মণিরতন-হার—
খেলাধুলা আনন্দ তার সকলি যায় ঘুরে,
বসন-ভূষণ হয় যে বিষম ভার।
ছেঁড়ে পাছে আঘাত লাগি,
পাছে ধুলায় হয় সে দাগি,
আপনাকে তাই সরিয়ে রাখে সবার হতে দূরে,
চলতে গেলে ভাবনা ধরে তার—
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার।

কী হবে মা অমনতরো রাজার মতো সাজে,
কী হবে ওই মণিরতন-হারে।
দুয়ার খুলে দাও যদি তো ছুটি পথের মাঝে
রৌদ্রবায়ু-ধুলাকাদার পাড়ে।
যেথায় বিশ্বজনের মেলা
সমস্ত দিন নানান খেলা,

চারি দিকে বিরাট গাথা বাজে হাজার সুরে,
সেথায় সে যে পায় না অধিকার,
রাজার মতো বেশে তুমি সাজাও যে শিশুরে,
পরাও যারে মণিরতন-হার।

বোলপুর
২ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৮

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে।
এই বেসুরো জটিলতায়
পরান আমার মরে ব্যথায়,
হঠাৎ আমার গান থেমে যায়
বারে বারে।
জীবনবীণা ঠিক সুরে আর
বাজে না রে।

এই বেদনা বইতে আমি
পারি না যে,
তোমার সভার পথে এসে
মরি লাজে।
তোমার যারা গুণী আছে
বসতে নারি তাদের কাছে,
দাঁড়িয়ে থাকি সবার পাছে
বাহির-দ্বারে।
জীবনবীণা ঠিক সুরে আর
বাজে না রে।

বোলপুর
৩ শ্রাবণ ১৩১৭

১২৯

গাবার মতো হয় নি কোনো গান,
দেবার মতো হয় নি কিছু দান।
মনে যে হয় সবি রইল বাকি
তোমায় শুধু দিয়ে এলেম ফাঁকি,
কবে হবে জীবন পূর্ণ করে
এই জীবনের পূজা অবসান।

আর-সকলের সেবা করি যত
প্রাণপণে দিই অর্ঘ্য ভরি ভরি।
সত্য মিথ্যা সাজিয়ে দিই যে কত
দীন বলিয়া পাছে ধরা পড়ি।
তোমার কাছে গোপন কিছু নাই,
তোমার পূজায় সাহস এত তাই,
যা আছে তাই পায়ের কাছে আনি
অনাবৃত দরিদ্র এই প্রাণ।

৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩০

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।

সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে,
দুঃখসুখের বিচিত্র জীবনে
তুমি ছাড়া আর কিছু না রবে

৭ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩১

দুঃস্বপন কোথা হতে এসে
জীবনে বাধায় গণ্ডগোল।
কেঁদে উঠে জেগে দেখি শেষে
কিছু নাই আছে মার কোল।
ভেবেছিনু আর-কেহ বুঝি,
ভয়ে তাই প্রাণপণে যুঝি,
তব হাসি দেখে আজ বুঝি
তুমিই দিয়েছ মোরে দোল

এ জীবন সদা দেয় নাড়া
লয়ে তার সুখ দুখ ভয়;
কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া,
সেই যেন মোর সমুদয়।
এ ঘোর কাটিয়া যাবে চোখে
নিমেষেই প্রভাত-আলোকে,
পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে
থেমে যাবে সকল কল্লোল।

৮ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩২

গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি
বাহির মনে
চিরদিবস মোর জীবনে।
নিয়ে গেছে গান আমারে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে,
গান দিয়ে হাত বুলিয়ে বেড়াই
এই ভুবনে।

কত শেখা সেই শেখালো,
কত গোপন পথ দেখালো,
চিনিয়ে দিল কত তারা
হৃদ্‌গগনে।
বিচিত্র সুখদুখের দেশে
রহস্যলোক ঘুরিয়ে শেষে
সন্ধ্যাবেলায় নিয়ে এল
কোন্‌ ভবনে।

৯ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৩

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চলে যাব নবজীবন-লোকে,
নূতন দেখা জাগবে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন-ডোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই,
বারে বারে নূতন লীলা তাই।
আবার তুমি জানি নে কোন্ বেশে
পথের মাঝে দাঁড়াবে, নাথ, হেসে,
আমার এ হাত ধরবে কাছে এসে,
লাগবে প্রাণে নূতন ভাবের ঘোর।
তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর।

১০ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৪

যেন শেষ গানে মোর সব রাগিণী পূরে—
আমার সব আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
অধীর হয়ে তরুলতায় ঘাসে,
যে আনন্দে দুই পাগলের মতো
জীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্ট হেসে।
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে
দুঃখ-ব্যথার রক্তশতদলে,
যা আছে সব ধুলায় ফেলে দিয়ে
যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৫

যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে,
মনে করি আর পাব না ছাড়া।
যখন আমায় ফেল তুমি নীচে,
মনে করি আর হব না খাড়া।
আবার তুমি দাও যে বাঁধন খুলে,
আবার তুমি নাও আমারে তুলে,
চিরজীবন বাহু-দোলায় তব
এমনি করে কেবলি দাও নাড়া।

ভয় লাগায়ে তন্দ্রা কর ক্ষয়,
ঘুম ভাঙায়ে তখন ভাঙ ভয়।
দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে,
তাহার পরে লুকাও যে কোন্‌খানে,
মনে করি এই হারালেম বুঝি,
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া।

১১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৬

যতকাল তুই শিশুর মতো
রইবি বলহীন,
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।
অল্প ঘায়ে পড়বি ঘুরে,
অল্প দাহে মরবি পুড়ে,
অল্প গায়ে লাগলে ধুলা
করবে যে মলিন—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্ রে ততদিন।

যখন তোমার শক্তি হবে
উঠবে ভরে প্রাণ
আগুন-ভরা সুধা তাঁহার
করবি যখন পান—
বাইরে তখন যাস রে ছুটে,
থাকবি শুচি ধুলায় লুটে,
সকল বাঁধন অঙ্গে নিয়ে
বেড়াবি স্বাধীন—
অন্তরেরি অন্তঃপুরে
থাক্‌ রে ততদিন।

১৪ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৭

আমার চিত্ত তোমায় নিত্য হবে
সত্য হবে—
ওগো সত্য, আমার এমন সুদিন
ঘটবে কবে।
সত্য সত্য সত্য জপি,
সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি,
সীমার বাঁধন পেরিয়ে যাব
নিখিল ভবে,
সত্য, তোমার পূর্ণ প্রকাশ
দেখব কবে।

তোমায় দূরে সরিয়ে, মরি
আপন অসত্যে।
কী যে কাণ্ড করি গো সেই
ভূতের রাজত্বে।

আমার আমি ধুয়ে মুছে
তোমার মধ্যে যাবে ঘুচে,
সত্য, তোমায় সত্য হব
বাঁচব তবে,
তোমার মধ্যে মরণ আমার
মরবে কবে।

১৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৮

তোমায় আমার প্রভু করে রাখি
আমার আমি সেইটুকু থাক্‌ বাকি।
তোমায় আমি হেরি সকল দিশি,
সকল দিয়ে তোমার মাঝে মিশি,
তোমারে প্রেম জোগাই দিবানিশি,
ইচ্ছা আমার সেইটুকু থাক্‌ বাকি—
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

তোমায় আমি কোথাও নাহি ঢাকি
কেবল আমার সেইটুকু থাক্‌ বাকি।
তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে,
রইব বাঁধা তোমার বাহুডোরে
বাঁধন আমার সেইটুকু থাক্‌ বাকি—
তোমায় আমার প্রভু করে রাখি।

১৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৩৯

যা দিয়েছ আমার এ প্রাণ ভরি
খেদ রবে না এখন যদি মরি।
রজনীদিন কত দুঃখে সুখে
কত যে সুর বেজেছে এই বুকে,
কত বেশে আমার ঘরে ঢুকে
কত রূপে নিয়েছ মন হরি,
খেদ রবে না এখন যদি মরি।

জানি তোমায় নিই নি প্রাণে বরি,
পাই নি আমার সকল পূর্ণ করি।
যা পেয়েছি ভাগ্য বলে মানি,
দিয়েছ তো তব পরশখানি,
আছ তুমি এই জানা তো জানি—
যাব ধরি সেই ভরসার তরী।
খেদ রবে না এখন যদি মরি।

১৬ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪০

ওরে মাঝি, ওরে আমার
মানবজন্মতরীর মাঝি,
শুনতে কি পাস দূরের থেকে
পারের বাঁশি উঠছে বাজি।
তরী কি তোর দিনের শেষে
ঠেকবে এবার ঘাটে এসে।
সেথায় সন্ধ্যা-অন্ধকারে
দেয় কি দেখা প্রদীপরাজি

যেন আমার লাগছে মনে,
মন্দমধুর এই পবনে
সিন্ধুপারের হাসিটি কার
আঁধার বেয়ে আসছে আজি।
আসার বেলায় কুসুমগুলি
কিছু এনেছিলেম তুলি,
যেগুলি তার নবীন আছে
এইবেলা নে সাজিয়ে সাজি।

১৮ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪১

মনকে, আমার কায়াকে,
আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই এ কালো ছায়াকে।
ওই আগুনে জ্বলিয়ে দিতে,
ওই সাগরে তলিয়ে দিতে,
ওই চরণে গলিয়ে দিতে,
দলিয়ে দিতে মায়াকে—
মনকে, আমার কায়াকে।

যেখানে যাই সেথায় একে
আসন জুড়ে বসতে দেখে
লাজে মরি, লও গো হরি
এই সুনিবিড় ছায়াকে।
মনকে, আমার কায়াকে।

তুমি আমার অনুভাবে
কোথাও নাহি বাধা পাবে,
পূর্ণ একা দেবে দেখা
সরিয়ে দিয়ে মায়াকে।
মনকে, আমার কায়াকে।

১৯ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪২

যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই—
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র-মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই—
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

২০ শ্রাবণ ১৩১৭

যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।
এই জ্যোতিঃসমুদ্র মাঝে
যে শতদল পদ্ম রাজে,
তারি মধু পান করেছি
ধন্য আমি তাই
যাবার দিনে এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।
বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে
দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি
শেষ করে দিন তাই—
যাবার বেলা এই কথাটি
জানিয়ে যেন যাই।

গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সংগ্রহ

১৪৩

আমার নামটা দিয়ে ঢেকে রাখি যারে
মরছে সে এই নামের কারাগারে।
সকল ভুলে যতই দিবারাতি
নামটারে ওই আকাশপানে গাঁথি,
ততই আমার নামের অন্ধকারে
হারাই আমার সত্য আপনারে।

জড়ো করে ধূলির 'পরে ধূলি
নামটারে মোর উচ্চ করে তুলি।
ছিদ্র পাছে হয় রে কোনোখানে
চিত্ত মম বিরাম নাহি মানে,
যতন করি যতই এ মিথ্যারে
ততই আমি হারাই আপনারে।

২১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৪

নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে—
আপনগড়া স্বপন হতে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।
ঢেকে তোমার হাতের লেখা
কাটি নিজের নামের রেখা,
কতদিন আর কাটবে জীবন
এমন ভীষণ আপদ বয়ে।

সবার সজ্জা হরণ করে
আপনাকে সে সাজাতে চায়।
সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে
আপনাকে সে বাজাতে চায়।

আমার এ নাম যাক না চুকে,
তোমারি নাম নেব মুখে,
সবার সঙ্গে মিলব সেদিন
বিনা-নামের পরিচয়ে।

২১ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৫

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,
এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,
তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা
ফেলিয়া দিতে পারি না যে।

তোমারে আবরিয়া ধুলাতে ঢাকে হিয়া
মরণ আনে রাশি রাশি,
আমি যে প্রাণ ভরি তাদের ঘৃণা করি
তবুও তাই ভালোবাসি।
এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি,
কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি,
আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই
ভয় যে আসে মনোমাঝে।

২২ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৬

তোমার দয়া যদি
চাহিতে নাও জানি
তবুও দয়া করে
চরণে নিয়ো টানি।
আমি যা গড়ে তুলে
আরামে থাকি ভুলে
সুখের উপাসনা
করি গো ফলে ফুলে—
সে ধুলা-খেলাঘরে
রেখো না ঘৃণাভরে,
জাগায়ো দয়া করে
বহ্নি-শেল হানি।

সত্য মুদে আছে
দ্বিধার মাঝখানে,
তাহারে তুমি ছাড়া
ফুটাতে কে বা জানে।
মৃত্যু ভেদ করি'
অমৃত পড়ে ঝরি',
অতল দীনতার
শূন্য উঠে ভরি'।
পতন-ব্যথা মাঝে
চেতনা আসি বাজে,
বিরোধ কোলাহলে
গভীর তব বাণী।

২২ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৭

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে
ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে
হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।

জীবনে আজো যাহা
রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও
হয় নি মিছে।
আমার অনাগত
আমার অনাহত
তোমার বীণা-তারে
বাজিছে তারা—
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৮

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে

ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক্
তব ভবন-দ্বারে।

নানা সুরের আকুলধারা
মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক
নীরব পারাবারে।

হংস যেমন মানসযাত্রী,
তেমনি সারা দিবসরাত্রি
একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক
মহামরণ-পারে।

২৩ শ্রাবণ ১৩১৭

১৪৯

জীবনে যা চিরদিন
রয়ে গেছে আভাসে
প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে,
জীবনের শেষ দানে
জীবনের শেষ গানে,
হে দেবতা, তাই আজি
দিব তব সকাশে,

প্রভাতের আলোকে যা
ফোটে নাই প্রকাশে।

কথা তারে শেষ করে
পারে নাই বাঁধিতে,
গান তারে সুর দিয়ে
পারে নাই সাধিতে।
কী নিভৃতে চুপে চুপে
মোহন নবীনরূপে
নিখিল নয়ন হতে
ঢাকা ছিল, সখা, সে।
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

ভ্রমেছি তাহারে লয়ে
দেশে দেশে ফিরিয়া,
জীবনে যা ভাঙাগড়া
সবি তারে ঘিরিয়া।
সব ভাবে সব কাজে
আমার সবার মাঝে
শয়নে স্বপনে থেকে
তবু ছিল একা সে
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

কত দিন কত লোকে
চেয়েছিল উহারে,
বৃথা ফিরে গেছে তারা
বাহিরের দুয়ারে।

আর কেহ বুঝিবে না,
তোমা সাথে হবে চেনা
সেই আশা লয়ে ছিল
আপনারি আকাশে,
প্রভাতের আলোকে তো
ফোটে নাই প্রকাশে।

২৪ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫০

তোমার সাথে নিত্য বিরোধ
আর সহে না—
দিনে দিনে উঠছে জমে
কতই দেনা।
সবাই তোমায় সভার বেশে
প্রণাম করে গেল এসে,
মলিন বাসে লুকিয়ে বেড়াই
মান রহে না।

কী জানাব চিত্তবেদন,
বোবা হয়ে গেছে যে মন,
তোমার কাছে কোনো কথাই
আর কহে না।
ফিরায়ো না এবার তারে
লও গো অপমানের পারে,
করো তোমার চরণতলে
চির-কেনা।

বোলপুর
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫১

প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে ;
অনেক দেরি হয়ে গেল,
দোষী অনেক দোষে।
বিধিবিধান-বাঁধনডোরে
ধরতে আসে, যাই যে সরে,
তার লাগি যা শাস্তি নেবার
নেব মনের তোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

লোকে আমায় নিন্দা করে,
নিন্দা সে নয় মিছে,
সকল নিন্দা মাথায় ধরে
রব সবার নীচে।
শেষ হয়ে যে গেল বেলা,
ভাঙল বেচা-কেনার মেলা,
ডাকতে যারা এসেছিল
ফিরল তারা রোষে।
প্রেমের হাতে ধরা দেব
তাই রয়েছি বসে।

২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫২

সংসারেতে আর-যাহারা
আমায় ভালোবাসে
তারা আমায় ধরে রাখে
বেঁধে কঠিন পাশে।

তোমার প্রেম যে সবার বাড়া
তাই তোমারি নূতন ধারা,
বাঁধ নাকো, লুকিয়ে থাক'
ছেড়েই রাখ দাসে।

আর-সকলে, ভুলি পাছে
তাই রাখে না একা।
দিনের পরে কাটে যে দিন,
তোমারি নেই দেখা।
তোমায় ডাকি নাই বা ডাকি,
যা খুশি তাই নিয়ে থাকি ;
তোমার খুশি চেয়ে আছে
আমার খুশির আশে।

ই. আই. আর. রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৩

প্রেমের দূতকে পাঠাবে নাথ কবে।
সকল দ্বন্দ্ব ঘুচবে আমার তবে।

আর-যাহারা আসে আমার ঘরে
ভয় দেখায়ে তারা শাসন করে,
দুরন্ত মন দুয়ার দিয়ে থাকে,
হার মানে না, ফিরায়ে দেয় সবে।

সে এলে সব আগল যাবে ছুটে,
সে এলে সব বাঁধন যাবে টুটে,
ঘরে তখন রাখবে কে আর ধরে
তার ডাকে যে সাড়া দিতেই হবে।

আসে যখন, একলা আসে চলে,
গলায় তাহার ফুলের মালা দোলে,
সেই মালাতে বাঁধবে যখন টেনে
হৃদয় আমার নীরব হয়ে রবে।

রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৪

গান গাওয়ালে আমায় তুমি
কতই ছলে যে,
কত সুখের খেলায়, কত
নয়নজলে হে।
ধরা দিয়ে দাও না ধরা,
এস কাছে, পালাও ত্বরা,
পরান কর ব্যথায় ভরা
পলে পলে হে।
গান গাওয়ালে এমনি করে
কতই ছলে যে।

কত তীব্র তারে, তোমার
বীণা সাজাও যে,
শত ছিদ্র করে জীবন
বাঁশি বাজাও হে।
তব সুরের লীলাতে মোর
জনম যদি হয়েছে ভোর,
চুপ করিয়ে রাখো এবার
চরণতলে হে,
গান গাওয়ালে চিরজীবন
কতই ছলে যে।

রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৫

মনে করি এইখানে শেষ
কোথা বা হয় শেষ
আবার তোমার সভা থেকে
আসে যে আদেশ।
নূতন গানে নূতন রাগে
নূতন করে হৃদয় জাগে,
সুরের পথে কোথা যে যাই
না পাই সে উদ্দেশ।

সন্ধ্যাবেলার সোনার আভায়
মিলিয়ে নিয়ে তান
পূরবীতে শেষ করেছি
যখন আমার গান—
নিশীথ রাতের গভীর সুরে
আবার জীবন উঠে পূরে,
তখন আমার নয়নে আর
রয় না নিদ্রালেশ।

রেলপথে
২৫ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৬

শেষের মধ্যে অশেষ আছে,
এই কথাটি, মনে
আজকে আমার গানের শেষে
জাগছে ক্ষণে ক্ষণে।

স্থর গিয়েছে থেমে, তবু
থামতে যেন চায় না কভু,
নীরবতায় বাজছে বীণা
বিনা প্রয়োজনে।

তারে যখন আঘাত লাগে,
বাজে যখন স্থরে—
সবার চেয়ে বড়ো যে গান
সে রয় বহুদূরে।

সকল আলাপ গেলে থেমে
শান্ত বীণায় আসে নেমে,
সন্ধ্যা যেমন দিনের শেষে
বাজে গভীর স্বনে।

কলিকাতা
২৬ শ্রাবণ ১৩১৭

১৫৭

দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি,
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে—
এবার তবে গভীর করে ফেলো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘন তিমিরতলে।
স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া-পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,
বসনভূষা মলিন হল ধুলায় অপমানে
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে

ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন উষাপানে
জুড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজলে।

কলিকাতা
২৯ শ্রাবণ ১৩১৭

—

গীতিমাল্য

গীতিমাল্য

১

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার-আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ওইপারে।
নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজল গভীর বাণী ;
নিকষেতে উঠল ফুটে
সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখতে না পাই,
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা,
কাঁদি আকুল ধারে।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন। নিশীথে [১৩১৭]

২

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেছি।

এই হল মোদের পাওয়া,
তাই ধরেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেছি।

আজ পারুলদিদির বনে
মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ার তলে
মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেছি।

শান্তিনিকেতন
১৩১৬ [?]

৩

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে।
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি,

নামো তালপল্লব-বীজনে
নামো জলে ছায়াছবি-সৃজনে ;
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না।
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা।

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা,
ভরি' নিশীথ-তিমির-থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে ;
আহা শ্বেতচন্দন-তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি,
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।

শান্তিনিকেতন
১৩১৬ [?]

৪

স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি
মনের মধ্যে অনেক দূরে।
ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।
গভীরধারা জলের ধারে,
আঁধার-করা বনের পারে,
সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া
উঠেছে ওই বিজন পুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

দিনের শেষে মলিন আলোয়
কোন্ নিরালা নীড়ের টানে
বিদেশবাসী হাঁসের সারি
উড়েছে সেই পারের পানে।
ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে
উদাস ধ্বনি উধাও আসে,
বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে
তান তুলেছে কোন্ নূপুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

নিচল জলে নীল নিকষে
সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,
পারাপারের সময় গেল
খেয়াতরীর নাইকো দেখা।
পশ্চিমে ওই সৌধছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি
বেদনভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

সারাটা দিন দিনের কাজে
হয় নি কিছুই দেখাশুনা,
কেবল মাথার বোঝা ব'হে
হাটের মাঝে আনাগোনা।
এখন আমায় কে দেয় আনি
কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি ;
সন্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে
ওগো আমার নয়ন ঝুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

শিলাইদহ
১৫ চৈত্র ১৩১৮

৫

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
কাজের পথে।
নইলে অভাবিতের দেখা
ঘটত না তো কোনোমতে।
এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যাওয়া-আসা,
সূর্য উঠে অস্তে মিলায়
এই রাঙা পর্বতে,
প্রতিদিনের ভার বহে যাই
এই কাজেরই পথে।

জেনেছিলেম কিছুই আমার
নাই অজানা।
যেখানে যা পাবার আছে
জানি সবার ঠিক-ঠিকানা।

ফসল নিয়ে গেছি হাটে
ধেনুর পিছে গেছি মাঠে,
বর্ষা-নদী পার করেছি
খেয়ার তরীখানা।
পথে পথে দিন গিয়েছে,
সকল পথই জানা।

সেদিন আমি জেগেছিলেম
দেখে কারে?
পসরা মোর পূর্ণ ছিল
চলেছিলেম রাজার দ্বারে।
সেদিন সবাই ছিল কাজে
গোঠের মাঝে মাঠের মাঝে,
ধরা সেদিন ভরা ছিল
পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলেম
দেখেছিলেম কারে।

সেদিন চলে যেতে যেতে
চমক লাগে।
মনে হল বনের কোণে
হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে
পথের বাঁকে বটের ছায়ে
গেল কে যে চপল-পায়ে
চকিতে মোর নয়ন দুটি
ভরিয়ে অরুণ-রাগে।
সেদিন চলে যেতে যেতে
মনে হল কেমন লাগে।

এত দিনের পথ হারালেম
এক নিমেষে ;
জানি নে তো কোথায় এলেম
একটু পথের বাইরে এসে।
দিনের পরে কেটেছে দিন
পথে পথে বিরামহীন।
জানি নে তো চলেছিলেম
হেন অচিন দেশে।
চিরকালের জানাশোনা
ঘুচল এক নিমেষে।

রইল পড়ে পসরা মোর
পথের পাশে।
চারি দিকের আকাশ আজি
দিক্‌-ভোলানো হাসি হাসে।
সকল-জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে
তাই দেখে আজ বেলা গেল
নয়ন ভরে আসে।
পসরা মোর পাসরিলাম
রইল পথের পাশে।

শিলাইদহ
১৬ চৈত্র ১৩১৮

৬

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।

ছেড়ে দে দে গো ছেড়ে,
নীরবে যা তুই হেরে,
যেখানে আছিস বসে
বসে থাক্ ভাগ্য মানি।

আমার এই আলোগুলি
নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
কেবলি তারি পিছে
তা নিয়েই থাকি ভুলি।
এবার এই আঁধারেতে
রহিলাম আঁচল পেতে,
যখনি খুশি তোমার
নিয়ো সেই আসনখানি।

শিলাইদহ
১৭ চৈত্র [১৩১৮]

৭

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে
বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশি রই আপন মনে,
বাতাস বহে
সুমন্দ।

সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রব একা।
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে
সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।

শিলাইদহ
১৭ চৈত্র ১৩১৮

৮

কোলাহল তো বারণ হল
এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ
কেবলমাত্র গানে গানে।
রাজার পথে লোক ছুটেছে,
বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,
আমার ছুটি অবেলাতেই
দিনদুপুরের মধ্যখানে,
কাজের মাঝে ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্যদিনে মৌমাছিরা
বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।

মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেছে তো দিন অনেক কেটে
অলস-বেলার খেলার সাথি
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা-কাজের ডাক পড়েছে
কেন যে তা কেই বা জানে।

শিলাইদহ
১৮ চৈত্র ১৩১৮

৯

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলে নি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হ'ত খবর আসে
উঠত হিয়া চমকে।
শুধু যেদিন দখিন হাওয়ায়
বিরহ-গান মনকে গাওয়ায়
পরান-উন্মাদনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি,
সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে।

এ কী গভীর, এ কী মধুর,
এ কী হাসি পরান-বঁধুর
এ কী নীরব চাহনি,
এ কী ঘন গহন মায়া,
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া,
নয়ন-অবগাহনি।
লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
এই নীরবে হয়ে লীনা
নিতেছে সুর কুড়ায়ে,
সপ্তলোকের আলোকধারা
এই ছায়াতে হল হারা
গেল গো তাপ জুড়ায়ে।
সকল রাজার রতন-সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
বিনা-সাজের কী বেশে।
আমার চির-জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে।

শিলাইদহ
১৯ চৈত্র ১৩১৮

১০

কে গো তুমি বিদেশী।
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজাল সুর কী দেশী।
নৃত্য তোমার দুলে দুলে,
কুন্তলপাশ পড়ছে খুলে
কাঁপছে ধরা চরণে,

ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে
ইন্দ্রধনুর বরনে।
আজকে তো আর ঘুমায় না কেউ,
জলের 'পরে লেগেছে ঢেউ,
শাখায় জাগে পাখিতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে
ধৈর্য নারি রাখিতে।

মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয় না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।
নাটের লীলা হায় গো এ কী,
পুলক জাগে আজকে দেখি
নিদ্রা-ঢাকা পাতালে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে,
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে।
লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নীচে
ফুটায়ে ভুঁইচাঁপারে।
রুদ্ধঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে।

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহার নাগিনী,
নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
তোমার এই আনন্দ-নাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে ;
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা দুলায়ে।
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন-সমীরণে,
মিলবে আলোয় আকাশে।
তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে।

শিলাইদহ
২০ চৈত্র ১৩১৮

১১

"ওগো পথিক দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্‌খানে ?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,

চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে
সেইখানে ভাই, করব গমন নিশীথে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন বেশে
কে আছে বা সেইখানে?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
শুনেছিলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন হেসে,
কিসের বিলাস সেইখানে?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
জগৎজোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে ঠাঁই নাহি তো কিছুরি;
সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে, কেই বা এসে
পথ দেখাবে সেইখানে?"
"কে জানে গো, কে জানে।

শুনেছি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি,
লেখা আছে সকল আকাশ-মাঝে গো ;
সে মন্ত্র এই প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল-সাঁঝে গো।"

শিলাইদহ
২১ চৈত্র ১৩১৮

১২

এই দুয়ারটি খোলা।
আমার খেলা খেলবে বলে
আপনি হেথায় আস চলে
ওগো আপন-ভোলা।
ফুলের মালা দোলে গলে,
পুলক লাগে চরণতলে
কাঁচা নবীন ঘাসে।
এসো আমার আপন ঘরে,
ব'সো আমার আসন 'পরে
লহ আমায় পাশে।
এমনিতরো লীলার বেশে
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
দাও আমারে দোলা।
ওঠে হাসি, নয়নবারি,
তোমায় যখন চিনতে নারি
ওগো আপন-ভোলা।

কত রাতে, কত প্রাতে,
কত গভীর বরষাতে,
কত বসন্তে,

তোমায় আমায় সকৌতুকে
কেটেছে দিন দুঃখে সুখে
কত আনন্দে।
আমার পরশ পাবে বলে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ তো জানে না তা।
রইল আকাশ অবাক মানি,
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।
মোদের দোঁহার সেই কাহিনী
ধরেছে আজ কোন্ রাগিণী
ফুলের সুগন্ধে?
সেই মিলনের চাওয়া-পাওয়া
গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওয়া
কত বসন্তে।

মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
যেন তোমায় হল মনে
ধরা পড়েছ।
মন বলেছে, "তুমি কে গো,
চেনা মানুষ চিনি নে গো,
কী বেশ ধরেছ?"
রোজ দেখেছি দিনের কাজে
পথের মাঝে ঘরের মাঝে
করছ যাওয়া-আসা;
হঠাৎ কবে এক নিমেষে
তোমার মুখের সামনে এসে
পাই নে খুঁজে ভাষা।

সেদিন দেখি পাখির গানে
কী যে বলে কেউ না জানে—
কী গুণ করেছ।
চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে
অচেনা সেই উঁকি মারে
ধরা পড়েছ।

শিলাইদহ
২২ চৈত্র ১৩১৮

১৩

এই যে এরা আঙিনাতে
এসেছে জুটি।
মাঠের গোরু গোঠে এনে
পেয়েছে ছুটি।
দোলে হাওয়া বেণুর শাখে
চিকন পাতার ফাঁকে ফাঁকে
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
উঠেছে ফুটি।

ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে
বসেছে মিলে।
তারি মাঝে তোমার আসন
তুমি যে নিলে।
আপন চেনা লোকের মতো
নাম দিয়েছে তোমায় কত,
সে-নাম ধরে ডাকে ওরা
সন্ধ্যা নামিলে।

মানীর দ্বারে মান ওরা হায়
পায় না তো কেহ।
ওদের তরে রাজার ঘরে
বন্ধ যে গেহ।
জীর্ণ আঁচল ধুলায় পাতে,
বসিয়ে তোমায় নৃত্যে মাতে,
কোন্ ভরসায় চরণ ধরে
মলিন ওই দেহ।

রাতের পাখি উঠছে ডাকি
নদীর কিনারে।
কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের রেখা
বনের ওপারে।
গাছে গাছে জোনাক জ্বলে,
পল্লীপথে লোক না চলে,
শূন্য মাঠে শৃগাল হাঁকে
গভীর আঁধারে।

জ্বলে নেভে কত সূর্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।
তারি মাঝে আঁধার রাতে
পল্লীঘরের আঙিনাতে
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার
উঠছে গগনে।

শিলাইদহ
২৩ চৈত্র ১৩১৮

১৪

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম-আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে।

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে—
বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর।

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বলব আমি ব'লে
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"র স্রোত বহে যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গ'লে।

শিলাইদহ
২৪ চৈত্র ১৩১৮

১৫

আমি আমায় করব বড়ো
এই তো আমার মায়া—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙিন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সুরে,
আপনারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

বিরহ-গান উঠল বেজে
বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্নাহাসি
কতই আশা-ভয়
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন পরাজয়।

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা—
এরি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে বসলে সেজে,
সোজা কিছু রাখলে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা।

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরনে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া-আসায়
কাটে সকল বেলা।

শিলাইদহ
২৫ চৈত্র ১৩১৮

১৬

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা,
মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল স'রে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি।

জল উঠেছে ছলছলিয়ে
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস।
সকল বাতাস সকল আকাশ
ওই পারের ওই বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি।

শিলাইদহ
২৬ চৈত্র ১৩১৮

১৭

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চমকে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন-সমীরণে।

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে।

শিলাইদহ
২৬ চৈত্র ১৩১৮

১৮

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে
মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জানিস নে তুই তা কি।
ওরে অলস, জানিস নে তুই তা কি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো,
দিস নে তারে ফাঁকি।
চিরজীবন দিস নে তারে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

প্রখর রবির তাপে
নাহয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক চারি দিক ঢাকি।
পিপাসাতে দিক চারি দিক ঢাকি।

মনের মাঝে চাহি
দেখ্‌ রে আনন্দ কি নাহি।
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি
বাজবে তোরে ডাকি।
মধুর স্বরে বাজবে তোরে ডাকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো।

শিলাইদহ
২৭ চৈত্র ১৩১৮

১৯

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি।

আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা।
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয়মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি।

হঠাৎ আকাশ উজলি'
কারে খুঁজে কে ওই চলে।
চমক লাগায় বিজলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ-গগন জুড়ে
আমার যাক সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী
কোনো বাঁধন নাহি মানি।

শিলাইদহ
২৮ চৈত্র ১৩১৮

২০

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরি কূলহারা সাগরে।

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।

অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।

শিলাইদহ
২৯ চৈত্র ১৩১৮

২১

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,
আমার পথ হল সুন্দর।
কী নিয়ে বা যাব সেথা
ওগো তোরা ভাবিস নে তা,
শূন্য হাতেই চলব, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর।

মালা পরে যাব মিলন-বেশে
আমার পথিক-সজ্জা নয়।
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে,
মনে রাখি নে সেই ভয়।
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠবে জ্বলে সন্ধ্যাতারা,
পুরবীতে করুণ বাঁশরি
দ্বারে বাজবে মধুর স্বর।

শিলাইদহ
৩০ চৈত্র ১৩১৮

২২

কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে।

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে।

শান্তিনিকেতন
৬ বৈশাখ ১৩১৯

২৩

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।

তোমারি ওই অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা বিপুল হরষে
উথলি' উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবসবিভাবরী,
হল না সারা কত না যুগ ধরি,
কেবলি আমি লব।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯

২৪

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে।

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো রবে না মধু চিরদিনতরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩১৯

২৫

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য ছুটে
সে পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে।

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে।

যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু-পবনে।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে।

শান্তিনিকেতন
৯ বৈশাখ ১৩১৯

২৬

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবি,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।

শান্তিনিকেতন
৯ বৈশাখ ১৩১৯

২৭

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।
আকাশে ওই অরুণরাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলোছায়ার
মায়ার খেলাতে।

নীলিমা এই নিলীন হল
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হতে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই
মেঘের ভেলাতে।

শান্তিনিকেতন
১৩ বৈশাখ ১৩১৯

২৮

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান।

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিত সমুদ্র
৩ জুন ১৯১২

২৯

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কী আছে কী চায় নিতে।
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে, জানি
নিয়ে যায় বহি মেঘ আবরণখানি,
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে।

সাহিত্যিকবর্গসহ রবীন্দ্রনাথ

সম্মুখে উপবিষ্ট॥ দক্ষিণ হইতে॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডায়মান॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১২ সালে বিলাতযাত্রার প্রাক্‌কালে গৃহীত ফোটোগ্রাফ। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে

নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে বাংলাদেশের সুধীসমাজ কর্তৃক রবীন্দ্র-সংবর্ধনা

শান্তিনিকেতন, নভেম্বর ১৯১৩

হিমাংশুমোহন গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ। সুপ্রভা রায়ের সৌজন্যে

নব নব রূপে বরণে বরণে ভরি
বুকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরী।
লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,
হে নিরঞ্জন, নাই বাস তারে ভালো,
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে।

The Heath
[2] Holford Road
Hampstead
২৩ জুন ১৯১২

৩০

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত-আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।

The Heath
2 Holford Road
Hampstead
২৫ জুন ১৯১২

৩১

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে ?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে হায়, আমার
দিন যে চলে যায়,
মাথার 'পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট-মাথে অস্ত্র-হাতে রাজা এল রথে।
বললে হাতে ধরে, "তোমায়
কিনব আমি জোরে।"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে।
মুকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে।

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বললে,
"কিনব দিয়ে সোনা।"
উজাড় করে দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বললে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব আমি হেসে।"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে ;
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে।

সাগরতীরে রোদ পড়েছে ঢেউ দিয়েছে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে বললে,
"অমনি নেব কিনে।"
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেইদিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে।

[508 High Street
Urbana, Illinois U. S. A.
২৪ পৌষ ১৩১৯]

৩২

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে।

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে।

16 More's Garden
Cheyne Walk, London
৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৩

অসীম ধন তো আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি
আমায় করলে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাক,
রয়েছি দ্বার এঁটে।

আমায় তুমি করবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে,
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ওই রথে,
নামবে ধুলাপথে,
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চলবে হেঁটে হেঁটে।

Cheyne Walk
৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৪

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে,
সুর তো নাহি সরে,
ওই দিকে যে মন পড়ে রয়
মন লাগে না কাজে।

তাই তো বসে আছি,
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি।
ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে
তোমার কাছে দেখাই নে মুখ
মণিমালার লাজে।

Cheyne Walk
৮ ভাদ্র ১৩২০

৩৫

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে।

মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মতো
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে।

Cheyne Walk
৯ ভাদ্র [১৩২০]

৩৬

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।
দুঃখকে আজ কঠিন বলে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।

হেথায় কারো ঠাঁই হবে না,
মনে ছিল এই ভাবনা
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন করে আপনাকে যে
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে।
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।

Cheyne Walk
৯ ভাদ্র [১৩২০]

৩৭

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত।
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিতে দু-চারটে তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত।

আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত।

Far Oakridge, Glos
১১ ভাদ্র [১৩২০]

৩৮

ভেলার মতো বুকে টানি
কলমখানি
মন যে ভেসে চলে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় দুলে
কূলে কূলে
স্রোতের কলকলে।
ভবের স্রোতের কলকলে।

এবার কেড়ে লও এ ভেলা
ঘুচাও খেলা
জলের কোলাহলে।
অধীর জলের কোলাহলে।
এবার তুমি ডুবাও তারে
একেবারে
রসের রসাতলে।
গভীর রসের রসাতলে।

S. S. City of Lahore
মধ্যধরণী সাগর
১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৩৯

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে—
সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও।

S. S. City of Lahore
মধ্যধরণী সাগর
১৪ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]

৪০

জানি গো দিন যাবে।
এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজবে বেণু,
নদীর কূলে চরবে ধেনু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু,
পাখিরা গান গাবে।
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে।

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি।
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী?

কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরানে ঢেউ তুলেছিল
কেন দিনের জ্যোতি ?
তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

সাঙ্গ যবে হবে
ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফুলে
ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা।

S. S. City of Lahore
রোহিত সাগর
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৪১

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।
কতবার যে নিবল বাতি
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা।

রোহিত সাগর
১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩

৪২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে।

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে।
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগলহেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে।

শান্তিনিকেতন
২৮ আশ্বিন ১৩২০

৪৩

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না।
নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না।

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না।

আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে সুধাসাগরসন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না।

পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেমনি করে আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না।

শান্তিনিকেতন
২৯ আশ্বিন [১৩২০]

৪৪

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহবীণার তার

বাজাক আনন্দে তোমার
নামেরি ঝংকার।
ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা।
সকল ভালোবাসায় তোমার
নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সংগোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

শান্তিনিকেতন
২ কার্তিক ১৩২০

৪৫

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে
তুমি আমার কাছে এসেছ।
কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ।

ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভালোবেসেছ।
যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

শান্তিনিকেতন
১ কার্তিক [১৩২০]

৪৬

কেবল থাকিস সরে সরে
পাস নে কিছুই হৃদয় ভরে।
আনন্দভাণ্ডারের থেকে
দূত যে তোরে গেল ডেকে,
কোণে বসে দিস নে সাড়া
সব খোয়ালি এমনি করে।

জীবনকে আজ তোল্‌ জাগিয়ে
মাঝে সবার আয় আগিয়ে।
চলিস নে পথ মেপে মেপে,
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে,
যেটুকু দিন বাকি আছে—
কাটাস নে তা ঘুমের ঘোরে।

শান্তিনিকেতন
৫ কার্তিক [১৩২০]

৪৭

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমিই আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ।

দুঃখরথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু,
তুমি সংকট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ।

শত্রু আমারে কর গো জয়
তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ।

বজ্র এসো হে বক্ষ চিরে
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ।

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০

৪৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্‌ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে?

যখ মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে ?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারি
তখন পরান আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে ?

শান্তিনিকেতন
১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

৪৯

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার অনেকদিনের আকাশ-চাওয়া
আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল করে
সুগন্ধ ধন লুটবে।

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব
দেবার মতো ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তারে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তার লুটবে।

১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

৫০

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র॥
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি॥
সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য।
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য॥
নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান॥
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র॥
জাগব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ॥

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ [১৩২০]

৫১

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা।

তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে ভাসি
চিত্তগগনপারে।

তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি
ওগো কবি
আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা
ওই মহিমা
আর যাবে না ঢাকা।

তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন-'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে।

শান্তিনিকেতন
১৪ পৌষ ১৩২০

৫২

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।

চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি
বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা।

১৫ পৌষ ১৩২০

৫৩

জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের 'পরে
কোন্ আলো ওই বেড়ায় দুলে?
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই
বসে বসে বিজন কূলে।
ভাসে তবু যায় না ভেসে,
হাসে আমার কাছে এসে,
দু-হাত বাড়াই ঝাঁপ দিতে চাই
মনে করি আনব তুলে।

শান্ত হ রে শান্ত হ মন,
ধরতে গেলে দেয় না ধরা—
নয় সে মণি নয় সে মানিক
নয় সে কুসুম ঝরে-পড়া।
দূরে কাছে আগে পাছে,
মিলিয়ে আছে ছেয়ে আছে,
জীবন হতে ছানিয়ে তারে
তুলতে গেলে মরবি ভুলে।

শান্তিনিকেতন
১৫ পৌষ ১৩২০

৫৪

কতদিন যে তুমি আমায়
ডেকেছ নাম ধরে—
কত জাগরণের বেলায়
কত ঘুমের ঘোরে।
পুলকে প্রাণ ছেয়ে সেদিন
উঠেছি গান গেয়ে,
দুটি আঁখি বেয়ে আমার
পড়েছে জল ঝরে।
দূর যে সেদিন আপন হতে
এসেছে মোর কাছে।
খুঁজি যারে, সেদিন এসে
সেই আমারে যাচে।
পাশ দিয়ে যাই চলে, যারে
যাই নে কথা বলে
সেদিন তারে হঠাৎ যেন
দেখেছি চোখ ভরে।

শান্তিনিকেতন
২৯ মাঘ ১৩২০

৫৫

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তার
পরান-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা।

আমার দুটি মুগ্ধনয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা-অতলা।

শান্তিনিকেতন
মাঘী পূর্ণিমা। ২৮ মাঘ ১৩২০

৫৬

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে
তখন দেখতে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাসো আপন আসনে।

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাব ওই চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে।

শিলাইদহ
১২ ফাল্গুন ১৩২০

৫৭

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কী জানি তার নাম।
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে,
ফিরি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাই নি তাহার দাম।

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধরে।
ভুবন ভরে আছে যেন
পাই নে জীবন ভরে।
সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে 'চাই নে, চাই নে'
বাজে অবিশ্রাম।

শিলাইদহ
১২ ফাল্গুন [১৩২০]

৫৮

বেসুর বাজে রে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন-মাঝে রে।
মেলে না সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে,
মরি লাজে রে।

থামা রে ঝংকার।
নীরব হয়ে দেখ্‌ রে চেয়ে
দেখ্‌ রে চারি ধার।
তোরি হৃদয় ফুটে আছে
মধুর হয়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ওই
তোরি কাজে রে।

শিলাইদহ
১৪ ফাল্গুন ১৩২০

৫৯

তুমি জান ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী।

টেনেছিল কতই কান্নাহাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।

শুধায় সবাই হতভাগ্য বলে
"মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে ?"
জানি জানি নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি।

শিলাইদহ
১৪ ফাল্গুন ১৩২০

৬০

সকল দাবি ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটা মনকে বোঝাই,
বুঝবে অবোধ কবে ?
নালিশ নিয়ে বেড়াস মেতে
পাস নি যা তার হিসাব পেতে,
শুনিস নে তাই ভাণ্ডারেতে
ডাক পড়ে তোর যবে।

দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায়
অশ্রু মুছে মুছে,
চোখের জলে দেখতে না পাস
দুঃখ গেছে ঘুচে।
সব আছে তোর ভরসা যে নেই,
দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ এই যে সে এই,
মাথা তুলে হাত বাড়ালেই
অমনি পাবি তবে।

শিলাইদহ
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬১

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলাশেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক,
"কি নিলি তোর দান?"
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কী বা আছে?
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই কখানি গান।

ঘরে আমার রাখতে যে হয়
বহুলোকের মন।
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য ক'রে
করব মূল্যবান।

শিলাইদহ
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬২

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার।
পথ আমারে পথ দেখাবে,
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে,
কথার কি তার অন্ত আছে।
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার।

পথের ধারে ছায়াতরু
নাই তো তাদের কথা,
শুধু তাদের ফুল-ফোটানো
মধুর ব্যাকুলতা।
দিনের আলো হলে সারা
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
শুধু প্রদীপ তুলে ধরে
কয় না কিছু আর।

শিলাইদহ
১৫ ফাল্গুন ১৩২০
সন্ধ্যা। কলিকাতায় যাত্রার পূর্বে

৬৩

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
তারি গলার মালা হতে
পাপড়ি হেথা লুটায় ছিন্ন।
এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চলে জানাল তাই,
এমন করে আমারে হায়
কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন
তখন তরুণ ছিল অরুণ-আলো,
পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙিন বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিলল না যে,
রইনু বসে ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ।

কুষ্টিয়ার মুখে। পালকি পথে
১৫ ফাল্গুন [১৩২০]

৬৪

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে,
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে,
চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখি সম,
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাকো তারে।

কলিকাতা
১৬ ফাল্গুন ১৩২০

৬৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে।

গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন-দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে
লুকিয়ে তুমি ওই গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুন-দিনের সকালে।

শান্তিনিকেতন
১৮ ফাল্গুন ১৩২০

৬৬

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন করে
ফেল আমার মুখের 'পরে
আপনি থাক আলোর পিছনে।

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন করে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে
আপনি পড়ি আলোর পিছনে।

শান্তিনিকেতন
২০ ফাল্গুন ১৩২০

৬৭

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙল ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে।

অন্ধকারে রইনু পড়ে
স্বপন-মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি।
সকালবেলায় চেয়ে দেখি
দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের 'পরে।

শান্তিনিকেতন
২৩ ফাল্গুন ১৩২০

৬৮

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে বুকের 'পরে।
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে,
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে দুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে।

যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ওই বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে ভুখের 'পরে
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে।

শান্তিনিকেতন
২৫ ফাল্গুন ১৩২০

৬৯

তোমার কাছে শান্তি চাব না।
থাক্ না আমার দুঃখ ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার 'পরে
বসো বসো লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা।

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে,
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে—
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা।

শান্তিনিকেতন
২৬ ফাল্গুন ১৩২০

৭০

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাই নে তোমারে।

বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর
হৃদয়-মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে।

শান্তিনিকেতন
২৮ ফাল্গুন ১৩২০

৭১

আমায় ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার
প্রেমের তো নাই ক্ষয়।
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর,
সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়।

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্তবায় নাই কি গো তাই বলে?
এই খেলাতে আমার সনে
হার মানো যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়।

শান্তিনিকেতন
২৯ ফাল্গুন ১৩২০

৭২

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম বলে
যেমন খুশি এলেম চলে
ভয় করি নি তোমায় আমি
অন্ধকারে।

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে
ফিরে যা রে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে
আপনি বাঁধো বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে।

শান্তিনিকেতন
১ চৈত্র ১৩২০

৭৩

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি।

সকাল-সাঁঝে সুর যে বাজে
ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কী আর বুঝব কী বা,
এই তো দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি ?

শান্তিনিকেতন
২ চৈত্র ১৩২০

৭৪

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এপারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে
যে সুর আনে সঙ্গে করে
তাই যে আমার দিবানিশি
সকল পরান লয় রে কাড়ি।

কার কথা যে জানায় তারা
জানি নে তা।
হেথা হতে কী নিয়ে বা
যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি।

শান্তিনিকেতন
৩ চৈত্র ১৩২০

৭৫

জীবন আমার চলছে যেমন
তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
চলে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে
তাদের আমি চাব, তারা
আমায় চাবে।

জীবন আমার পলে পলে
এমনি ভাবে
দুঃখসুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যে-জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সে-ও
আমায় চাবে।

শান্তিনিকেতন
৫ চৈত্র ১৩২০

৭৬

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার বসো হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে,
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে।
মাঝি, এবার বসো হালে।

দিন গিয়েছে এলো রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথি।

কাটো বাঁধন দাও গো ছাড়ি,
তারার আলোয় দেব পাড়ি,
স্থর জেগেছে যাবার কালে।
মাঝি, এবার বসো হালে।

শান্তিনিকেতন
৬ চৈত্র ১৩২০

৭৭

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেমনি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে নূতন প্রাতে।

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে নূতন প্রাতে।

শান্তিনিকেতন
৭ চৈত্র ১৩২০

৭৮

আরো চাই যে, আরো চাই গো—
আরো যে চাই।
ভাণ্ডারী যে স্থধা আমায়
বিতরে নাই।
সকালবেলার আলোয় ভরা
এই যে আকাশ-বস্থন্ধরা

এরে আমার জীবন-মাঝে
কুড়ানো চাই—
সকল ধন যে বাইরে আমার,
ভিতরে নাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই।

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।
দিন-রজনীর বাঁশি পুরে
যে গান বাজে অসীম সুরে,
তারে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।
আপন গান যে দূরে তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।

শান্তিনিকেতন
৮ চৈত্র ১৩২০

৭৯

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া
সে-ও আমার পাওয়া,
তাই তো পরান পরানপণে
হাত বাড়িয়ে মাগে।

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে !
লাগলে সেবায় অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে
যাব কাহার ঘরে,
যেমনি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে।

৯ চৈত্র [১৩২]

৮০

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে-দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে।

ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে।

১৩ চৈত্র [১৩২০]

৮১

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।

দেখব বলে এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়,
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়;
সরল প্রাণে নীরব হয়ে তোমায় ডাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।

শান্তিনিকেতন
১৪ চৈত্র ১৩২০

৮২

হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী,
কোথায় যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকল ক্ষণ।

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হল বসন্তের এই
দখিন সমীরণ।

১৫ চৈত্র ১৩২০

৮৩

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে,
গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে?

দিয়ে দুঃখ-সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে।

শান্তিনিকেতন
১৬ চৈত্র ১৩২০

৮৪

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ওই চরণেতে
আপনাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা।

আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে
আপনা নিয়ে করব যতই
বেচা-কেনা।

শান্তিনিকেতন
১৭ চৈত্র ১৩২০

৮৫

বল তো এই বারের মতো,
প্রভু, তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝরে,
কিছু বা ফল আছে ধরে,
বছর হয়ে এল গত।
রোদের দিনে ছায়ায় বসে
বাজায় বাঁশি রাখাল যত।

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ওই যে মেতে ওঠে নদী।
পার করে নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত।

২২ চৈত্র [১৩২০]

৮৬

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাব না গো যাব না যে,
থাকব পড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে।

আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।

আমারে যে জাগতে হবে,
কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে।

২২ চৈত্র [১৩২০]

৮৭

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।

কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইশারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখির মুখে এই যে খবর পেনু।

২৩ চৈত্র [১৩২০]

৮৮

সকাল-সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে।
আমি কেবল বসে আছি,
আপন মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে।
সকাল-সাঁজে।

এ পথ বেয়ে
সে আসে তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে,
কতই ধুলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে,
সকাল-সাঁজে।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৮৯

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে?

আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া
বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কী গুণ আছে
কে জানে।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৯০

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে
কেন পাগল কর এমন ক'রে ?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরানখানি দেয় যে ভ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে।

সোনার আলো কেমনে হে,
রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে।

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৯১

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ধুলো যত ?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো ?
তুমি পার হয়ে এসেছ মরু,
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়
এমন ভাগ্যহত।

তখন আলসেতে বসে ছিলেম আমি
আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা
বাজবে পায়ে পায়ে।

তবু ওই বেদনা আমার বুকে
বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার
গভীর হৃদয়-ক্ষত।

শান্তিনিকেতন
২৪ চৈত্র [১৩২০]

৯২

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহিরপানে চোখ মেলেছি
হৃদয়পানেই চাই নি।
আমার সকল ভালোবাসায়,
সকল আঘাত, সকল আশায়,
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাই নি।

তুমি মোর আনন্দ হয়ে
ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলে ছিলেম,
কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি
তোমার গান তো গাই নি

কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে
২৫ চৈত্র [১৩২০]

৯৩

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু যে
বাঁশিতে সে গান খুঁজে।
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে?
বনে তোর লাগাস আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম-'পরে মরিস যুঝে।

ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি।
যে আলো শত ধারায় আঁখি-তারায় পড়ে ঝরে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে।

কলিকাতা
২৬ চৈত্র [১৩২০]

৯৪

কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার
মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে।
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ দিকের পানে
গানে গানে।

দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।

আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে।

কলিকাতা
২০ চৈত্র [১৩২০]

৯৫

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে।
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তারে আমার ব'লে ছলে বলে
কে বলো আর রাখবে এঁটে।

আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে
রাত্রিদিবা।
আমি কি জানি নে তার অর্থ কী বা?
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো,
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে।

কলিকাতা
২১ চৈত্র [১৩২০]

৯৬

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ওই নয়নের
আলোক হানি।

সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে বক্ষে তুলে ;
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুটবে বাণী।

আমার বীণাখানি পড়ছে আজি
সবার চোখে।
হেরো তারগুলি তার দেখছে গুনে
সকল লোকে।
ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে করুণ রবে ;
যখন তুমি তারে বুকের 'পরে
লবে টানি।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩২১

৯৭

তোমার মাঝে আমারে পথ
ভুলিয়ে দাও গো, ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হতে
টলিয়ে দাও গো, দুলিয়ে দাও।
পথের শেষে মিলবে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব—
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও।

কেউ বা ওরা ঘরে ব'সে
ডাকে মোরে পুঁথির পাতায়।
কেউ বা ওরা অন্ধকারে
মন্ত্র প'ড়ে মনকে মাতায়।

ডাক শুনেছি সকলখানে
সে কথা যে কেউ না মানে ;
সাহস আমার বাড়িয়ে দিয়ে
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও।

শান্তিনিকেতন
২ বৈশাখ ১৩২১

৯৮

তোমার আনন্দ ওই এল দ্বারে
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ওই এল দ্বারে
এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো।

তোমার সকল ধন যে ধন্য হল হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে
এল এল এল গো।
তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো
ওই আলোতে জ্বেলো গো।

শান্তিনিকেতন
৩ বৈশাখ ১৩২১

৯৯

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
তারে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ।
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তার অকারণের হর্ষ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩২১

১০০

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
ওরা আমার হৃদয়পানে মুখ তুলে যে থাকে।
ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।

তোমার কাছে কী যে আমি সেই কথাটি হেসে
ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে, ছড়ায় দেশে দেশে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
দিন কেটে যায় অন্যমনে, ওদের মুখে তবু
প্রভু, তোমার মুখের সোহাগবাণী ক্লান্ত না হয় কভু।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
প্রাতের পরে প্রাতে ওরা, রাতের পরে রাতে
তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।
হাসিমুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে।
তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়াটি ওদের মুখে আছে।
ওগো ওই তোমারি ফুল।

শান্তিনিকেতন
৬ বৈশাখ ১৩২১

১০১

আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত প্রভু, আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে।

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে।

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

শান্তিনিকেতন
৭ বৈশাখ ১৩২১

১০২

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর।
এই তোমারি পরশরাগে
চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।

রামগড়। হিমালয়
৩১ বৈশাখ [১৩২১]

১০৩

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে ;
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে।

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ?

রামগড়
১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]

১০৪

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে।

রামগড়
৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৫

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা ?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা ?
চিনি নাই তো আমি তারে,
আঘাত করি বারে বারে,
তার বাণীরে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাঁদনা।

তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে।
দিনে রাতে চুরি ক'রে
এনেছি তাই লুটে যে।
তারি সাথে মিলব আসি,
এক সুরেতে বাজবে বাঁশি,
তখন তোমার দেখব হাসি,
ভরবে আমার চেতনা।

রামগড়
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৬

এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে ?
হাসিতে আকাশ ভরিলে।
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে।

ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে।
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে।

রামগড়
৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৭

সন্ধ্যা হল গো—
ওমা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।
অতল কালো স্নেহের মাঝে
ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।
ফিরিয়ে নে মা, ফিরিয়ে নে গো,
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধারমাঝে হোক-না জড়ো।

আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।

তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।
আমায় ঘিরি আমায় চুমি
কেবল তুমি, কেবল তুমি।
আমার ব'লে যা আছে মা,
তোমার করে সকল হরো।

রামগড়
৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রাত্রি

১০৮

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে?
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ওই দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ওই অশ্রুধারায় পড়ল গলে!
সে যে ওই বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ওই ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে।

রামগড়
৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১০৯

আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের
ডাইনে বাঁয়ে ;
পূজার ছায়ে।
ওরা মিশায় ওদের নীরব কান্তি
আমার গানে,
আমার প্রাণে।
ওরা নেয় তুলে মোর কণ্ঠ ওদের
সকল গায়ে
পূজার ছায়ে।

হেথায় সাড়া পেল বাহির হল
প্রভাত-রবি
অমল-ছবি।
সে যে আলোটি তার মিলিয়ে দিল
আমার মাথে
প্রণাম-সাথে।
সে যে আমার চোখে দেখে নিল
আমার মায়ে
পূজার ছায়ে।

রামগড়
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১১০

আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের
বহুক-না তুফান
রসের বরিষনে
তারে মিলাও সবার সনে,
অঞ্জলি মোর ছাপিয়ে দিয়ে
হোক সে তোমার দান।

আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত করো তাকে।
যেমন তোমার তারা,
তোমার ফুলটি যেমন ধারা,
তেমনি তারে তোমার করো
যেমন তোমার গান।

রামগড়
২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

১১১

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।

এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধার তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র-ভাষণে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধ-গহন সন্ধ্যা-কুসুম-মালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।

কলিকাতা
৩ আষাঢ় ১৩২১

—

গীতালি

আশীর্বাদ

এই আমি একমনে সঁপিলাম তাঁরে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখনি আমারি ব'লে ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্বাদ তাই।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩২১
রাত্রি

গীতালি

১

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নামল
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থামল।

মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কী আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিটল সে পরশের
তিয়াষা।

এতদিনে জানলেম
যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য।

শান্তিনিকেতন
শ্রাবণ ১৩২১

২

তুমি আড়াল পেলে কেমনে
এই মুক্ত আলোর গগনে?
কেমন করে শূন্য সেজে
ঢাকা দিলে আপনাকে যে,
সেই খেলাটি উঠল বেজে
বেদনে—
আমার প্রাণের বেদনে।

আমি এই বেদনার আলোকে
তোমায় দেখব দ্যুলোকে ভূলোক।
সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা,
সেই কথাটি দেবে ধরা
জীবনে—
আমার গভীর জীবনে।

শান্তিনিকেতন
৪ ভাদ্র ১৩২১

৩

বাধা দিলে বাধবে লড়াই,
মরতে হবে।
পথ জুড়ে কী করবি বড়াই ?
সরতে হবে।
লুঠ-করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো,
এক নিমেষে পথের ধুলায়
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে।

নীচে বসে আছিস কে রে,
কাঁদিস কেন।
লজ্জা-ডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস কেন।
ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস মনে,
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে।

শান্তিনিকেতন
৪ ভাদ্র ১৩২১

৪

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি,
সেথায় চরণ পড়ে,
তোমার সেথায় চরণ পড়ে।
তাই তো আমার সকল পরান
কাঁপছে ব্যথার ভরে গো
কাঁপছে থরথরে।
ব্যথা-পথের পথিক তুমি,
চরণ চলে ব্যথা চুমি,
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে।

নয়নজলের বন্যা দেখে
ভয় করি নে আর,
আমি ভয় করি নে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায়
করিয়ে দেবে পার,
আমি তরব পারাবার!
ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইছে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি
ঠেকব চরণ 'পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে।

কলিকাতা
৬ ভাদ্র ১৩২১

৫

আলো যে
যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পুব-গগনে
সোনার রেখা।
এবারে ঘুচল কি ভয়।
এবারে হবে কি জয়।
আকাশে হল কি ক্ষয়
কালির লেখা।

কারে ওই
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা?
ওরে তুই সকল ভুলে
চেয়ে থাক্‌ নয়ন তুলে—
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা।

কলিকাতা
৭ ভাদ্র ১৩২১

৬

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে?
তুমি মর্মে আমায়
মারবে হিয়ার কাছে?
আমি পালিয়ে থাকি, মুদি আঁখি,
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে

মারকে তোমার
ভয় করেছি বলে
তাই তো এমন
হৃদয় ওঠে জ্বলে।
যেদিন সে ভয় ঘুচে যাবে
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে,
মরণকে প্রাণ বরণ করে বাঁচে।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩২১

৭

সুখে আমায় রাখবে কেন
রাখো তোমার কোলে ;
যাক না গো সুখ জ্বলে।
যাক না পায়ের তলার মাটি,
তুমি তখন ধরবে আঁটি,
তুলে নিয়ে দুলাবে ওই
বাহু-দোলার দোলে।

যেখানে ঘর বাঁধব আমি
আসে আসুক বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাই নে পরিত্রাণ।
হার মেনেছি, মিটেছে ভয়,
তোমার জয় তো আমারি জয়,
ধরা দেব, তোমায় আমি
ধরব যে তাই হলে।

শান্তিনিকেতন
৭ ভাদ্র ১৩২১

৮

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান-মাঝে এমন কঠিন সুর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।

সুরুল
৮ ভাদ্র। বুধবার [১৩২১]

৯

আঘাত করে নিলে জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।
সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।

তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।

বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়লে না যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে।

সুরুল
৮ ভাদ্র [১৩২১]

১০

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে?
কে রে এমন জাগায় তোকে?
চেয়ে আছিস আপন মনে
ওই যে দূরে গগন-কোণে,
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন
রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে।

রক্তশতদলের সাজি
সাজিয়ে কেন রাখিস আজি?
কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
জোড়-হাতে তুই ডাকিস কারে?
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে।

সুরুল
৯ ভাদ্র [১৩২১]

১১

আমি যে আর সইতে পারি নে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারি নে।
হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো,
আমি সে আর বইতে পারি নে।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কী হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্মরে।
কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েছে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারি নে।

সুরুল
৯ ভাদ্র [১৩২১]

১২

পথ চেয়ে যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে।
আজ ধুলার আসন ধন্য করে
বসবে কি মোর সাথে।
রচবে তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হয়ে তোমার পানে
চাইব গো জোড় হাতে।

এরা সবাই কী বলে যে
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল
কী মাধুরীর ভার।
বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখবে না কি আড়াল করে,
তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে।

সুরুল
৯ ভাদ্র ১৩২১

১৩

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।

সকল আকাশ, সকল ধরা,
বর্ষণেরি বাণী-ভরা।
ঝরঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।

সুরুল
১০ ভাদ্র [১৩২১]

১৪

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক-না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আনলে আবার।
ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি,
গলার হারে দোলাও তারে
গাঁথা তোমার করে সারা।

সুরুল
১০ ভাদ্র [১৩২১]

১৫

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হয়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।
তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণমাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি,
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি বনের উদাস বায়ু
পড়ে থাকে তরুর তলে।
হৃদয়মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তার চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে।

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৬

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ওই চরণ-মূলে?
শরৎ-আলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে?

কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা খেতে।
জানি গো আজ হাহারবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৭

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা ;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।
এতদিন যা সংগোপনে
ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব কোরো না গো
ওই যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
রয়েছে কান পাতি।
বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা।

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৮

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য করো
দহন-দানে।
আমার এই
দেহখানি
তুলে ধরো,
তোমার ওই
দেবালয়ের
প্রদীপ করো,
নিশিদি
আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।

আঁধারের
গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত
ফোটাক তারা
নব নব।
নয়নের
দৃষ্টি হতে
ঘুচবে কালো,

যেখানে
পড়বে সেথায়
দেখবে আলো,
ব্যথা মোর
উঠবে জ্বলে
ঊর্ধ্ব-পানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।

সুরুল
১১ ভাদ্র [১৩২১]

১৯

হৃদয় আমার প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশি উঠল বেজে
বাতাসে বাতাসে।
এই যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হয়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে।

বাইরে তুমি নানা বেশে
ফের নানান ছলে;
জানি নে তো আমার মালা
দিয়েছি কার গলে।
আজ কী দেখি পরানমাঝে
তোমার গলায় সব মালা যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
গভীর সর্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হল
অনন্ত আকাশে।

সুরুল
১৩ ভাদ্র [১৩২১]

২০

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আসে নি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে নেবে জিতে
পরানটি তোমার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ওই
আসছে জীবন-মাঝে,
ও যে আসছে বীরের সাজে।
আধেক নিয়ে ফিরবে না রে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।

সুরুল
১৪ ভাদ্র [১৩২১]

২১

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।
পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায় ?
আমার ঘরে থাকাই দায়

সুরুল
১৫ ভাদ্র [১৩২১]

২২

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।
এরি গোপন হৃদয়-'পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।
বিরহী তোর সেইখানে যে
একলা বসে থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।
দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিলবে তবে
সুধায় সুধায় ভরা।

সুরুল
১৬ ভাদ্র [১৩২১]
সন্ধ্যা

২৩

যে থাকে থাক্‌-না দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।
যদি ওই ভোরের পাখি
তোরি নাম যায় রে ডাকি,
একা তুই চলে যা রে।

কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।
ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তার আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে।

সুরুল
১৭ ভাদ্র [১৩২১]
সকাল

২৪

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি
আমি ডুবতে রাজি আছি।
সকাল আমার গেল মিছে,
বিকেল যে যায় তারি পিছে;
রেখো না আর, বেঁধো না আর
কূলের কাছাকাছি।

মাঝির লাগি আছি জাগি
সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে
করে কেবল খেলা।
ঝড়কে আমি করব মিতে,
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি।

শান্তিনিকেতন
১৭ ভাদ্র [১৩২১]
বিকাল

২৫

শুধু তোমার বাণী নয় গো
হে বন্ধু, হে প্রিয়,
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।
সারা পথের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাব যে
খুঁজে না পাই দিশা।
এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তার
যা-কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তারে, ভরব তারে,
রাখব তারে সাথে—
একলা পথে চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

শান্তিনিকেতন
১৮ ভাদ্র [১৩২১]

২৬

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

মানিক-গাঁথা ওই যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।
কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরনের সংগীতে
ওড়না ওড়ায় এ কী নাচের ভঙ্গিতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি'।

সুরুল
১৯ ভাদ্র [১৩২১]

২৭

ও আমার মন যখন জাগলি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তার চলে যাবার শব্দ শুনে
ভাঙল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙল রে ঘুম অন্ধকারে।
মাটির 'পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তার বাঁশি বাজে আঁধার-মাঝে
দেখি না যে চক্ষে তারে।
ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁক
খুঁজে তারে পায় কি আঁখি?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির করলি যারে।

সুরুল
২১ ভাদ্র [১৩২১]

২৮

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।
মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বনপর্বত,
মোর বীর্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়

সুরুল
২২ ভাদ্র [১৩২১]

২৯

এবার আমায় ডাকলে দূরে
সাগরপারের গোপন পুরে।
বোঝা আমার নামিয়েছি যে,
সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ সুধা
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।

আমার সন্ধ্যাফুলের মধু
এবার যে ভোগ করবে বঁধু।
তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বালবে আনি,
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে।

সুরুল
২৩ ভাদ্র [১৩২১]

৩০

নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী ?
কেবলি কি ঢেউ আছে তোর ?
হায় রে লাজে মরি।
ঝড়ের কালো মেঘের পানে
তাকিয়ে আছিস আকুল প্রাণে,
দেখিস নে কি কাণ্ডারী তোর
হাসে যে হাল ধরি'।

নিশার স্বপ্ন তোর
সেই কি এতই সত্য হল,
ঘুচল না তোর ঘোর ?
প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে, আশার গানে ;
সে খবর কি দেয় নি কানে
আঁধার বিভাবরী ?

শান্তিনিকেতন
২৪ ভাদ্র [১৩২১]

৩১

নাই বা ডাক, রইব তোমার দ্বারে ;
মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে।
বসব তোমার পথের ধুলার 'পরে
এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে ?
তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা
গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে।

রইব তোমার ফসল-খেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।

জেগে রব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বাল
বসে রব সেথায় অন্ধকারে।

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
গোরুর গাড়িতে
২৬ ভাদ্র [১৩২১]

৩২

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে?
অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
চরণভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেছ যে
মরণ-মহোৎসবে।

বক্ষ আমার এমন করে
বিদীর্ণ যে কর
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতরো?
এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ওই মুকুটমণি—
মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন-বল্লভে।

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
২৬ ভাদ্র [১৩২১]

৩৩

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেছে মোর বাতি।
ঝড় এসেছে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথি।
আকাশ-কোণে সর্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠছে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
করছে মাতামাতি।

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তারে,
আবার কোথা চলতে হবে
গভীর অন্ধকারে।
বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্তা কবে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি।

সুরুল
২৬ ভাদ্র [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৩৪

মালা হতে খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও।
ওই মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল—
হোথায় আমায় ডুবতে দাও গো মরতে দাও।
দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা
ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও।

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুকনো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।

পথ জুড়ে যা পড়ে আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও গো সরতে দাও।
তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে, ভরে না তায় মন—
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও।

সুরুল
২৭ ভাদ্র [১৩২১]

৩৫

কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরানে
আজি তোমার অরুণ আলোয় কে জানে।
বাণী তোমার ধরে না মোর গগনে,
পাতায় পাতায় কাঁপে হৃদয়-কাননে,
বাণী তোমার ফোটে লতাবিতানে।

তোমার বাণী বাতাসে সুর লাগালো,
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালো।
তরী আমার আজ প্রভাতের আলোকে
এই বাতাসে পাল তুলে দিক পুলকে,
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে।

সুরুল
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৬

যেতে যেতে চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
সবাই মিলে পথে চলা
হল আমার দায়।
দুয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে—
বাঁধন এদের সাধন-ধন,
ছিঁড়তে যে ভয় পায়।

আবেশভরে ধুলায় পড়ে
কতই করে ছল,
যখন বেলা যাবে চলে
ফেলবে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস,
চিত্ত অবশ, চরণ অলস—
লতার মতো জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়।

শান্তিনিকেতন
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৭

সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।
ফলের তরে নয় তো খোঁজা—
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে
আবার ফুল ফুটাই।

এমনি করে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দু হাত মেলি—
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে
নিত্য নেওয়া তাই।

শান্তিনিকেতন
২৮ ভাদ্র [১৩২১]

৩৮

শেষ নাহি যে
শেষ কথা কে বলবে।
আঘাত হয়ে দেখা দিল,
আগুন হয়ে জ্বলবে।
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা
শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হলে
নদী হয়ে গলবে।

ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে—
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।

সুরুল
২৮ ভাদ্র [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৩৯

না রে, তোদের ফিরতে দেব না রে
মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায়
সেই আরামের দ্বারে।
চলতে হবে সামনে সোজা,
ফেলতে হবে মিথ্যা বোঝা,
টলতে আমি দেব না যে
আপন ব্যথাভারে।

না রে, তোদের রইতে দেব না রে
দিবানিশি ধুলাখেলায়
খেলাঘরের দ্বারে।
চলতে হবে আশার গানে
প্রভাত-আলোর উদয়-পানে,
নিমেষতরে পাবি নেকো
বসতে পথের ধারে।

না রে, তোদের থামতে দেব না রে—
কানাকানি করতে কেবল
কোণের ঘরের দ্বারে।
ওই যে নীরব বজ্রবাণী
আগুন বুকে দিচ্ছে হানি—
সইতে হবে, বইতে হবে,
মানতে হবে তারে।

সুরুল
২৮ ভাদ্র [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৪০

মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস নে।
তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে
ধুলার 'পরে পড়ে থাকিস নে।
ওরে অবশ, ওরে খেপা,
মাটির 'পরে ফেলবি রে পা,
তারে নিয়ে গায়ে মাখিস নে।

ওই প্রদীপ আর জ্বালিয়ে রাখিস নে—
রাত্রি যে তোর ভোর হয়েছে,
স্বপন নিয়ে পড়ে থাকিস নে।

উঠল এবার প্রভাত-রবি,
খোলা পথে বাহির হবি,
মিথ্যা ধুলায় আকাশ ঢাকিস নে।

সুরুল
২৯ ভাদ্র [১৩২১]

৪১

এতটুকু আঁধার যদি
লুকিয়ে রাখিস বুকের 'পরে
আকাশ-ভরা সূর্যতারা
মিথ্যা হবে তোদের তরে।
শিশির-ধোওয়া এই বাতাসে
হাত বুলালো ঘাসে ঘাসে,
ব্যর্থ হবে কেবল যে সে
তোদের ছোটো কোণের ঘরে।

মুগ্ধ ওরে, স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসনকোণে
ধুলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস আপন-মনে—
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে,
বাইরে সে যে দাঁড়িয়ে রবে
কত-না যুগযুগান্তরে।

সুরুল
৩০ ভাদ্র [১৩২১]

৪২

কাঁচা ধানের খেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেছ গো,
তেমনি করে আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেছ গো।

যেমন করে কালো মেঘে
তোমার আভা গেছে লেগে
তেমনি করে হৃদয়ে মোর
চরণ তোমার ফেলেছ গো।

বসন্তে এই বনের বায়ে
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা
তেমনি করে অন্তরে মোর
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা।
দিয়ে তোমার রুদ্র আলো
বজ্র-আগুন যেমন জ্বাল
তেমনি তোমার আপন তাপে
প্রাণে আগুন জ্বেলেছ গো।

সুরুল
৩১ ভাদ্র [১৩২১]

৪৩

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।
জ্বলতে দে তোর আগুনটারে,
ভয় কিছু না করিস তারে,
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বলবে না আর কভু তবে।

এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে
ধরা দিতে হোস না কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে,
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।

শান্তিনিকেতন
১ আশ্বিন [১৩২১]

৪৪

না রে, না রে, হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।
ভেবেছিলি দিনের শেষে
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে
সারা দিনের সকল কাঁদন।

না, রে, না রে, হবে না তোর হবে না তা—
সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে
হবে না তোর শয়ন পাতা।
পথিক বঁধু পাগল করে
পথে বাহির করবে তোরে,
হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে
ফুটবে তবে তাঁর আরাধন।

শান্তিনিকেতন
১ আশ্বিন [১৩২১]

৪৫

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে?
এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

তোমার ফুলে যে রঙ ঘুমের মতো লাগল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগল।
যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে
সংগীতে সে উঠবে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে।

সুরুল
১ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৪৬

না গো, এই যে ধুলা আমার না এ,
তোমার ধুলার ধরার 'পরে
উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।
দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি
রচলে দেহ পূজার থালি,
শেষ আরতি সারা করে
ভেঙে যাব তোমার পায়ে।

ফুল যা ছিল পূজার তরে
যেতে পথে ডালি হতে
অনেক যে তার গেছে পড়ে।
কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত যে তার নিবল হাওয়ায়—
পৌঁছোল না চরণ-ছায়ে।

সুরুল
২ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৪৭

এই কথাটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে,
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে।
অভয়-মনে কণ্ঠ ছাড়ি
গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায়
ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।

পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে
মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে।

সুরুল
২ আশ্বিন [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৪৮

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন
কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই—
দেখ্‌ রে চেয়ে আপন-পানে
পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।
ফিরছে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন্ সে গহন রাত্রিশেষে
অগাধ জলের তলা হতে
অমল কুঁড়ি উঠল ভেসে।
হল না তার ফুটে ওঠা,
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা,
মর্ত্ত-কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথা রে পাই।

সুরুল
২ আশ্বিন [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৪৯

ওই অমল হাতে রজনী প্রাতে
আপনি জাল'
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো প্রভাত, এই তো আকাশ,
এই তো পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই তো বিমল, এই তো মধুর,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে
আপনি জাল'
এই তো আলো—
এই তো আলো।
এই তো ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই তো দুখের অগ্নিমালা,

এই তো মুক্তি, এই তো দীপ্তি,
এই তো ভালো—
এই তো আলো—
এই তো আলো।

সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে
৭ আশ্বিন [১৩২১]

৫০

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
জীবনে আমার সংগীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।
হৃদয়পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

সুরুল
৮ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৫১

খুশি হ তুই আপন মনে।
রিক্ত হাতে চল্‌-না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে।
চাস নে কিছু, কোস নে কিছু,
করিস নে তোর মাথা নিচু,
আছে রে তোর হৃদয় ভরা
শূন্য ঝুলির অলখ ধনে।

নাচুক-না ওই আঁধার আলো—
তুলুক-না ঢেউ দিবানিশি
চার দিকে তোর মন্দ ভালো।
তোর তরী তুই দে খুলে দে,
গান গেয়ে তুই পাল তুলে দে—
অকূল-পানে ভাসবি রে তুই,
হাসবি রে তুই অকারণে।

সুরুল
৮ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৫২

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিস দূরে রাখে
তার থেকে তুই দূরে রবি।
কেন রে তোর দু হাত পাতা।
দান তো না চাই, চাই যে দাতা—
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি—
আপন বচন-রচন হতে
বাহির হয়ে আয় রে কবি।
সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে প্রভাতরবি।

সুরুল
৯ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৫৩

ওরে ভীরু, তোমার হাতে
নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে,
করবে তরী পার।
তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখো ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কী ভাবনায়।
আসুক-নাকো গহন রাতি,
হোক-না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে,
করবে তরী পার।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস
মেঘে আকাশ ডোবা—
আনন্দে তুই পুবের দিকে
দেখ্‌-না তারার শোভা।

সাথি যারা আছে তারা
তোমার আপন ব'লে
ভাব' কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ওই কোলে ?
উঠবে রে ঝড়, দুলবে রে বুক,
জাগবে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে,
করবে তরী পার।

শান্তিনিকেতন
৯ আশ্বিন [১৩২১]
অপরাহ্ণ

৫৪

চোখে দেখিস, প্রাণে কানা।
হিয়ার মাঝে দেখ্-না ধরে
ভুবনখানা।
প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা,
সেথায় তারি আসন পাতা,
বাইরে তারে রাখিস তবু—
অন্তরে তার যেতে মানা ?

তারি কণ্ঠে তোমার বাণী,
তোরি রঙে রঙিন তারি
বসনখানি।
যে জন তোমার বেদনাতে
লুকিয়ে খেলে দিনে রাতে
সামনে যে ওই রূপে রসে
সেই অজানা হল জানা।

শান্তিনিকেতন
১১ আশ্বিন [১৩২১]

৫৫

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন করে।
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।
তেমনি করে আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগল বুঝি
জীবন-'পরে।

বাজে বলেই বাজাও তুমি—
সেই গরবে
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে
সকল স'বে।
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভরে।

শান্তিনিকেতন
১৩ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৫৬

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস করে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো

শান্তিনিকেতন
১৪ আশ্বিন [১৩২১]

৫৭

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
ওই গো বাজে
হৃদয়-মাঝে।
তোমার ঘরে নিশিভোরে
আগল যদি গেল সরে
আমার ঘরে রইব তবে
কিসের লাজে।

অনেক বলা বলেছি, সে
মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেছি, সে
মিথ্যা চলা।
আজ যেন সব পথের শেষে
তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে
আপন কাজে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৫৮

প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে
তোমার যেজন সে যদি গো
দ্বারে দ্বারে ঘোরে।
কাঁদিয়ে তারে ফিরিয়ে আন,
কিছুতেই তো হার না মান,
তার বেদনায় তোমার অশ্রু
রইল যে গো ভরে।

সামান্য নয় তব প্রেমের দান—
বড়ো কঠিন ব্যথা এ যে,
বড়ো কঠিন টান।
মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তবে মিলনবেশে,
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধ বাহুর ডোরে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৫৯

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।
এই-যে হিয়া থরথর
কাঁপে আজি এমনতরো
এই বেদনা ক্ষমা করো
ক্ষমা করো প্রভু।

এই দীনতা ক্ষমা করো প্রভু,
পিছন-পানে তাকাই যদি কভু।

দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা করো
ক্ষমা করো প্রভু।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬০

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি নাথ, দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে।
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি—
আমার আর হবে না দেরি।

আমার কাজ হয়েছে সারা,
এখন প্রাণে বাঁশি বাজায় সন্ধ্যাতারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্বাদের মালা নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি—
এখন আর হবে না দেরি।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]

৬১

ওই-যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলংকার।
ওই সে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার।

ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
স্তব্ধ পাখির নীড়ে।
বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বারবার।

ওই-যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।
ওই-যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
আপন বেদনাভার।

ওই-যে নয়ন অবগুণ্ঠনতলে
ভাসিল শিশিরজলে।
ওই-যে তাহার বিপুল রূপের ধন
অরূপ আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৬২

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠল কোথায় বেজে।
ছাড়িয়ে গৃহ, ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে নিল আমায় জন্মমরণপারে—
এল পথিক সেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো—
গভীর শান্তি এ যে।

চরণে তার নিখিল ভুবন   নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার আঁচলখানি   আসন দিল পেতে।
এত কালের ভয় ভাবনা   কোথায় যে যায় সরে,
ভালোমন্দ ভাঙাচোরা   আলোয় ওঠে ভরে,
কালিমা যায় মেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,
গভীর শান্তি এ যে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৬৩

এদের পানে তাকাই আমি,
বক্ষে কাঁপে ভয়।
সব পেরিয়ে তোমায় দেখি,
আর তো কিছু নয়।
একটুখানি সামনে আমার আঁধার জেগে থাকে
সেইটুকুতে সূর্যতারা সবই আমার ঢাকে—
তার উপরে চেয়ে দেখি
আলোয় আলোময়।
ছোটো আমার বড়ো হয় যে
যখন টানি কাছে—
বড়ো তখন কেমন করে
লুকায় তারি পাছে।
কাছের পানে তাকিয়ে আমার দিন তো গেছে কেটে,
এবার যেন সন্ধ্যাবেলায় কাছের ক্ষুধা মেটে—
এতকাল যে রইলে দূরে
তোমারি হোক জয়।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৬৪

হিসাব আমার মিলবে না তা জানি,
যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি।
করজোড়ে রইনু চেয়ে মুখে
বোঝাপড়া কখন যাবে চুকে,
তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি।

গর্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল তো কাড়বে না কেউ কভু।
নাই বসালে তোমার কোলের কাছে,
পায়ের তলে সবারি ঠাঁই আছে—
ধুলার 'পরে পাতব আসনখানি।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৬৫

মেঘ বলেছে 'যাব যাব',
রাত বলেছে 'যাই'।
সাগর বলে, 'কূল মিলেছে,
আমি তো আর নাই।'
দুঃখ বলে, 'রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে।'
আমি বলে, 'মিলাই আমি,
আর কিছু না চাই।'

ভুবন বলে, 'তোমার তরে
আছে বরণমালা।'
গগন বলে, 'তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।'

প্রেম বলে যে, 'যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে।'
মরণ বলে, 'আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।'

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৬

কাণ্ডারী গো, যদি এবার
পৌঁছে থাক কূলে
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার
হাত ধরে লও তুলে।
ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে
বসাও আমায় তোমার পাশে,
রাত্রি আমার কেটে গেছে
ঢেউয়ের দোলায় দুলে।

কাণ্ডারী গো, ঘর যদি মোর
না থাকে আর দূরে,
ওই যদি মোর ঘরের বাঁশি
বাজে ভোরের সুরে,
শেষ বাজিয়ে দাও গো চিতে
অশ্রুজলের রাগিণীতে
পথের বাঁশিখানি তোমার
পথতরুর মূলে।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৭

ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে,
শেষ হল মোর গান—
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।
অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি—
ওই হাতে মোর হাত দুটি লও,
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

ঘুচিয়ে লও গো সকল লজ্জা,
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে লও জয়।
লও গো আমার নিশীথরাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি—
সকল অভিমান।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৮

তোমার ভুবন মর্মে আমার লাগে।
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।
এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে সরস—

রক্ত আমার রঙিয়ে আছে
তব অরুণরাগে।
আমার মনে এই শরতের
আকুল আলোখানি
এক পলকে আনে যেন
বহুযুগের বাণী।
নিশীথরাতে নিমেষহারা
তোমার যত নীরব তারা
এমন করে হৃদয়দ্বারে
আমায় কেন মাগে।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৬৯

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেমনি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে
গানের সুরে।
সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে
গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয়-মাঝে বেড়ায় ঘুরে
গানের সুরে।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭০

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরান দিক-না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

বোস্-না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন লয়ে
অরুণ-আলোর-স্বর্ণরেণু
মাখা হয়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া।

শান্তিনিকেতন
১৭ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭১

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।
চোখে আমার মায়ার ছায়া টুটবে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুটবে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ, জয় হবে

রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচবে যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচবে যে।
কাঁপবে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুলবে তোমার তারা-মণির হারে সে,
বাসনা তার ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে।

শান্তিনিকেতন
১৮ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৭২

ওগো আমার হৃদয়বাসী,
আজ কেন নাই তোমার হাসি।
সন্ধ্যা হল কালো মেঘে,
চাঁদের চোখে আঁধার লেগে—
বাজল না আজ প্রাণের বাঁশি।

রেখেছি এই প্রদীপ মেজে,
জ্বালিয়ে দিলেই জ্বলবে সে যে।
একটুকু মন দিলেই তবে
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোলা আছে ফুলের রাশি।

শান্তিনিকেতন
১৮ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭৩

পুষ্প দিয়ে মার যারে
চিনল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে সে যে
ধরে তোমার চরণকে।

সবার নীচে ধুলার 'পরে
ফেল যারে মৃত্যু-শরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে—
ভয় কী বা তার পড়নকে।

আরামে যার আঘাত ঢাকা,
কলঙ্ক যার সুগন্ধ,
নয়ন মেলে দেখল না সে
রুদ্র মুখের আনন্দ।
মজল না সে চোখের জলে,
পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'ল যেজন পালঙ্কে।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৭৪

আমার সুরের সাধন রইল পড়ে
চেয়ে চেয়ে কাটল বেলা
কেমন করে!
দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে,
কী যে দেখি বলব কী এ—
গানের মতো চোখে বাজে
রূপের ঘোরে।

সবুজ সুধা এই ধরণীর
অঞ্জলিতে
কেমন করে ওঠে ভরে
আমার চিতে।

আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মতো নিল তুলি,
আশ্বিনের ওই আঁচলখানি
গেল ভরে।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]

৭৫

কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে—
সাগর-মাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ওই কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।
যেখানে ওই গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণলীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

এবার, বীণা, তোমায় আমায়
আমরা একা।
অন্ধকারে নাই বা কারে
গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।
বাতায়নের লতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]

৭৬

ঘরের থেকে এনেছিলেম
প্রদীপ জ্বেলে—
ডেকেছিলেম, 'আয় রে তোরা
পথের ছেলে।'
বলেছিলেম, 'সন্ধ্যা হল,
তোমরা পূজার কুসুম তোলো,
আমার প্রদীপ দেবে পথে
কিরণ মেলে।'

পথের আঁধার পথে রেখে
এলেম ফিরে,
প্রদীপ হাতে পথ দেখানো
ছেড়েছি রে।
এবার বলি, 'ওগো আলো,
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধুলায়
দিলেম ফেলে।'

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]

৭৭

সন্ধ্যা হল, একলা আছি বলে
এই-যে চোখে অশ্রু পড়ে গলে
ওগো বন্ধু, বলো দেখি
শুধু কেবল আমার এ কি।
এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে।

থাক্-না তোমার লক্ষ গ্রহতারা,
তাদের মাঝে আছ আমায়-হারা।

সইবে না সে, সইবে না সে,
টানতে আমায় হবে পাশে—
একলা তুমি, আমি একলা হলে।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৭৮

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ,
কেমনে দিই ফাঁকি—
আধেক ধরা পড়েছি গো,
আধেক আছে বাকি।
কেন জানি আপনা ভুলে
বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তারে ঢাকি—
আধেক ধরা পড়েছি যে,
আধেক আছে বাকি।

বাহির আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ—
অন্তরে মোর তোমার লাগি
একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি—
আধেক ধরা পড়েছি যে,
আধেক আছে বাকি।

শান্তিনিকেতন
১৯ আশ্বিন [১৩২১]
রাত্রি

৭৯

তোমায় সৃষ্টি করব আমি
এই ছিল মোর পণ।
দিনে দিনে করেছিলেম
তারি আয়োজন।
তাই সাজালেম আমার ধুলো,
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো,
আমার যত রঙিন আবেশ,
আমার দুঃস্বপন।

'তুমি আমায় সৃষ্টি করো'
আজ তোমারে ডাকি—
'ভাঙো আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।
তোমার সত্য, তোমার শান্তি,
তোমার শুভ্র অরূপ কান্তি,
তোমার শক্তি, তোমার বহ্নি
ভরুক এ জীবন।'

শান্তিনিকেতন
২০ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৮০

সারা জীবন দিল আলো
সূর্য গ্রহ চাঁদ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ
মেঘের কলস ভরে ভরে
প্রসাদবারি পড়ে ঝরে,

সকল দেহে প্রভাতবায়ু
ঘুচায় অবসাদ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ।

তৃণ যে এই ধুলার 'পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই-যে আকাশ চিরনীরব
অমৃতময় বাণী—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই-যে ভুবন দিকে দিকে
পুরায় কত সাধ—
তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু,
তোমার আশীর্বাদ।

শান্তিনিকেতন
২০ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৮১

সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের
পর্দাখানি
ডেকে গেল নিশীথরাতে
কে না জানি।
কোন্ গগনের দিশাহারা
তন্দ্রাবিহীন একটি তারা ?
কোন্ রজনীর দুঃস্বপনের
আর্তবাণী ?
ডেকে গেল নিশীথরাতে
কে না জানি।

আঁধার রাতে ভয় এসেছে
কোন্ সে নীড়ে ?
বোঝাই তরী ডুবল কোথায়
পাষাণ-তীরে ?
এই ধরণীর বক্ষ টুটে
এ কী রোদন এল ছুটে
আমার বক্ষে বিরামহারা
বেদন হানি।
ডেকে গেল নিশীথরাতে
কে না জানি।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮২

ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে
কোন্ অতিথি, ফিরিয়ে দেব না রে।
জাগব বসে সকল রাতি—
ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি
আগুন দিয়ে জ্বালব বারে বারে।

আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
ধরার কান্না আমায় কেন ডাকে ?
দুঃখ দিয়ে জানাও রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র—
ভয় দিয়েছ ভয় করি নে তারে।
ব্যথা যখন এল আমার দ্বারে
তারে আমি ফিরিয়ে দেব না রে।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৩

আমি পথিক, পথ আমারি সাথি।
দিন সে কাটায় গনি গনি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারা রাতি।
কত যুগের রথের রেখা
বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধুলায় আঁচল পাতি।
বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৪

বৃন্ত হতে ছিন্ন করি শুভ্র কমলগুলি
কে এনেছে তুলি।
তবু ওরা চায় যে মুখে নাই তাহে ভর্ৎসনা,
শেষ নিমেষের পেয়ালা-ভরা অম্লান সান্ত্বনা—
মরণের মন্দিরে এসে মাধুরী-সংগীত
বাজায় ক্লান্তি ভুলি
শুভ্র কমলগুলি।

এরা তোমার ক্ষণকালের নিবিড়নন্দন
নীরব চুম্বন,
মুগ্ধ নয়ন-পল্লবেতে মিলায় মরি মরি
তোমারি সুগন্ধ-শ্বাসে সকল চিত্ত ভরি—
হে কল্যাণলক্ষ্মী, এরা আমার মর্মে তব
করুণ অঙ্গুলি
শুভ্র কমলগুলি।

শান্তিনিকেতন
২১ আশ্বিন [১৩২১]

৮৫

বাজিয়েছিলে বীণা তোমার
দিই বা না দিই মন।
আজ প্রভাতে তারি ধ্বনি
শুনি সকল ক্ষণ।
কত সুরের লীলা সে যে
দিনে রাত্রে উঠল বেজে,
জীবন আমার গানের মালা
করেছ কল্পন।

আজ শরতের নীলাকাশে,
আজ সবুজের খেলায়,
আজ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে,
আজ চামেলির মেলায়—
কত কালের গাঁথা বাণী
আমার প্রাণের সে গানখানি
তোমার গলায় দোলে যেন
করিনু দর্শন।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৬

আবার যদি ইচ্ছা কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।
আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধুলার 'পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি—
আঘাত খেয়ে বাঁচি কিম্বা
আঘাত খেয়ে মরি
আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালোবাসি
আবার ধরণীরে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৭

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টানবে অচিন-ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা,
নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো,
তাই তো হৃদয় দোলে
অচেনা এই ভুবন-মাঝে
কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার—
বেড়াই তারি ঘোরে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৮

যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে—
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে
ভবসাগর-মাঝখানে।

রক্ত যে তার মেতে ওঠে
মহাসাগর-কল্লোলে,
ওঠা-পড়ার ছন্দে হৃদয়
ঢেউয়ের সাথে ঢেউ তোলে।
অরুণ-আলোর আশিস লয়ে
অস্তরবির আদেশ বয়ে
আপন সুখে যায় সে চলে কার পানে
ভবসাগর-মাঝখানে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]

৮৯

সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণ-তলে
তারে আমি ধুয়ে দিলেম
আমার নয়ন-জলে।
বিদায়-পথে যাবার বেলা ম্লান রবির রেখা
সারা দিনের ভ্রমণ-বাণী লিখল সোনার লেখা,
আমি তাতেই সুর বসালেম
আপন গানের ছলে।

স্বর্ণ আলোর রথে চড়ে
নেমে এল রাতি—
তারি আঁধার ভরে আমার
হৃদয় দিনু পাতি।
মৌনপারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়
বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতায়
আমার বাণীর স্রোত মিলিছে
নীরব কোলাহলে।

বুদ্ধগয়া
২৩ আশ্বিন [১৩২১]
সন্ধ্যা

৯০

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার।
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হল কার।
কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভরে।
উষা কাহার আশিস বহি
হল আঁধার পার।

বনে বনে ফুল ফুটেছে,
দোলে নবীন পাতা—
কার হৃদয়ের মাঝে হল
তাদের মালা গাঁথা।
বহুযুগের উপহারে
বরণ করি নিল কারে।
কার জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

৯১

তোমার কাছে চাই নে আমি
অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।
বাইরে হোথায় দ্বারের কাছে
কাজের লোকে দাঁড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে যাক-না ফিরে
আপন ঘর।
আমি গান শোনাব গানের পর।

জানি না এর কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা নয়
জানি না কে কোন্‌টা রাখে কোন্‌টা লয়।
চলবে হৃদয় তোমার পানে
শুধু আপন চলার গানে,
ঝরার সুখে ঝরবে সুরের
এ নির্ঝর।
আমি গান শোনাব গানের পর।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯২

এখানে তো বাঁধা পথের
অন্ত না পাই,
চলতে গেলে পথ ভুলি যে
কেবলই তাই।
তোমার জলে, তোমার স্থলে,
তোমার সুনীল আকাশ-তলে,
কোনোখানে কোনো পথের
চিহ্নটি নাই।

পথের খবর পাখির পাখায়
লুকিয়ে থাকে।
তারার আগুন পথের দিশা
আপনি রাখে।
ছয় ঋতু ছয় রঙিন রথে
যায় আসে যে বিনা পথে,
নিজেরে সেই অচিন পথের
খবর শুধাই।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯৩

যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে
এই তো তোমার কথা ছিল আমার সাথে।
তাই তো আমার অশ্রুজলে
তোমার হাসির মুক্তা ফলে,
তোমার বীণা বাজে আমার বেদনাতে।
যা-কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

পরের কথায় চলতে পথে ভয় করি যে।
জানি আমার নিজের মাঝে আছ নিজে।

ভুল আমারে বারে বারে
ভুলিয়ে আনে তোমার দ্বারে,
আপন-মনে চলি গো তাই দিনে রাতে।
যা-কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

বুদ্ধগয়া
২৪ আশ্বিন [১৩২১]

৯৪

পথে পথেই বাসা বাঁধি,
মনে ভাবি পথ ফুরালো—
কোন্ অনাদি কালের আশা
হেথায় বুঝি সব পুরালো।
কখন দেখি আঁধার ছুটে
স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,
পূর্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো।

আবার কবে নবীন ফুলে
ভরে নূতন দিনের সাজি,
পথের ধারে তরুমূলে
প্রভাতী স্বর ওঠে বাজি।
কেমন করে নূতন সাথি
জোটে আবার রাতারাতি,
দেখি রথের চূড়ার 'পরে
নূতন ধ্বজা কে উড়ালো।

বুদ্ধগয়া
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৫

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।
চায় না সে জন পিছন পানে ফিরে,
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তারে ডাকে অকূল নীরে
যার পরানে লাগল তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
রয় না পড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া।
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।

বেলা স্টেশন
২৫ আশ্বিন [১৩২১]

৯৬

জীবন আমার যে অমৃত
আপন-মাঝে গোপন রাখে
প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে
কবে আমি দেখব তাকে।

তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে
পেয়েছি তো আপন মনে,
গন্ধ তারি মাঝে মাঝে
উদাস করে আমায় ডাকে।

নানা রঙে ছায়ায় বোনা
এই আলোকের অন্তরালে
আনন্দরূপ লুকিয়ে আছে
দেখব না কি যাবার কালে।
যে নিরালায় তোমার দৃষ্টি
আপনি দেখে আপন সৃষ্টি
সেইখানে কি বারেক আমায়
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে।

বেলা
২৫ আশ্বিন [১৩২১]
পাল্কি-পথে

৯৭

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন-ঘোরে।
চিরজীবন আমার বীণা-তারে
তোমার আঘাত লাগল বারে বারে,
তাই তো আমার নানা সুরের তানে
তোমার পরশ প্রাণে নিলেম ধরে।

আজ তো আমি ভয় করি নে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।

নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধু-পারে
তবু তুমি সেই তো আমার তুমি,
আবার তোমায় চিনব নূতন করে।

বেলা
২৫ আশ্বিন [১৩২১]
পাল্কি-পথে

৯৮

পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার।
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহো নমস্কার।

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নূতন আশার লহো নমস্কার।
জীবন-রথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার।

বেলা হইতে গয়ায়
২৫ আশ্বিন [১৩২১]
রেল-পথে

৯৯

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।

পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্র নিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।

এলাহাবাদ
২৯ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

১০০

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।
যেথা আমার গান
হয় গো অবসান
সেথা গানের নীরব পারাবার।
যেথা আমার আঁখি
আঁধারে যায় ঢাকি
অলখ-লোকের আলোক সেথা জ্বলে।
বাইরে কুসুম ফুটে
ধুলায় পড়ে টুটে,
অন্তরে তো অমৃত-ফল ফলে।

কর্ম বৃহৎ হয়ে
চলে যখন বয়ে
তখন সে পায় বৃহৎ অবকাশ।
যখন আমার আমি
ফুরায়ে যায় থামি
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ।

এলাহাবাদ
২৯ আশ্বিন [১৩২১]

১০১

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হউক জয়।

এলাহাবাদ
৩০ আশ্বিন [১৩২১]
প্রভাত

১০২

তোমায় ছেড়ে দূরে চলার
নানা ছলে
তোমার মাঝে পড়ি এসে
দ্বিগুণ বলে।
নানান পথে আনাগোনা
মিলনেরই জাল সে বোনা,
যতই চলি ধরা পড়ি
পলে পলে।

শুধু যখন আপন কোণে
পড়ে থাকি
তখনি সেই স্বপন-ঘোরে
কেবল ফাঁকি।
বিশ্ব তখন কয় না বাণী,
মুখেতে দেয় বসন টানি,
আপন ছায়া দেখি আপন
নয়ন-জলে।

এলাহাবাদ
১ কার্তিক [১৩২১]

১০৩

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শত্রু হয়ে দাঁড়াই যখন
লও যে জিনি।
এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে
ততই শুধু তোমার কাছে
হয় সে ঋণী।

উড়িয়ে যেতে চাই যতবার
 গর্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
 পাই যে বুকে।
আলো যখন আলসভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
 নিশীথিনী।

এলাহাবাদ
১ কার্তিক [১৩২১]
সন্ধ্যা

১০৪

কেমন করে তড়িৎ-আলোয়
 দেখতে পেলেম মনে
তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে
 আমার এই জীবনে।
সে সৃষ্টি যে কালের পটে
লোকে লোকান্তরে রটে,
একটু তারি আভাস কেবল
 দেখি ক্ষণে ক্ষণে।

মনে ভাবি, কান্নাহাসি
 আদর অবহেলা
সবই যেন আমায় নিয়ে
 আমারই ঢেউ-খেলা।
সেই আমি তো বাহনমাত্র,
যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র—
যা রেখে যায় তোমার সে ধন
 রয় তা তোমার সনে।

তোমার বিশ্বে জড়িয়ে থাকে
আমার চাওয়া পাওয়া।
ভরিয়ে তোলে নিত্যকালের
ফাল্গুনেরই হাওয়া।
জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে,
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায় শ্রীচরণে।

আপন-মাঝে আপন জীবন
দেখে যে মন কাঁদে।
নিমেষগুলি শিকল হয়ে
আমায় তখন বাঁধে।
মিটল দুঃখ, টুটল বন্ধ—
আমার মাঝে হে আনন্দ,
তোমার প্রকাশ দেখে মোহ
ঘুচল এ নয়নে।

এলাহাবাদ
১ কার্তিক [১৩২১]
সন্ধ্যা

১০৫

এই নিমেষে গণনাহীন
নিমেষ গেল টুটে—
একের মাঝে এক হয়ে মোর
উঠল হৃদয় ফুটে।
বক্ষে কুঁড়ির কারায় বন্ধ
অন্ধকারের কোন্ সুগন্ধ
আজ প্রভাতে পূজার বেলায়
পড়ল আলোয় লুটে।

তোমায় আমায় একটুখানি
দূর যে কোথাও নাই—
নয়ন মুদে নয়ন মেলে
এই তো দেখি তাই।
যেই খুলেছি আঁখির পাতা,
যেই তুলেছি নত মাথা,
তোমার মাঝে অমনি আমার
জয়ধ্বনি উঠে।

এলাহাবাদ
২ কার্তিক [১৩২১]
প্রভাত

১০৬

যাস নে কোথাও ধেয়ে,
দেখ্‌ রে কেবল চেয়ে।
ওই যে পুরব গগন-মূলে
সোনার বরন পালটি তুলে
আসছে তরী বেয়ে—
দেখ্‌ রে কেবল চেয়ে।

ওই-যে আঁধার তটে
আনন্দ-গান রটে।
অনেক দিনের অভিসারে
অগম গহন জীবন-পারে
পৌঁছিল তোর নেয়ে।
দেখ্‌ রে কেবল চেয়ে।

ওই-যে রে তোর তরী
আলোয় গেল ভরি।

চরণে তার বরণডালা
কোন্ কাননের বহে মালা
গন্ধে গগন ছেয়ে।
দেখ্ রে কেবল চেয়ে।

এলাহাবাদ
২ কার্তিক ১৩২১
প্রভাত

১০৭

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে।
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যাননিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা।

অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা-কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথি, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখি।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি—
বিদায়বেলায় আজিও রহিল বাকি।

যা-কিছু পেয়েছি, যাহা-কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে,
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে—
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে।

এলাহাবাদ
২ কার্তিক [১৩২১]
সন্ধ্যা

১০৮

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারা জীবনের অন্তরের অনির্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যাদীপ-মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত। তোমরা এসেছ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষনে;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বার বার এনেছ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েছ চলে
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেছ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।

এলাহাবাদ
৩ কার্তিক ১৩২১
প্রভাত

সংযোজন

১

কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।
আপনাকে যে আপনি হারায়
কেমনে তার জয় হবে।
শত্রু বাঁধা আলিঙ্গনে
যত প্রণয় তারি সনে—
মুক্ত উদার কোন্ প্রেমে তার লয় হবে
কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।

যে মত্ততা বারে বারে
ছোটে সর্বনাশের পারে
কোন্ শাসনে কবে তাহার ভয় হবে।
কুহেলিকার অন্ত না পাই,
কাটবে কখন ভাবি যে তাই—
এক নিমেষে তুমি হৃদয়ময় হবে।
কেমন করে এমন বাধা ক্ষয় হবে।

বোলপুর
৩ শ্রাবণ ১৩১৭

২

জাগো নির্মল নেত্রে
রাত্রির পরপারে,
জাগো অন্তরক্ষেত্রে
মুক্তির অধিকারে।
জাগো ভক্তির তীর্থে
পূজাপুষ্পের ঘ্রাণে,
জাগো উন্মুখ চিত্তে,
জাগো অম্লান প্রাণে।

জাগো নন্দননৃত্যে
সুধাসিন্ধুর ধারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে।
জাগো উজ্জ্বল পুণ্যে,
জাগো নিশ্চল আশে,
জাগো নিঃসীম শূন্যে
পূর্ণের বাহুপাশে।
জাগো নির্ভয়ধামে,
জাগো সংগ্রামসাজে,
জাগো ব্রহ্মের নামে,
জাগো কল্যাণকাজে।
জাগো দুর্গমযাত্রী,
দুঃখের অভিসারে,
জাগো স্বার্থের প্রান্তে
প্রেমমন্দিরদ্বারে।

৪ আশ্বিন [১৩১৭]

৩

প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।
চির পথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।
তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর,
মুক্তি আমার বন্ধনডোর,
দুঃখসুখের চরম আমার জীবনমরণ হে।

আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে।
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে।
ওগো সবার, ওগো আমার,
বিশ্ব হতে চিত্তে বিহার—
অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।

৫ আশ্বিন [১৩১৭]

৪

তব গানের সুরে হৃদয় মম রাখো হে রাখো ধরে,
তারে দিয়ো না কভু ছুটি।
তব আদেশ দিয়ে রজনীদিন দাও হে দাও ভরে
প্রভু, আমার বাহু দুটি।
তব পলকহারা আলোক-দিঠি মরম-'পরে রাখো,
যত শরমে মোর শরম দিয়ে নীরবে চেয়ে থাকো,
প্রভু, সকল-ভরা ক্ষমায় তব রাখো আবৃত করে
মোর যেখানে যত ত্রুটি।

মোরে দিয়ো না দিন সুখের আশে করিতে দিন গত
শুধু শয়ন-'পরে লুটি।
আমি চাই নি যাহা তাই দিয়ো হে আপন ইচ্ছামতো
আমার ভরিয়া দুই মুঠি।
মোর যতই তৃষা ততই কৃপা-বরষা এসো নেমে,
মোর যত গভীর দৈন্য তত ভরিয়া তোলো প্রেমে,
মোর যত কঠিন গর্ব তারে হানো ততই বলে—
তাহা পড়ুক পায়ে টুটি।

১৯ আশ্বিন ১৩১৭

৫

আজি নির্ভয়নিদ্রিত ভুবনে জাগে কে জাগে।
ঘন সৌরভমন্থর পবনে জাগে কে জাগে।
কত নীরব বিহঙ্গ-কুলায়ে
মোহন অঙ্গুলি বুলায়ে জাগে কে জাগে।
কত অস্ফুট পুষ্পের গোপনে জাগে কে জাগে।
এই অপার অম্বর-পাথারে
স্তম্ভিত গম্ভীর আঁধারে জাগে কে জাগে।
মম গম্ভীর অন্তর-বেদনে জাগে কে জাগে।

শিলাইদহ
অগ্রহায়ণ ১৩১৭

৬

আমি অধম অবিশ্বাসী,
এ পাপমুখে সাজে না যে
'তোমায় আমি ভালোবাসি'।
গুণের অভিমানে মেতে
আর চাহি না আদর পেতে,
কঠিন ধুলায় বসে এবার
চরণসেবার অভিলাষী।

হৃদয় যদি জ্বলে তারে
জ্বলিতে দাও, জ্বলিতে দাও
ঘুরব না আর আপন ছায়ায়,
কাঁদব না আর আপন মায়ায়—
তোমার পানে রাখব ধরে
প্রাণের অচল হাসি।

? ১৩১৭

৭

যদি আমায় তুমি বাঁচাও তবে
তোমার নিখিল ভুবন ধন্য হবে।
যদি আমার মলিন মনের কালি।
ঘুচাও পুণ্য সলিল ঢালি
তোমার চন্দ্র সূর্য নূতন আলোয়
জাগবে জ্যোতির মহোৎসবে।

আজো ফোটে নি মোর শোভার কুঁড়ি,
তারি বিষাদ আছে জগৎ জুড়ি।
যদি নিশার তিমির গিয়ে টুটে
আমার হৃদয় জেগে উঠে
তবে মুখর হবে সকল আকাশ
আনন্দময় গানের রবে।

? ১৩১৭

৮

বলো, আমার সনে তোমার কী শত্রুতা।
আমায় মারতে কেন এতই ত্বরা।
একে একে রতনগুলি
হার থেকে মোর নিলে খুলি,
হাতে আমার রইল কেবল সুতা।

গেয়েছি গান, দিয়েছি প্রাণ ঢেলে,
পথের 'পরে হৃদয় দিলেম মেলে।
পাবার বেলা হাত বাড়াতেই
ফিরিয়ে দিলে শূন্য হাতেই—
জানি জানি তোমার দয়ালুতা।

৭ ভাদ্র [১৩২১]

৯

দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন।
পার আছে এর— এই সাগরের
বিপুল ক্রন্দন।
এই জীবনের ব্যথা যত
এইখানে সব হবে গত—
চিরপ্রাণের আলয়-মাঝে
বিপুল সান্ত্বন।

মরণ যে তোর নয় রে চিরন্তন।
দুয়ার তাহার পেরিয়ে যাবি,
ছিঁড়বে রে বন্ধন।
এ বেলা তোর যদি ঝড়ে
পূজার কুসুম ঝরে পড়ে
যাবার বেলায় ভরবি থালায়
মালা ও চন্দন।

সুরুল
১ আশ্বিন [১৩২১]

১০

ওগো, আপন রসে মাতে কারা,
তোমার রস যে পায় না।
আপনাকে যে খায় গো তারা,
তোমার প্রসাদ-খায় না।
প্রেমের চোখে দুঃখে সুখে
চায় না তারা তোমার মুখে,
আপ্‌নারি মুখ দেখছে নিয়ে
সোনায় বাঁধা আয়না।
তারা রাত্রি-দিবস ফিরে ফিরে
আপ্‌নাকেই যে বেড়ায় ঘিরে।

? [আশ্বিন ১৩২১]

পাণ্ডুলিপিতে লেখক কর্তৃক বর্জনচিহ্নাঙ্কিত। অসম্পূর্ণ ?

১১

আমার বোঝা এতই করি ভারী—
তোমার ভার যে বইতে নাহি পারি।
আমারি নাম সকল গায়ে লিখা,
হয় নি পরা তব নামের টিকা—
তাই তো আমায় দ্বার ছাড়ে না দ্বারী।

আমার ঘরে আমিই শুধু থাকি,
তোমার ঘরে লও আমারে ডাকি।
বাঁচিয়ে রাখি যা-কিছু মোর আছে
তার ভাবনায় প্রাণ তো নাহি বাঁচে—
সব যেন মোর তোমার কাছে হারি।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন ১৩২১

নাটক ও প্রহসন

অচলায়তন

র-১১॥২০

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ
এই অচলায়তন নাটকখানি
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে
উৎসর্গ করিলাম।

শিলাইদহ
১৫ আষাঢ় ১৩১৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অচলায়তন

১

অচলায়তনের গৃহ

গান

পঞ্চক। তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে,
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ তো টানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! আবার গান!

পঞ্চক। দাদা, তুমি তো দেখলে— তোমাদের এখানকার মন্ত্র-তন্ত্র আচার-আচমন সূত্র-বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে তো দেখতে বাকি নেই— কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক। একমাত্র ঐটেই যে পারি।

মহাপঞ্চক। পারি! ভারি অহংকার। গান তো পাখিও গাইতে পারে। সেই-যে বজ্রবিদারণ-মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে তোমার মুখস্থ হল না, আজ তার কী করলে?

পঞ্চক। সাত দিন যেমন হয়েছে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেইরকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক। খারাপ! তার মানে কী হল?

পঞ্চক। জিনিসটা যতই পুরোনো হচ্ছে মন ততই লাগছে না, ভুল ততই করছি— ভুল যতই বেশি বার করছি ততই সেইটেই পাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্ছি, দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাত হয়ে গেছে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক। সেই তফাতটা ঘোচাতে হবে নির্বোধ।

পঞ্চক। সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদেরটাকেই আমার মতো করে নাও। নইলে আমি তো পারব না।

মহাপঞ্চক। পারবে না কী! পারতেই হবে।

পঞ্চক। তা হলে আর-একবার সেই গোড়া থেকে চেষ্টা করে দেখি— একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপঞ্চক। আচ্ছা বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে যাও। ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসত্বানি। চুপ করে রইলে যে!

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়— আচ্ছা দাদা।

মহাপঞ্চক। আবার দাদা। মন্ত্রটা শেষ করো বলছি।

পঞ্চক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— এ মন্ত্রটার ফল কী?

মহাপঞ্চক। এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্যোদয়-সূর্যাস্তে উনসত্তর বার করে জপ করলে নব্বই বৎসর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক। রক্ষা করো দাদা। এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়— দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেছি।

মহাপঞ্চক। আমার ভাই হয়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে আমাদের এই অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!

পঞ্চক। লজ্জার তো কোনো কারণ নেই দাদা।

মহাপঞ্চক। কারণ নেই?

পঞ্চক। না। তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে।

মহাপঞ্চক। এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখো পঞ্চক, তুমি তো আর বালক নও— তোমার এখন বিচার করে দেখবার বয়স হয়েছে।

পঞ্চক। তাই তো বিপদে পড়েছি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার

একেবারে তার উলটো দিকে চলে, অথচ তার জন্যে যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপঞ্চক। পিতার মৃত্যুর পর কী দরিদ্র হয়ে, সকলের কী অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলুম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেছি— আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না?

পঞ্চক। সচেষ্ট করবার তো কথা নয়। তুমি যে নিজগুণেই দৃষ্টান্ত হয়ে বসে আছ, ওর মধ্যে আমার চেষ্টার তো কিছুমাত্র দরকার হয় না। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকাগাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি, সময় নষ্ট কোরো না। [প্রস্থান

গান

পঞ্চক।

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর
কেউ তো হানে না।
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ তো আনে না।
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে
কেউ তা জানে না॥

ছাত্রদলের প্রবেশ

প্রথম ছাত্র। ওহে পঞ্চক।

পঞ্চক। না ভাই, আমাকে বিরক্ত কোরো না।

দ্বিতীয় ছাত্র। কেন? হল কী তোমার?

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় ছাত্র। এখনো তট তট তোতয় তোতয় ঘুচল না? ও যে আমাদের কোন্ কালে শেষ হয়ে গেছে তা মনেও আনতে পারি নে।

প্রথম ছাত্র। না ভাই, পঞ্চককে একটু পড়তে দাও; নইলে ওর কী গতি হবে! এখনো ও বেচারা তট তট করে মরছে— আমাদের যে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে!

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা পঞ্চক, এখনো তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখ নি ?

পঞ্চক। না।

তৃতীয় ছাত্র। মরীচি ?

পঞ্চক। না।

প্রথম ছাত্র। মহামরীচি ?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পর্ণশবরী ?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয় ছাত্র। আচ্ছা বলো দেখি, হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে পরিমাণ ধূলিকণা লাগে সেই পরিমাণ যদি—

পঞ্চক। আরে ভাই, হরেত পক্ষীই কোনো জন্মে দেখি নি তো তার নখাগ্রের ধূলিকণা !

প্রথম ছাত্র। হরেত পক্ষী তো আমরাও কেউ দেখি নি। শুনেছি, সে দধিসমুদ্রের পারে মহাজম্বুদ্বীপে বাস করে। কিন্তু এ-সমস্ত তো জানা চাই, নিতান্ত মূর্খ হয়ে জীবনটাকে মাটি করলে তো চলবে না।

দ্বিতীয় ছাত্র। পঞ্চক, তুমি আর বৃথা সময় নষ্ট কোরো না। তোমার কাছে তো কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চুপরীক্ষা, ছাগলোমশোধন, দ্বাবিংশপিশাচভয়ভঞ্জন— এগুলো তো জানা চাইই ; নইলে তুমি অচলায়তনের ছাত্র বলে লোকসমাজে পরিচয় দেবে কোন্ লজ্জায় ?

তৃতীয় ছাত্র। চলো বিশ্বম্ভর, আমরা যাই। ও একটু পড়ুক। [গমনোদ্যত

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর। তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বম্ভর। কেন। আবার ডাকো কেন ?

পঞ্চক। সঞ্জীব, জয়োত্তম, তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব। কী হয়েছে ? পড়ো-না।

পঞ্চক। দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে যেয়ো না। ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান জীবের মুখ দেখলে তবু আশ্বাস হয় যে, জগৎটা বিধাতাপুরুষের প্রলাপ্ নয়।

জয়োত্তম। না হে, মহাপঞ্চক বড়ো রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্ছে না তার কারণ আমরা।

পঞ্চক। আমি যে কারো কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগুণেই

অকৃতার্থ হতে পারি, দাদা আমার এটুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না, এতেই আমি বড়ো দুঃখিত হই। আচ্ছা ভাই, তোমরা ঐখানে একটু তফাতে বসে কথাবার্তা কও। যদি দেখ একটু অন্যমনস্ক হয়েছি, আমাকে সতর্ক করে দিয়ো। স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম। আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বসছি।

সঞ্জীব। বিশ্বম্ভর, তুমি যে বললে এবার আমাদের আয়তনে গুরু আসবেন, সেটা শুনলে কার কাছ থেকে ?

বিশ্বম্ভর। কী জানি, কারা সব বলা-কওয়া করছিল। কেমন করে চারি দিকেই রটে গিয়েছে যে, চাতুর্মাস্যের সময় গুরু আসবেন।

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর, বল কি ? আমাদের গুরু আসবেন নাকি ?

সঞ্জীব। আবার পঞ্চক ! তোমার কাজ তুমি করো-না।

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। কিন্তু অধ্যাপকদের কারো কাছে শুনেছ কি ? মহাপঞ্চক কী বলেন ?

বিশ্বম্ভর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। মহাপঞ্চক কারো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্যঅষ্টোত্তরশত নিয়ে পড়েছেন— তাঁর কাছে ঘেঁষে কে !

পঞ্চক। চলো-না ভাই, আচার্যদেবের কাছে যাই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম। আবার ! ফের !

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আমার তো উনিশ বছর বয়স হল— এর মধ্যে একবারও আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেন নি। আজ তিনি হঠাৎ আসতে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারি নে।

সঞ্জীব। তোমার তর্কটা কেমনতরো হল হে জয়োত্তম ? উনিশ বছর আসেন নি বলে বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হল কোন্ যুক্তিতে ?

বিশ্বম্ভর। তা হলে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হয়ে যায়। তবে তো উনিশ পর্যন্ত বিশ নেই বলে উনিশের পরেও বিশ থাকতে পারে না।

সঞ্জীব। শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ, যা এ মুহূর্তে ঘটে নি তা ও মুহূর্তেই বা ঘটে কী করে।

জয়োত্তম। আরে, ঐটেই তো আমার তর্ক। কে বললে ঘটে ? যা পূর্বে

ঘটে নি তা কিছুতেই পরে ঘটতে পারে না। আচ্ছা, এসো, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে দাও।

পঞ্চক। (জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া) প্রমাণ? এই দেখো প্রমাণ। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আঃ পঞ্চক! কর কী! নাবো বলছি— আঃ নাবো।

পঞ্চক। আমি যে তোমার কাঁধে চড়েছি সেটা প্রমাণ না করে দিলে আমি কিছুতেই নাবছি নে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, তুমি বড়ো উৎপাত করছ।

পঞ্চক। দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরো থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেছি। তট তট তোতয় তোতয় ফট ফট—

মহাপঞ্চক। তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ জুটলেই তোমাকে সংবরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বম্ভর। দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুনতে পাচ্ছি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আসবেন।

মহাপঞ্চক। আসবেন কি না তা নিয়ে আন্দোলন না করে যদিই আসেন তার জন্যে প্রস্তুত হও।

পঞ্চক। তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তুত হবেন। এ দিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তুত হতে গেলে হয়তো মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপঞ্চক। ভারি বুদ্ধিমানের মতোই কথা বললে!

পঞ্চক। অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগোয় তখন মুখ স্থির হয়ে সেটা গ্রহণ করে— এ তো সোজা কথা। আমার ভয় হয়, গুরু এসে হয়তো দেখবেন, আমরা যে দিক দিয়ে প্রস্তুত হতে গিয়েছি সে দিকটা উলটো। সেইজন্যে আমি কিছু করি নে।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, আবার তর্ক?

পঞ্চক। তর্ক করতে পারি নে বলে রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগ'!

মহাপঞ্চক। যাও তুমি।

পঞ্চক। যাচ্ছি, কিন্তু বলো-না, গুরু কি সত্যই আসবেন?

মহাপঞ্চক। তাঁর সময় হলেই তিনি আসবেন। [প্রস্থান

সঞ্জীব। মহাপঞ্চক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েছেন এমন কখনোই শুনি নি।

জয়োত্তম। কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তারাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তারাই জবাব দেয়; আর যারা বেশি জানে তারা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পঞ্চক। সেইজন্যেই উপাধ্যায়মশায় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও, কিন্তু আমি একেবারে মূক হয়ে থাকি।

জয়োত্তম। কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগুলো বল তাতেই—

পঞ্চক। হাঁ, তাতেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিনতেই পারত না।

বিশ্বম্ভর। দেখো পঞ্চক, যদি গুরু আসেন তা হলে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লজ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব। আটান্ন প্রকার আচমনবিধির মধ্যে পঞ্চক বড়োজোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেছে।

পঞ্চক। সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না। অত্যুক্তি করছ।

সঞ্জীব। অত্যুক্তি!

পঞ্চক। অত্যুক্তি নয় তো কী! তুমি বলছ পাঁচটা শিখেছি। আমি দুটোর বেশি একটাও শিখি নি। তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন্ পর্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবোতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা আমার খুব অভ্যাস হয়ে গেছে। হাসছ কেন? বিশ্বাস করছ না বুঝি?

জয়োত্তম। বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন তাঁকে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত দেখিয়ে বিস্মিত করবার চেষ্টায় ছিলুম, কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জনী তুললেন, আমার আর এগোল না।

বিশ্বম্ভর। না পঞ্চক, এবার গুরু আসার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।

পঞ্চক। পঞ্চক পৃথিবীতে যেমন অপ্রস্তুত হয়ে জন্মেছে তেমনি অপ্রস্তুত হয়েই মরবে; ওর ঐ একটি মহদ্‌গুণ আছে, ওর কখনো বদল হয় না।

সঞ্জীব। তোমার সেই গুণে উপাধ্যায়মশায়কে যে মুগ্ধ করতে পেরেছ তা তো বোধ হয় না।

পঞ্চক। আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি যে, বিদ্যা সম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই— ঐ যাকে বল ধ্রুবনক্ষত্র— তাতে সুবিধা এই যে, এখানকার ছাত্ররা কে কতদূর এগোল তা আমার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে।

জয়োত্তম। তোমার আশ্চর্য এই সুযুক্তিতে উপাধ্যায়মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চক। না, কিছু না— তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্বে তাঁর যে ধারণা ছিল সেইটেই দেখলুম আরো পাকা হল।

সঞ্জীব। আমরা যদি উপাধ্যায়মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বলতুম তা হলে রক্ষা থাকত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক। তার মানে আছে। কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভাবিক যে, সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুশি হয়ে বলে, ঠিক হয়েছে, পঞ্চকের মতোই কথা হয়েছে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই, এমনি তোমরা হতভাগ্য।

জয়োত্তম। যাও ভাই পঞ্চক, আর বোকো না। আমরা চললুম। তুমি একটু মন দিয়ে পড়ো। [তিনজনের প্রস্থান

পঞ্চক। হবে না, আমার কিছুই হবে না। এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না।

গান

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।

ও কী ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে! [প্রস্থান

বালক সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্, কী হয়েছে বল্।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না! ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে!

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল্।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে!

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না— একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে। আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তা হলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত; আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম বালক। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে?

দ্বিতীয় বালক। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ। ভয় নেই সুভদ্র। কাঁদছিস কেন ভাই। প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিঁকতেই পারত না।

প্রথম বালক। (চুপি চুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অমন সাহস আছে?

দ্বিতীয় বালক। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

তৃতীয় বালক। সে দিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তা হলে যে সে—

পঞ্চক। তা হলে কী?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক, শুনিই-না।

তৃতীয় বালক। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন্ বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে। কিন্তু যাই হোক-না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই-না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বৈকি। ও মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে তার উপর পাঁচটা শেয়াল-কাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ! কী ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল।

পঞ্চক। তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম বালক। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয় বালক। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কিরকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক। তা হলে এ সম্বন্ধে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।

প্রথম বালক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের উত্তর দিকের জানলাটা—

পঞ্চক। সেটাও আমাকে একবার খুলে দেখতে হবে স্থির করেছি।

সুভদ্র। তুমিও খুলে দেখবে?

পঞ্চক। হাঁ ভাই সুভদ্র, তা হলে তুই তোর দলের একজন পাবি।

প্রথম বালক। না পঞ্চকদাদা, পায়ে পড়ি পঞ্চকদাদা, তুমি—

পঞ্চক। কেন রে, তোদের তাতে ভয় কী?

দ্বিতীয় বালক। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। ভয়ানক না হলে মজা কিসের?

তৃতীয় বালক। সে যে ভয়ানক পাপ।

প্রথম বালক। মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে দিয়েছেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়; কেননা উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর।

পঞ্চক। মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম, সেই মজাটা কি-রকম দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।

প্রথম বালক। তোমার ভয় করবে না?

পঞ্চক। কিছু না। ভাই সুভদ্র, তুই কী দেখলি বল্ দেখি।

দ্বিতীয় বালক। না না, বলিস নে।

তৃতীয় বালক। না, সে আমরা শুনতে পারব না— কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। আচ্ছা, একটু, খুব একটুখানি বল্ ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম— সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা! না না, আর শুনব না। আর বোলো না সুভদ্র। ঐ যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল্ চল্— আর না।

পঞ্চক। কেন। এখন তোমাদের কী।

প্রথম বালক। বেশ, তাও জান না বুঝি। আজ যে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী।

দ্বিতীয় বালক। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত-কোণে ঢোঁড়াসাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম বালক। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয় বালক। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম বালক। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য। [বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

উপাধ্যায়। পঞ্চককে শিশুদের দলেই প্রায় দেখতে পাই।

পঞ্চক। এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড়ো হলেই আর তখন—

উপাধ্যায়। কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হয়ে উঠছে। সেদিন পটুবর্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেছে, শুক্রবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তার গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েছে।

পঞ্চক। তা দিয়েছে বটে। আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

উপাধ্যায়। সে আমি অনুমানেই বুঝেছি, নইলে এতবড়ো আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘটবে কেন। শুনেছি, তুমি নাকি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্য পটুবর্মকে ডেকে তোমার গায়ের উপর একশো বার হাই তুলতে বলেছিলে ?

পঞ্চক। আপনি ভুল শুনেছেন।

উপাধ্যায়। ভুল শুনেছি ?

পঞ্চক। একলা পটুবর্মকে নয়, সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিলুম— পক্ষপাত করি নি।

উপাধ্যায়। প্রত্যেককেই ডেকেছিলে ?

পঞ্চক। প্রত্যেককেই। আপনি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে জানবেন। কেউ সাহস করে এগোল না। তারা হিসেব করে দেখলে, পনেরো জন ছেলেতে মিলে দেড়শো হাই তুললে তাতে আমার সমস্ত আয়ু ক্ষয় হয়ে গিয়েও আরো অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্‌বৃত্তটাকে নিয়ে যে কী হবে তাই স্থির করতে না পেরে তারা মহাপঞ্চকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তাতেই তো আমি ধরা পড়ে গেছি।

উপাধ্যায়। দেখো, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে এতদিন অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আর চলবে না। আমাদের গুরু আসছেন শুনেছ ?

পঞ্চক। গুরু আসছেন ? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েছেন ?

উপাধ্যায়। হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের তো কোনো কারণ নেই।

পঞ্চক। আমারই তো গুরুর দরকার বেশি, আমার যে কিছুই শেখা হয় নি।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়।

পঞ্চক। আরে, পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনছি, এখন বিরক্ত করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন। সুভদ্র, শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে ?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ ? আচ্ছা বেশ। তা হলে বোসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেওয়ালে আঁক কেটেছ ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কুনুই ঠেকিয়েছ। তা হলে তো সে দিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে ?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি।— কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি —

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না ? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে— তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশাই, আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার ! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর্।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরে দেয়ালে যে আঁক কেঁটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার ?

সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ ! করেছিস কী ! আজ তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস ?

সুভদ্র। আমার কী হবে।

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়মশায়ের মুখে আর কথা নেই। [সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী। বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই, আচার্যদেবকে জানাই গে। [প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি— কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না, আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। দ্বিধা? তা দ্বিধা হচ্ছে সে কথা স্বীকার করি। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) দেখো সুতসোম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছি নে। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যেদিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছি নে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে— বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা।

উপাচার্য। আচার্যদেব, বলেন কী। বৃথা, সমস্তই বৃথা?

আচার্য। সুতসোম, আমরা এখানে কতদিন হল এসেছি মনে পড়ে কি? কত বছর হবে?

উপাচার্য। সময় ঠিক করে বলা বড়ো কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না। আমার তো মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব হতেই এখানে স্থির হয়ে বসে আছি।

আচার্য। দেখো সুতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা-কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্যে

সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে কিছু-একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়াল— আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল্‌ মূর্খ, কী পেয়েছিস। কিছু না কিছু না, সুতসোম। আজ দেখছি— এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে— কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

উপাচার্য। বোলো না, বোলো না, এমন কথা বোলো না। আচার্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হল!

আচার্য। সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের মতো শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কিছু ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য। না না, তবে আমি ভুল করছিলুম সুতসোম, ভুল করছিলুম। যা আছে এই ঠিক, এইই ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য। সেইজন্যেই তো অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরোনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে— শান্তি চলে যায়।

আচার্য। ঠিক, ঠিক— ঠিক বলেছ সুতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত— এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়— তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি। গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়ো না কিছু আঘাত কোরো না— চারি দিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের। আমাদের পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল— প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হয়ে গেছে— আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই— আমাদের আর সময় নেই।

উপাচার্য। আচার্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না,

চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সুতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত।

আচার্য। আজ আমার একটু একটু মনে পড়ছে বহুপূর্বে প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই— তিনি পুঁথি নন, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরম্ভ করলুম— এতদিন মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলুম সেইটেই বুঝি আছে, ঠিক চলছে— কিন্তু—

উপাচার্য। ঠিক আছে, ঠিক চলছে আচার্যদেব, ভয় নেই। প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হতে দিই নি। তারই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে! সর্বনাশ! সেই ছায়া!

আচার্য। সর্বনাশই তো!

উপাচার্য। তা হলে হবে কী! এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠতে হবে?

আচার্য। আমি তো তাই সামনে দেখছি। সে কি আমার স্বপ্ন! অথচ আমার তো মনে হচ্ছে এই সমস্তই স্বপ্ন— এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই-সব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি— সমস্তই স্বপ্ন।

উপাচার্য। ঐ-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়! এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল! শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন-একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই দমন করা গেল না। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দিয়ো।

আচার্য। আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস পঞ্চক!

পঞ্চক। করলেন কী! আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জানো, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে-খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য। নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে লোক ভাঙতে যাবে তারই বা দুর্গতি ঘটতে দেব কেন?

পঞ্চক। আমি কোনো তর্ক করব না। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তা হলে পালন করব। আমি আচার-অনুষ্ঠান কিছুই জানি নে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য। আদেশ করব— তোমাকে! সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পঞ্চক। কেন আদেশ করবেন না প্রভু।

আচার্য। কেন? বলব বৎস? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস?

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না-কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশু-জাতির সঙ্গে মেশ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান ?

আচার্য। না না, থাক্, বোলো না। কিন্তু শোণপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে।

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে তুমি ভুল করো গে— আমাদের কথা শুনো না। আমাদের গুরু আসছেন পঞ্চক— তাঁর কাছে তোমার মতো বালক হয়ে যদি বসতে পারি— তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে করে সত্য জানবার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দু-হাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন !

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য আসছেন— বোধ করি কাজের কথা আছে— বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্‌বিগ্ন হবেন— কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি ?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য। উপাধ্যায়, কথাটা বলে ফেলো। এ দিকে প্রতিকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গ্রহাচার্য বলছেন আজ তিন প্রহর সাড়ে তিন দণ্ডের মধ্যে দ্ব্যাত্মকচরাংশলগ্নে যা-কিছু করবার সময়— সেটা অতিক্রম করলেই গোপরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তখন প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে বিপ্র, অর্ধ পাদ বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শূদ্র।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রঃপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি— সবাই ভুলেই গেছে। ঐ-যে মহাপঞ্চক আসছে— যদি কারো জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেইজন্যেই তো এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারো স্মরণ নেই— তুমিই বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না— একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস?

মহাপঞ্চক। হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে। [সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই?

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই— সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ-রকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি। এই তো

সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল 'জল জল' করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই।— এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে পাপ তাদেরই। এসো পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়!

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সমস্তই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান!

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতনধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল! এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

উপাচার্য। সে কি হয়! যিনি একবার আচার্য হয়েছেন তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামত—

মহাপঞ্চক। উপাচার্যমশায়, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য। নূতন কিছুতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়

উপাধ্যায়। আজ বিপদের সময় বয়স-বিচার!

উপাচার্য। ধর্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার করো। আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্যদেবের পাশে। আমরা একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হয়ে যাব।

মহাপঞ্চক। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে দেখবেন। আচার্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য হবার অধিকার।

উপাচার্য। মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব?

এ কথা বলবার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেছ সে কি এখানকার উত্তর দিকের জানলা খোলার চেয়ে কম পাপ! [প্রস্থান

মহাপঞ্চক। চলো উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাকবেন ততক্ষণ ক্রিয়াকর্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।

২

পাহাড়-মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে! তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস?

প্রথম শোণপাংশু। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা-দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আয় ভাই, ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে, ছুঁস নে।

তৃতীয় শোণপাংশু। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম শোণপাংশু। সত্যি নাকি! তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, এলে খবর দিয়ো— একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো শোণপাংশুদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে— তাকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশু। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়! আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ-পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম শোণপাংশু। সেইজন্যেই তো ও-জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক— তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী-একটা ফল পাবে— তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিন্তু শোণপাংশু ব'লে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না; সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে— কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস— সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বৈকি, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব ক'ষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরই সোনার রোদে পূর্ণিমারই চন্দ্রে।

পঞ্চক। আচ্ছা, নাহয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়— কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস।

প্রথম শোণপাংশু। করি বৈকি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি?

তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না? এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। কেন কী রে! ওটা যে নিষেধ।

প্রথম শোণপাংশু। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোনো একবার! নিষেধ, তার আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না?

পঞ্চক। খাই বৈকি, খুব আদর করে খাই— কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন! তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-খবর রাখিস নে বুঝি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক। আবার কেন! তোরা যে ঐ এক কেন'র জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় শোণপাংশু। আর, খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এত-বড়ো তেজ। তোরা হলে কী করতিস বল্ দেখি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের কথা বল কেন? উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তা হলে তাকে আরো একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস— তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম শোণপাংশু। লোহার কাজ করি বৈকি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম! রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি, কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো— সে তো হতেই পারে না!

তৃতীয় শোণপাংশু। আমরা লোহার কাজ করি তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

গান

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন,
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে!
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সংগোপন,
ওগো, তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেছে হাতের তলে,
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে।
অচল ছিল, সচল হয়ে
ছুটেছে ওই জগৎ জয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তার রাশ বাগাইনু রে।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায়মশায় একঘর ছাত্রের সামনে বললেন শোণপাংশু জাতটা এমনই বিশ্রী যে, তারা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বললুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করে নি সে আমি জানি— এমন-কি, এই পৃথিবীটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি তাও ঐ মূর্খেরা জানে না, আবার সে কথা বলতে গেলে মারতে আসে— তাই ব'লে ভালোমন্দর জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে, লোহার কাজ নিজের হাতে করবে। আজ তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, যার যে বংশে জন্ম তার সেইরকম বুদ্ধিই হয়।

প্রথম শোণপাংশু। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে।

পঞ্চক। আরে, ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম শোণপাংশু। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কি— এই বুঝে নে-না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চকদাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চকদাদাকে ওখানকার ছাত্রেরা একেবারে পূজা করে! যা হোক ভাই, তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য করে দিলি রে। তোরা তো খেঁসারিডাল চাষ করছিস আবার লোহাও পিটোচ্ছিস, এখনো তোরা কোনো দিক থেকে কোনো পাঁচ-চোখ কিংবা সাত-মাথাওয়ালার কোপে পড়িস নি?

প্রথম শোণপাংশু। যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে, তারও কোপ বড়ো কম নয়।

পঞ্চক। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পঞ্চক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র— তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় শোণপাংশু। ওর মানে কী!

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মরীচি?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী।

তৃতীয় শোণপাংশু। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া-নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় শোণপাংশু। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তা হলে তোদের বুকে করে পাগলের মতো নাচব, আমার জাত-মান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

শোণপাংশুগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাইবা পারি,
নাহয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে— আমার সর্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা-দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্ দিন আমিও লোহা পিটব রে, লোহা পিটব— কিন্তু খেঁসারির ডাল— না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস নে, পড়ব ব'লে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ও কী পুঁথি দাদা? ওতে কী আছে?

পঞ্চক। এ আমাদের দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা— এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে।

প্রথম শোণপাংশু। কিরকম?

পঞ্চক। দশটা দিকের দশ রকম রঙ গন্ধ আর স্বাদ আছে কি না এতে তার সমস্ত খোলসা করে লিখেছে। দক্ষিণ দিকের রঙটা হচ্ছে রুইমাছের পেটের মতো, ওর গন্ধটা দধির গন্ধ, স্বাদটা ঈষৎ মিষ্টি; পুব দিকের রঙটা হচ্ছে সবুজ, গন্ধটা মদমত্ত হাতির মতো, স্বাদটা বকুলের ফলের মতো কষা— নৈর্ঋত কোণের —

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর বলতে হবে না দাদা। কিন্তু দশ দিকে তো আমরা এ-সব রঙ গন্ধ দেখতে পাই নে।

পঞ্চক। দেখতে পেলে তো দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সেও দেখত। এ-সব কেবল পুঁথিতে পড়তে পাওয়া যায়, জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

প্রথম শোণপাংশু। তা হলে দাদা তুমি পুঁথিই পড়ো, আমরা চললুম।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এদের মতো চোখকান বুজে যদি আমাদের বসে বসে ভাবতে হত তা হলে তো আমরা পাগল হয়ে যেতুম।

তৃতীয় শোণপাংশু। চল্ ভাই, ঘুরে আসি, শিকারের সন্ধান পেয়েছি। নদীর ধারে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে। [প্রস্থান

পঞ্চক। এই শোণপাংশুগুলো বাইরে থাকে বটে, কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখতেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দিক ঘুলিয়ে যায়। এরা একটু থেমেছে অমনি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেছে। এই শোণপাংশুদের দেখছি ওরা চুপ করলেই আর কিছু শুনতে পায় না— ওরা নিজের গোলমালটা শোনে সেইজন্যে এত গোল করতে ভালোবাসে। কিন্তু এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্ছে, আমার সমস্ত শরীরটা গুন্ গুন্ করে বেড়াচ্ছে।

গান

ঘরেতে ভ্রমর এলো গুন্‌গুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগল বনে,
এলো সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় শুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কী মায়া দেয় বুলায়ে;
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

শোণপাংশুদলের পুনঃপ্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখন রাখো তোমার পুঁথি রাখো— দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী রে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী চাই রে?

তৃতীয় শোণপাংশু। কিছু চাই নে— একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে।

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

গান

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো নানা কাজে,
এই তো নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো হাসির দলে,
এই তো চোখের জলে,

এই তো সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই তো ঘরে ঘরে,
এই তো বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর।
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর।

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম শোণপাংশু। নিয়ে যাও না। সে তো ভালোই হয়। তা হলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো-সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা, আয় ভাই, আমাদের কাজগুলো সেরে আসি। দাদাঠাকুরকে নিয়ে পঞ্চকদাদা একটু বসুক। [প্রস্থান

পঞ্চক। ঐ শোণপাংশুগুলো গেছে, এইবার তোমার পায়ের ধুলো নিই দাদাঠাকুর। ওরা দেখলে হেসে অস্থির হত তাই ওদের সামনে কিছু করি নে।

দাদাঠাকুর। দরকার কী ভাই পায়ের ধুলোয়।

পঞ্চক। নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে ওঠে, তখন বুঝি তার ভারে মাথা নিচু হয়ে পড়ে— ভক্তি না করে যে বাঁচি নে।

দাদাঠাকুর। ভাই, আমিও থাকতে পারি নে। স্নেহ যখন আমার হৃদয়ে ধরে না, তখন সেই স্নেহই আমার ভক্তি।

পঞ্চক। অচলায়তনে প্রণাম করে করে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। তাতে নিজেকেই কেবল ছোটো করেছি, বড়োকে পাই নি।

দাদাঠাকুর। এই আমার সবার বাড়া বড়োর মধ্যে এসে যখন বসি তখন যা করি তাই প্রণাম হয়ে ওঠে। এই-যে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্বাদ করছে— এও আমার প্রণাম।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, তোমার দুই চোখ দিয়ে এই-যে তুমি কেবল সেই বড়োকে দেখছ, তোমাকে যখন দেখি তখন তোমার সেই দেখাটিকেও আমি যেন পাই। তখন

পশুপাখি গাছপালা আমার কাছে আর কিছুই ছোটো থাকে না। এমন-কি, তখন ঐ শোণপাংশুদের সঙ্গে মাতামাতি করতেও আমার আর বাধে না।

দাদাঠাকুর। আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরনার ধারার সঙ্গে খেলছি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেলছি।

পঞ্চক। তোমার কাছে সবই বড়ো হয়ে গিয়েছে।

দাদাঠাকুর। না ভাই, বড়ো হয় নি, সত্য হয়ে উঠেছে— সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা।

পঞ্চক। তোমার বাধা কেটে গেছে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেছে। এমন হাসতে খেলতে, মিলতে মিশতে, কাজ করতে, কাজ ছাড়তে কে পারে! তোমার ঐ ভাব দেখে আমার মনটা ছট্‌ফট্ করতে থাকে। ঐ-যে কী-একটা আছে— চরম, না পরম, না কী, তা কে বলবে— তার জন্যে দিনরাত যেন আমার মন কেমন করে। থেকে থেকে এক-একবার চমকে উঠি, আর ভাবি এইবার বুঝি হল, বুঝি পাওয়া গেল। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসবেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। তোমার যে শিক্ষা কাঁচা রয়েছে, মনে ভয় হচ্ছে না?

পঞ্চক। আমার ভয় সব চেয়ে কম— আমার একটি ভুলও হবে না।

দাদাঠাকুর। হবে না?

পঞ্চক। একেবারে কিছুই জানি নে, ভুল করবার জায়গাই নেই। নির্ভয়ে চুপ করে থাকব।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাঁকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো।

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যে দিকে হোক এক দিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন— হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপটা হয়ে যাই।

দাদাঠাকুর। তা, তোমার গুরু তোমার উপর যত পুঁথির চাপই চাপান-না কেন, তার নীচের থেকে তোমাকে আস্ত টেনে বের করে আনতে পারব।

পঞ্চক। তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিন্তু দেখো ঠাকুর, একটা কথা

তোমাকে বলি— অচলায়তনের মধ্যে ঐ-যে আমরা দরজা বন্ধ করে আছি, দিব্যি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার মানুষ সেইজন্যে বড়ো নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারো একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারো মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ-যে চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেওয়ালে তিনবার সাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতে হুঁ ফট স্বাহা" এর কারণটা কী— তা হলে কেবলমাত্র চারটেসুপুরি আর এক মাষা সোনা হাতে করে যাও তখনই মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মানো, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাকুর, সেখান থেকে বের করে তুমি আমাকে এই যে জায়গাটাতে এনেছ এখানে কোনো মহাপঞ্চকদাদার টিকি দেখবার জো নেই— বাঁধা জবাব পাই কার কাছে। সব কথারই বারো-আনা বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে মনটাকে উতলা করে দিলে— তার পর ?

দাদাঠাকুর। তার পরে ?

গান

যা হবার তা হবে।
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে।
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই তো ঘরে লবে।

পঞ্চক। এতবড়ো ভরসা তুমি কেমন করে দিচ্ছ ঠাকুর! তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখতে দেবে না, অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যু-ভয়ের জন্যে অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র পড়ছি শত্রুভয়ের জন্যে মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, ঘরের ভয়ের জন্যে গৃহমাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ংকরী, সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়ূরী, বজ্রভয়ের জন্যে বজ্রগান্ধারী, ভূতের ভয়ের জন্যে চণ্ডভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহৃদয়া। এমন আর কত নাম করব।

দাদাঠাকুর। আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েছেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। পাবই বলে সাহস করে বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয় নি।

পঞ্চক। সে কী রকম?

দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখতে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনই বুক ভরে পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হয়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে, 'আলো চাই?' ছেলে বলে, 'তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমনি।'

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে তোমার কাছ অবধি এসেছি, কিন্তু তোমার ঐ বন্ধু পর্যন্ত যেতে সাহস করতে পারছি নে।

দাদাঠাকুর। কেন, তোমার ভয় কিসের?

পঞ্চক। খাঁচায় যে পাখিটার জন্ম, সে আকাশকেই সব চেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তার বুক দুর্ দুর্ করে, ভাবে, 'বন্ধ না থাকলে বাঁচব কী করে'। আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখি নি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর। তোমরা অনেকগুলো তালা লাগিয়ে সিন্ধুক বন্ধ করে রাখাকেই মস্ত লাভ মনে কর— কিন্তু সিন্ধুকে-যে আছে কী তার খোঁজ রাখ না।

পঞ্চক। আমার দাদা বলে, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকে দূর করে ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিসকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই দিনরাত্রি আমরা কেবল দূরই করছি— আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব— সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্ছে না।

দাদাঠাকুর। তোমার দাদা তো ঐ বলে, কিন্তু আমার দাদা বলে, যখন সমস্ত পাই তখনই আসল জিনিসকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারি নে— দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই। আচ্ছা পঞ্চক, তুমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না?

পঞ্চক। আমি জানি যে আমাদের আচার্য জানেন। কোনোদিন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয় নি— তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না, আমিও বলি নে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখলেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন একটা কী ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন। ঠাকুর, যেদিন তোমার সঙ্গে আচার্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর। সেদিন আমারও শুভদিন হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড়ো অস্থির করে তুলেছ। এক-এক সময় ভয় হয় বুঝি কোনোদিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর। আমিই কি স্থির আছি ভাই? আমার মধ্যে ঢেউ উঠেছে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলছি।

পঞ্চক। কিন্তু তবে যে তোমার ঐ শোণপাংশুরা বলে তোমার কাছে তারা খুব শান্তি পায়, কই, শান্তি কোথায়! আমি তো দেখি নে।

দাদাঠাকুর। ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায়?

দাদাঠাকুর। এই পাগল যে পাগলও হয়েছে শান্তিও পেয়েছে। তাই সে কাউকে খ্যাপায়, কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

পঞ্চক। ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন খেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছি নে— তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়— তুমি জোর দাও— তুমি জোর দাও— তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না।

গান

আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে।
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে।
তুমি ডাকো এমনি ডাকে
যেন লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
যাই ধেয়ে যাই ছুটে।
আমি স্বপন দিয়ে বাঁধা,
কেবল ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
মুদিয়ে আঁখিপুটে;

ওগো দিনের পরে দিন
আমার কোথায় হল লীন,
কেবল ভাষাহারা অশ্রুধারায়
পরান কেঁদে উঠে।

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না? তুমি যাঁর কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েছেন?

দাদাঠাকুর। তিনি চোখের জল মোছান, কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চক। কিন্তু দাদা, আমি তোমার ঐ শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি, ওরা চোখের জল ফেলতে শেখে নি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না।

দাদাঠাকুর। যেখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে না সেখানে খাল কেটে জল আনতে হয়। ওদেরও রসের দরকার হবে, তখন দূর থেকে বয়ে আনবে। কিন্তু দেখেছি ওরা বর্ষণ চায় না, তাতে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐ রকমই ওদের স্বভাব।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তো সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েছে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার তো সময় হয়েছে— মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্ছি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে, ভরে যাবে।

গান

দাদাঠাকুর। বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ!
এবার ধর্‌ দেখি তোর গান।
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ওই স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কী আনন্দ যে লাগছে সে আমি বলে উঠতে পারি নে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ডাকো ডাকো, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেলো।

গান

আজ যেমন করে গাইছে আকাশ
তেমনি করে গাও গো।

যেমন করে চাইছে আকাশ
তেমনি করে চাও গো।
আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো।

শুনছ দাদা, ঐ কাঁসর বাজছে।

দাদাঠাকুর। হাঁ বাজছে।

পঞ্চক। আমার আর থাকবার জো নেই।

দাদাঠাকুর। কেন।

পঞ্চক। আজ আমাদের দীপকেতন পূজা।

দাদাঠাকুর। কী করতে হবে।

পঞ্চক। আজ ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তার পরে সেই মাটিতে ছোটো ছোটো মন্দির গড়ে তার উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। এমন হাজারটা গড়ে তবে সূর্যাস্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর। ফল কী হবে।

পঞ্চক। প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে—

পঞ্চক। তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চললুম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানি নে। তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চললুম— এ-ই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে— এ-ই আমার নাগপাশ-বাঁধন আলগা করে দেবে। ঐ আসছে শোণপাংশুর দল— আমরা এখানে বসে আছি দেখে ওদের ভালো লাগছে না, ওরা ছট্‌ফট্ করছে। তোমাকে নিয়ে ওরা হুটোপাটি করতে চায়— করুক, ওরাই ধন্য, ওরা দিনরাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর। হুটোপাটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়। কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। ও কী ভাই পঞ্চক, যাও কোথায়?

পঞ্চক। আমার সময় হয়ে গেছে, আমাকে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। বাঃ, সে কি হয় ? আজ আমাদের বনভোজন, আজ তোমাকে ছাড়ছি নে।

পঞ্চক। না ভাই, সে হবে না— ঐ কাঁসর বাজছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিসের কাঁসর বাজছে ?

পঞ্চক। তোরা বুঝবি নে। আজ দীপকেতন পূজা— আজ ছেলেমানুষি না। আমি চললুম। (কিছুদূর গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

গান

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দে রে দে রে।
যেমন ছাড়া বনের পাখি
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণধারা
যেমন বাঁধনহারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশু। বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তা হলে চলো আমাদের বনভোজনে।

পঞ্চক। বেশ, চলো। (একটু থামিয়া দ্বিধা করিয়া) কিন্তু ভাই, ঐ বন পর্যন্তই যাব, ভোজন পর্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। সে কি হয়! সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের!

পঞ্চক। না রে, তোদের সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আনন্দ চলবে না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন চলবে না ? চালালেই চলবে।

পঞ্চক। চালালেই চলে এমন কোনো জিনিস আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে পারে

না তা জানিস? মারলে চলে না, ঠেললে চলে না, দশটা হাতি জুড়ে দিলে চলে না, আর তুই বলিস কিনা চালালেই চলবে!

তৃতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা ভাই, কাজ কী। তুমি বনেই চলো, আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে হবে না।

পঞ্চক। খুব হবে রে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই— আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব— আনন্দে আজ ক্রিয়াকল্পতরুর ডালে ডালে আগুন লাগিয়ে দেব— পুড়িয়ে সব ছাই করে ফেলব। দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবে না?

দাদাঠাকুর। আমি রোজই খাই।

পঞ্চক। তবে তুমি আমাকে খেতে বলছ না কেন।

দাদাঠাকুর। আমি কাউকে বলি নে ভাই, নিজে বসে যাই।

পঞ্চক। না দাদা, আমার সঙ্গে অমন করলে চলবে না। আমাকে তুমি হুকুম করো, তা হলে আমি বেঁচে যাই। আমি নিজের সঙ্গে কেবলই তর্ক করে মরতে পারি নে।

দাদাঠাকুর। অত সহজে তোমাকে বেঁচে যেতে দেব না পঞ্চক। যেদিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠবে সেইদিন আমি হুকুম করব।

একদল শোণপাংশুর প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম শোণপাংশু। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় শোণপাংশু। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু। আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম শোণপাংশু। কোথায়।

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ, এখনই।

সকলে। ওরে, চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে— ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে। চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার!

দাদাঠাকুর। এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশু। চলো পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই, তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মেরই না, তবু ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে।

পঞ্চক। তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড়ো করে দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর। আয় রে, তবে যাত্রা করি।

৩

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, উপাধ্যায়, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

একটি ছাত্রের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কী হে তৃণাঞ্জন।

তৃণাঞ্জন। আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কী করব, আমাদের আচার্য যে কে তার তো কোনো ঠিক হল না— আমাদের যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হতে বসল এর কী করা যায়!

মহাপঞ্চক। সে তো আমি তোমাদের বলে রেখেছি— এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্ছে, সমস্তই নিষ্ফল হচ্ছে।

উপাধ্যায়। শুধু নিষ্ফল হচ্ছে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে উঠছে।

সঞ্জীব। এ যে বড়ো সর্বনেশে কথা।

জয়োত্তম। কিন্তু আমাদের গুরু আসবার তো দেরি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে।

সঞ্জীব। আরে রাখো তোমার তর্ক। অনিষ্ট হতে সময় লাগে না। মরার পক্ষে এক মুহূর্তই যথেষ্ট।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী।

অধ্যেতা। তোমরা তো আমাকে বলে এলে সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে— কিন্তু বসায় কার সাধ্য।

মহাপঞ্চক। কেন, কী বিঘ্ন ঘটেছে।

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই!

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দন কুণ্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেছি এমন সময় পঞ্চক এসে তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি! স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন, তাই তো সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন। আচার্য অদীনপুণ্য!

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। যে স্নাত তাকে তার ব্রত থেকে ছিন্ন করে আনা! আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক-না।

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাকে না হয়— আপনি বলে দিন-না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী! মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন। কেন পারব না। আপনি যদি আদেশ করেন তা হলেই—

জয়োত্তম। কিন্তু শাস্ত্রে কি এর—

মহাপঞ্চক। শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর ভাবনা কী?

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের

সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর দেরি করেন কেন। এ দিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

জয়োত্তম। দেখো তৃণাঞ্জন, আঁস্তাকুড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্তটা ভরিয়ে দিতে হবে। একটু থামো না।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; তার শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে! অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে! রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই! এবার নিয়ে এসো সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও!

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা— আয় রে নবীন কিশলয়— তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—'আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্'।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কে রে!
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কে রে!

প্রথম জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্ বলছি, থাম্!

গান

পঞ্চক। ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে ; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ্ রে ও ভাই নাচ্ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্ রে—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী! সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর্ লক্ষ্মীছাড়া! ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হোয়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব, পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাঁকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস কজন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন। দেখুন, আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় আজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেইজন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

তৃণাঞ্জন। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হলে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার— আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

তৃণাঞ্জন। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে— তাতে ক্ষতি কী হয়েছে!

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম, কখন জেগে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এসো আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার— আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তা হলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে!

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই— আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে— লোক থাকলে যে পাপ হবে!

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এসো তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ

ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য কোরো না— এসো পঞ্চক, ওকে কোলে করে নিয়ে এসো।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক্‌। তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েছেন— তাঁরও আর দেখা নেই।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্‌।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ঐ-যে শোণপাংশুরা।

মহাপঞ্চক। শোণপাংশুরা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তা হলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে, আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন?

মহাপঞ্চক। শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব তো আমাদের প্রাচীর রক্ষা করছেন।

রাজা। তিনি অনাচারী শোণপাংশুদের কাছে আপন শিখা নত করলেন! নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র-উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্ছে, তোমাদের ক্রিয়াপদ্ধতিতে স্খলন হচ্ছে, নইলে এ যে স্বপ্নের অতীত।

মহাপঞ্চক। আপনি সত্যই অনুমান করেছেন মহারাজ।

সঞ্জীব। একজটা দেবীর শাপ তো আর ব্যর্থ হতে পারে না।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ! কেন তাঁর শাপ।

মহাপঞ্চক। যে উত্তর দিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

তৃণাঞ্জন। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। তবে তো মিথ্যা আমি সৈন্য জড়ো করতে বলে এলুম। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি— শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাহিরে নয়— কী জানি যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। আমার পরামর্শ এই যে, আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ-কয়দিন সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়! তারা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি!

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুটবে। মনে কোরো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব— তারও সেইখানে গতি।

রাজা। দেখো মহাপঞ্চক, তোমার উপরই নির্ভর, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলঙ্ক।

মহাপঞ্চক। কোনো ভয় করবেন না।

৪

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে! বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি। কিন্তু এখনো মনটাকে তার খোলসের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারছি নে কেন!

গান

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেছে রে।
তোরা আমায় বলে দে ভাই বলে দে রে।
ফুলের গোপন পরানমাঝে
নীরব স্বরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই বাঁশিতে কেমনে মন হরেছে রে।
যে মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেছে রে।

দর্ভকদলের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। দাদাঠাকুর!

পঞ্চক। ও কী ও। দাদাঠাকুর বলছিস কাকে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হয়ে গেছে নাকি?

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্যে ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারো ছোঁওয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে, তোরা সকালবেলায় করিস কী বল্ তো। ষড়-ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভকজাত— আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কতপুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি, কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলা পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ! বলিস কী! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তা হলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল? তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল্ তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নামগান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি— তোরা আমাকেও হাসাবি! শুনেও মন খুশি হয়। আমি যে কী মূল্যের মানুষ সে তোরা খবর পাস নি বলে এখনো আমার হাসিকে ভয় করিস। কিছু ভাবিস নে— নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে— গান ধর্।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি!
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা!
ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল!

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আমাদের গান?

পঞ্চক। হাঁ রে হাঁ, ঐ অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই তো আমার পড়াশুনা কিছু হল না, আমার ক্রিয়াকর্ম সমস্ত নিষ্ফল হয়ে গেল! ও ভাই, আর-একটা শোনা— অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না।

দর্ভকদলের গান

আমরা তারেই জানি তারেই জানি সাথের সাথি।
তারেই করি টানাটানি দিবারাতি।
সঙ্গে তারি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি।

তারে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি।
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যাকালে
তাহারি পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি।

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। সার্থক হল আমার নির্বাসন।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো তো এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব। এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব! সে কি হয়!

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই, চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে।

[প্রস্থান

আচার্য। দেখো পঞ্চক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল।

পঞ্চক। আমি তো কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েছি।

আচার্য। যখন এই রকম অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপলিপ্ত মনে করে বসে আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যাবেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধরলে—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায়?
নামবে কি সব বোঝা এবার, ঘুচবে কি সব দায়?

শুনতে শুনতে মনে হল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে গেল। দিনের পর দিন কী ভার বয়েই বেড়িয়েছি! কিন্তু কতই সহজ সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে বসা!

পঞ্চক। আমি দেখছি দর্ভক জাতের একটা গুণ— ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের এমনি

দশা হয়েছে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরোতে চায় না। আচার্যদেব, কেবল ভালো করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে, একবার খুব করে গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু গলা খোলে না যে— রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে প্রভু। এমন হয়েছে আজ কান্না এলেও বেধে যায়।

আচার্য। সেইজন্যেই তো ভাবছি আমাদের গুরু আসবেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে দিন— হাতে করে ধরে সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন।

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ঐ, পঞ্চক, শুনতে পাচ্ছ কি ?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি ?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে ? এ বোধ হয় আর-কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান ? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে— আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম— কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

পঞ্চক। প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে-ঘরে বসালুম সে-ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম— তাঁকে আর দেখতে পাই নে— তবু তিনি সেখানে বসে আছেন।

গান

সকল জনম ভ'রে
ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া !

আছ হৃদয়মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমার সাজে
ও মোর দরদিয়া!
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া!
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা;
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।

উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। একি সুতসোম! আমার কী সৌভাগ্য। কিন্তু তুমি এখানে এলে যে?

উপাচার্য। আর কোথা যাব বলো। তুমি চলে আসামাত্র অচলায়তন যে কী কঠিন হয়ে উঠল, কী শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারি নে। এখন এসো একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য। আমাকে ছুঁয়ো না— কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করি নি।

উপাচার্য। তা হোক, তা হোক। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও। [কোলাকুলি

পঞ্চক। উপাচার্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি আজ এই দর্ভকপাড়ায় সে-সমস্ত ক্ষমা করে নাও।

উপাচার্য। এসো বৎস, এসো। [আলিঙ্গন

আচার্য। সুতসোম, গুরু তো শীঘ্রই আসছেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে এলে কী করে।

উপাচার্য। সেইজন্যেই চলে এলুম। গুরু আসছেন, তুমি নেই! আর মহাপঞ্চক এসে গুরুকে বরণ করে নেবে— এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে হবে! ঐ শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে আনবার যোগ্য এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহর্ষি জলধরগর্জিতঘোষ-সুস্বরনক্ষত্রশঙ্কুসুমিত এসেও বলেন তবু আমি মানতে পারব না।

পঞ্চক। আঃ দেখতে দেখতে কী মেঘ করে এল! শুনছ আচার্যদেব, বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে দিলে যে!

আচার্য। ঐ-যে নেমে এল বৃষ্টি— পৃথিবীর কত দিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি— অরণ্যের কত রাতের স্বপ্ন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক। মিটল এবার মাটির তৃষ্ণা— এই যে কালো মাটি— এই যে সকলের পায়ের নিচেকার মাটি।

ডালিতে কেয়াফুল কদম্বফুল লইয়া বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ

আচার্য। বাবা, তোমাদের এ কী সমারোহ! আজ এ কী কাণ্ড!

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কখনো পাই নে, আজ পেয়েছি।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমরা তো শাস্ত্র কিছুই জানি নে— তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

তৃতীয় দর্ভক। কিন্তু আজ দেবতা কী মনে করে অতিথি হয়ে এই অধমদের ঘরে এসেছেন।

প্রথম দর্ভক। তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে নেব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের মন্ত্র নেই বলে আমরা শুধু কেবল গান গাই।

মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমালবনে আঁধার করে।
ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,

পরানখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার 'পরে।

আচার্য। পঞ্চক, আমাদেরও এমনি করে ডাকতে হবে— বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েছেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও— আর দেরি কোরো না।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে বরণ,
করিব জয় শরমত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে
বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে,
সুখদুঃখ দেব দলে,
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।

সকলে। উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে এলে ঘরে।
চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

পঞ্চক। ঐ আবার বজ্র।

আচার্য। দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।

উপাচার্য। আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে।

৫

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন! কোনো ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছেরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তার জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের মা-বাপ ভাই-বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে পারলে না— দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে। আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁক বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ-যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসবার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা-পাঠের কী করা যায়! ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কতদূর?

উপাধ্যায়। কতদূর কী! এসে পড়েছে যে!

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনো শাঁক বাজালে না।

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে— কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে— ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী! দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার নেই।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক!

তৃণাঞ্জন। আমি তো তখনই বলেছিলুম এ-সব কাজ এই কাঁচাবয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

বিশ্বম্ভর। কিন্তু এখন করা যায় কী?

তৃণাঞ্জন। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা হলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

তৃণাঞ্জন। আমাদেরও তো সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ— ঐ শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের! নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে।

তৃণাঞ্জন। ধরো মহাপঞ্চককে। বাঁধো ওকে। একজটা দেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চলো।

মহাপঞ্চক। সেই কথাই ভালো। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চলো। তাঁর রোষ শান্তি হবে। এমন নিষ্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে, তোরা সব নৃত্য করছিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল!

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চার দিক থেকেই আলো আসছে— সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তা হলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে মজা!

দ্বিতীয় বালক। আজ পঙ্‌ক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা! আঃ আজ চার দিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠেছে বিশ্বম্ভর। এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল্‌ দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি— আমাদের ছুটি।

তৃতীয় বালক। সকাল থেকে পঞ্চকদাদার সেই গানটা কেবলই আমরা গেয়ে বেড়াচ্ছি।

জয়োত্তম। কোন্‌ গান?

প্রথম বালক। সেই যে—

গান

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা।
নাচে আলো নাচে— ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে— ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে;

জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলোর স্রোতে পাল তুলেছে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা— ও ভাই
যায় না মানিক গোনা,
পাতায় পাতায় হাসি— ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেছে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা। [বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই— নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন।

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

তৃণাঞ্জন। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধৃবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

(সকলে স্তম্ভিত)

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে! তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে।

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব।

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না— আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তা হলে প্রণাম করব বৈকি— তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না— আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী— এরা শোণপাংশু।

সকলে। শোণপাংশু!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল!

দাদাঠাকুর। এসো তো, তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও। এদের কর্মকাণ্ড কী রকম তাও ক্রমে দেখতে পাবে।

শোণপাংশুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজি, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চলে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গি।
এই জন্মমরণ-খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়
এই দুঃখসুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দলে
সাগরগিরি লঙ্ঘি।

মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য— আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখন ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এসো আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে!

প্রথম শোণপাংশু। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ— সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত!

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম— যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়? তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই— আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না।

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে।

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে!

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের।

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত। এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ঐ আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ।

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকদের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এসো-না!

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

৬

দর্ভকপল্লী

গান

পঞ্চক। আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাই রে।
আমি আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।
পালে আমার লাগল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাই রে।

সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাই রে।
পাগলামি আজ লাগল পাথায়,
পাখি কি আর থাকবে শাখায় ?
দিকে দিকে সাড়া যে পাই রে।

আচার্যের প্রবেশ

পঞ্চক। দূরে থেকে নানাপ্রকার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আচার্যদেব! অচলায়তনে বোধ হয় খুব সমারোহ চলছে।

আচার্য। সময় তো হয়েছে। কালই তো তাঁর আসবার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। একবার সুতসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক। তিনি আজ একাদশীর তর্পণ করবেন বলে কোথায় ইন্দ্রতৃণ পাওয়া যায় সেই খোঁজে বেরিয়েছেন।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের ?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের ? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে, তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন ?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চার দিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি ?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন! আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন! সে কী রকম হল!

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল্ তো ?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল্ বল্ শুনি, ঠিক বলছিস তো রে ?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, সকলেই তো বলছে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। ওরে কী আনন্দ রে কী আনন্দ!

আচার্য। একি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এ রকম উন্মত্ত হয়ে উঠলে কেন ?

পঞ্চক। প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল কোনো সুযোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তা হলে দেখে নিই কে হারে কে জেতে!

আচার্য। পঞ্চক, তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে। তুমি দাদাঠাকুর বলছ কাকে ?

পঞ্চক। আচার্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েছি। এখন তোমাকে বলব না প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন তা হলে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি— দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর ?

পঞ্চক। হাঁ, লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক! তোমাকে লড়তে কে ডাকছে!

পঞ্চক। আমার প্রাণ ডাকছে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েছে প্রভু। যেন কেবলই স্বপ্ন দেখছি— আর যতই জোর করছি কিছুতেই জাগতে পারছি নে। কেবল এমন বসে বসে হবে না দেব! একেবারে লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাটবে না।

গান

আর নহে আর নয়।
আমি করি নে আর ভয়।
আমার ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন
হল বাঁধন ক্ষয়।
ওই আকাশে ওই ডাকে
আমায় আর কে ধরে রাখে।
আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ
যাব সকলময়।
ওরা বসে বসে মিছে
শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা কী যে গোনে ঘরের কোণে
আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হল গড়া,
আমার বর্ম হল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে
করবে ভুবন জয়।

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব, আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী! গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়!

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাকে একটু শোধন করে নাও— আমরা তফাতে সরে যাই।

আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়— সে এ পাড়ায় আসবে কেন! এ যে আমাদের গোঁসাই!

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি! একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর্‌।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগ্‌গির দুয়ে আনো দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কী! এ যে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাইঠাকুর! প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস নাকি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ঐ তো আমাদের গোঁসাই, পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল্‌ ভাই, আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি। [প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ?

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি— আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর! তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারি দিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌঁছায় নি বলেই মনে করে বসেছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে গড়ে তুলতে হয়। তাই দিনরাত বসে বসে এত ব্যর্থচেষ্টার জাল পাকিয়েছি।

দাদাঠাকুর। তোমার যে কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ। কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না!

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তা হলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি শোণপাংশু না, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর ?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে! আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি ?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে বলছি, আর আমাকে বসিয়ে রাখার কাজে লাগিয়ো না। তোমার ঐ বীরবেশে আমার মন ভুলেছে— তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখি নি।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই পঞ্চক। অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখতে পাবে না। তার দ্বার ফুটো করে দিয়ে আমি তার মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েছি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে থাকবার দিন এখন চিরকালের মতো ঘুচিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। আমি বলছি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পঞ্চক। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, একলা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে ?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে ?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তা হলে এমনি করে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো— আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।

পঞ্চক। শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর। হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বসতে শিখুক।

পঞ্চক। ওদের বসিয়ে রাখা! সর্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে। ওরা যে কেবল ছটফট করাকেই মুক্তি মনে করে।

দাদাঠাকুর। ছোটো ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে ভারি খুশি হয়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেইরকম স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিস বলে জানে— কিন্তু জানে না স্থির হয়ে বসে তার ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে নিতে হয়। কিছুদিনের জন্যে তোমার মহা-পঞ্চকদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ওরা নিজের ভিতরের দিকটাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক। তা হলে আমার মহাপঞ্চকদাদাকে কি ঐখানেই—

দাদাঠাকুর হাঁ ঐখানেই বৈকি। তার ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চলছে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরছিল তা সে দেখতেও পায় নি। এখন আলোতে তার দৃষ্টি খুলে গেছে, সে আর সে-মানুষ নেই। কী করে আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠতে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধাতৃষ্ণা-লোভভয়-জীবনমৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য। আর এই চির-অপরাধীর কী বিধান করলে প্রভু?

দাদাঠাকুর। তোমাকে আর কাজ করতে হবে না আচার্য। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

আচার্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে— আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে আনো। আমি কোনো সম্পদ চাই নে— আমাকে একটু রস দাও।

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য, ভাবনা নেই— আনন্দের বর্ষা নেমে এসেছে— তার ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করছে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখতে পাবে চারি দিক ভেসে যাচ্ছে। ঘরে বসে ভয়ে কাঁপছে কারা। এ ঘনঘোর বর্ষার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জনে আনন্দ। আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় তো উড়ে যাক, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় তো ভিজে যাক— আজ দুর্যোগ একে বলে কে! আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না— আজ একেবারে বড়ো রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু!

দাদাঠাকুর। কী বাবা?

সুভদ্র। আমি যে-পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না!

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে, সে আর কোনোদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব।

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজা-জানলাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

উপাচার্য। (প্রবেশ করিয়া) তৃণ পাওয়া গেল না— কোথাও তৃণ পাওয়া গেল না।

আচার্য। সূতসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে?

উপাচার্য। হাঁ, ইন্দ্রতৃণ, সে তো কোথাও পাওয়া গেল না। হায় হায়! এখন আমি করি কী! এমন জায়গাতেও মানুষ বাস করে!

আচার্য। থাক্ তোমার তৃণ। এ দিকে একবার চেয়ে দেখো।

উপাচার্য। এ কী! এ যে আমাদের গুরু! এখানে! এই দর্ভকদের পাড়ায়! এখন উপায় কী! ওঁকে কোথায়—

দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। গোঁসাই, এই-সব তোমার জন্যে এনেছি। কেতনের মাসি পরশু পিঠে তৈরি করেছিল, তারি কিছু বাকি আছে—

উপাচার্য। আরে আরে, সর্বনাশ করলে রে! করিস কী! উনি যে আমাদের গুরু।

দ্বিতীয় দর্ভক। তোমাদের গুরু আবার কোথায়? এ তো আমাদের গোঁসাই।

দাদাঠাকুর। দে ভাই, আর কিছু এনেছিস?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, জাম এনেছি।

তৃতীয় দর্ভক। কিছু দই এনেছি।

দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ্। এসো ভাই পঞ্চক, এসো আচার্য অদীনপুণ্য—

নতুন আচার্য আর পুরাতন আচার্য এসো, এদের ভক্তির উপর ভাগ করে নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে। গুরু!

দাদাঠাকুর। এসো বাছা, তোমরা এসো।

প্রথম বালক। কখন আমরা বের হব?

দাদাঠাকুর। আর দেরি নেই— এখনই বের হতে হবে।

দ্বিতীয় বালক। এখন কী করব?

দাদাঠাকুর। এই-যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েছে।

প্রথম বালক। ও ভাই, এই-যে জাম— কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। ওরে ভাই, খেজুর— কী মজা।

তৃতীয় বালক। গুরু, এতে কোনো পাপ নেই?

দাদাঠাকুর। কিছু না— পুণ্য আছে।

প্রথম বালক। সকলের সঙ্গে এইখানে বসে খাব?

দাদাঠাকুর। হাঁ এইখানেই।

শোণপাংশুদলের প্রবেশ

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর তো পারি নে। দেয়াল তো একটাও বাকি রাখি নি। এখন কী করব? বসে বসে পা ধরে গেল যে।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই রে। শুধু শুধু বসিয়ে রাখব না। তোদের কাজ দেব।

সকলে। কী কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর। আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে।

সকলে। বেশ, বেশ, রাজি আছি।

দাদাঠাকুর। ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েছে।

সকলে। হাঁ মিলেছে।

দাদাঠাকুর। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার

একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও। মেলো তোমরা দুইদলে, লাগো তোমাদের কাজে।

সকলে। তাই লাগব। পঞ্চকদাদা, তা হলে তোমাকে উঠতে হচ্ছে, অমন করে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকলে চলবে না। ত্বরা করো। আর দেরি না।

পঞ্চক। প্রস্তুত আছি। গুরু তবে প্রণাম করি। আচার্যদেব আশীর্বাদ করো।

ডাকঘর

ডাকঘর

১

মাধব দত্ত। মুশকিলে পড়ে গেছি। যখন ও ছিল না, তখন ছিলই না— কোনো ভাবনাই ছিল না। এখন ও কোথা থেকে এসে আমার ঘর জুড়ে বসল; ও চলে গেলে আমার এ ঘর যেন আর ঘরই থাকবে না। কবিরাজমশায়, আপনি কি মনে করেন ওকে—

কবিরাজ। ওর ভাগ্যে যদি আয়ু থাকে, তা হলে দীর্ঘকাল বাঁচতেও পারে; কিন্তু আয়ুর্বেদে যে-রকম লিখছে তাতে তো—

মাধব দত্ত। বলেন কী!

কবিরাজ। শাস্ত্রে বলছেন, পৈত্তিকান্ সন্নিপাতজান্ কফবাতসমুদ্ভবান্—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনি আর ঐ শ্লোকগুলো আওড়াবেন না— ওতে আরো আমার ভয় বেড়ে যায়। এখন কী করতে হবে সেইটে বলে দিন।

কবিরাজ। (নস্য লইয়া) খুব সাবধানে রাখতে হবে।

মাধব দত্ত। সে তো ঠিক কথা, কিন্তু কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে সেইটে স্থির করে দিয়ে যান।

কবিরাজ। আমি তো পূর্বেই বলেছি, ওকে বাইরে 'একেবারে যেতে দিতে পারবেন না।

মাধব দত্ত। ছেলেমানুষ, ওকে দিনরাত ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যে ভারি শক্ত।

কবিরাজ। তা কী করবেন বলেন। এই শরৎকালের রৌদ্র আর বায়ু দুই-ই ঐ বালকের পক্ষে বিষবৎ— কারণ কিনা শাস্ত্রে বলছে, অপস্মারে জ্বরে কাশে কামলায়াং হলীমকে—

মাধব দত্ত। থাক্ থাক্, আপনার শাস্ত্র থাক্। তা হলে ওকে বন্ধ করেই রেখে দিতে হবে অন্য কোনো উপায় নেই?

কবিরাজ। কিছু না, কারণ, পবনে তপনে চৈব—

মাধব দত্ত। আপনার ও চৈব নিয়ে আমার কী হবে বলেন তো। ও থাক্-না—

কী করতে হবে সেইটে বলে দিন। কিন্তু আপনার ব্যবস্থা বড়ো কঠোর। রোগের সমস্ত দুঃখ ও-বেচারা চুপ করে সহ্য করে— কিন্তু আপনার ওষুধ খাবার সময় ওর কষ্ট দেখে আমার বুক ফেটে যায়।

কবিরাজ। সেই কষ্ট যত প্রবল তার ফলও তত বেশি— তাই তো মহর্ষি চ্যবন বলেছেন, ভেষজং হিতবাক্যঞ্চ তিক্তং আশুফলপ্রদং। আজ তবে উঠি দত্তমশায়!

[প্রস্থান

ঠাকুরদার প্রবেশ

মাধব দত্ত। ঐ রে ঠাকুরদা এসেছে! সর্বনাশ করলে!

ঠাকুরদা। কেন? আমাকে তোমার ভয় কিসের?

মাধব দত্ত। তুমি যে ছেলে খেপাবার সদ্দার।

ঠাকুরদা। তুমি তো ছেলেও নও, তোমার ঘরেও ছেলে নেই— তোমার খেপবার বয়সও গেছে— তোমার ভাবনা কী।

মাধব দত্ত। ঘরে যে ছেলে একটি এনেছি।

ঠাকুরদা। সে কিরকম!

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রী যে পোষ্যপুত্র নেবার জন্তে ক্ষেপে উঠেছিল।

ঠাকুরদা। সে তো অনেকদিন থেকে শুনছি, কিন্তু তুমি যে নিতে চাও না।

মাধব দত্ত। জান তো ভাই, অনেক কষ্টে টাকা করেছি, কোথা থেকে পরের ছেলে এসে আমার বহু পরিশ্রমের ধন বিনা পরিশ্রমে ক্ষয় করতে থাকবে, সে কথা মনে করলেও আমার খারাপ লাগত। কিন্তু এই ছেলেটিকে আমার যে কিরকম লেগে গিয়েছে—

ঠাকুরদা। তাই এর জন্তে টাকা যতই খরচ করছ, ততই মনে করছ, সে যেন টাকার পরম ভাগ্য।

মাধব দত্ত। আগে টাকা রোজগার করতুম, সে কেবল একটা নেশার মতো ছিল— না করে কোনোমতে থাকতে পারতুম না। কিন্তু এখন যা টাকা করছি, সবই ঐ ছেলে পাবে জেনে উপার্জনে ভারি একটা আনন্দ পাচ্ছি।

ঠাকুরদা। বেশ, বেশ ভাই, ছেলেটি কোথায় পেলে বলো দেখি।

মাধব দত্ত। আমার স্ত্রীর গ্রামসম্পর্কে ভাইপো। ছোটোবেলা থেকে বেচারার মা নেই। আবার সেদিন তার বাপও মারা গেছে।

ঠাকুরদা। আহা! তবে তো আমাকে তার দরকার আছে।

মাধব দত্ত। কবিরাজ বলছে তার ঐটুকু শরীরে একসঙ্গে বাত পিত্ত শ্লেষ্মা যে-রকম প্রকুপিত হয়ে উঠেছে, তাতে তার আর বড়ো আশা নেই। এখন একমাত্র উপায় তাকে কোনোরকমে এই শরতের রৌদ্র আর বাতাস থেকে বাঁচিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখা। ছেলেগুলোকে ঘরের বার করাই তোমার এই বুড়োবয়সের খেলা— তাই তোমাকে ভয় করি।

ঠাকুরদা। মিছে বল নি— একেবারে ভয়ানক হয়ে উঠেছি আমি, শরতের রৌদ্র আর হাওয়ারই মতো। কিন্তু ভাই, ঘরে ধরে রাখবার মতো খেলাও আমি কিছু জানি। আমার কাজকর্ম একটু সেরে আসি, তার পরে ঐ ছেলেটির সঙ্গে ভাব করে নেব। [প্রস্থান

অমল গুপ্তের প্রবেশ

অমল। পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। কী অমল?

অমল। আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। ঐ যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ঐ দেখো না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে— ওখানে আমি যেতে পারব না?

মাধব দত্ত। না বাবা!

অমল। আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম তবে বেশ হত। কিন্তু পিসেমশায়, আমাকে কেন বেরোতে দেবে না?

মাধব দত্ত। কবিরাজ যে বলেছে বাইরে গেলে তোমার অসুখ করবে।

অমল। কবিরাজ কেমন করে জানলে?

মাধব দত্ত। বল কী অমল! কবিরাজ জানবে না! সে যে এত বড়ো বড়ো পুঁথি পড়ে ফেলেছে!

অমল। পুঁথি পড়লেই কি সমস্ত জানতে পারে?

মাধব দত্ত। বেশ! তাও বুঝি জান না!

অমল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আমি যে পুঁথি কিছুই পড়ি নি— তাই জানি নে।

মাধব দত্ত। দেখো, বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা সব তোমারই মতো— তারা ঘর থেকে তো বেরোয় না।

অমল। বেরোয় না?

মাধব দত্ত। না, কখন বেরোবে বলো। তারা বসে বসে কেবল পুঁথি পড়ে— আর-কোনো দিকেই তাদের চোখ নেই। অমলবাবু, তুমিও বড়ো হলে পণ্ডিত হবে— বসে বসে এই এত বড়ো বড়ো সব পুঁথি পড়বে— সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

অমল। না না, পিসেমশায়, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমি পণ্ডিত হব না— পিসেমশায়, আমি পণ্ডিত হব না।

মাধব দত্ত। সে কী কথা অমল! যদি পণ্ডিত হতে পারতুম, তা হলে আমি তো বেঁচে যেতুম।

অমল। আমি, যা আছে সব দেখব— কেবলি দেখে বেড়াব।

মাধব দত্ত। শোনো একবার! দেখবে কী? দেখবার এত আছেই বা কী?

অমল। আমাদের জানলার কাছে বসে সেই-যে দূরে পাহাড় দেখা যায়— আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐ পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই।

মাধব দত্ত। কী পাগলের মতো কথা! কাজ নেই কর্ম নেই, খামকা পাহাড়টা পার হয়ে চলে যাই! কী যে বলে তার ঠিক নেই। পাহাড়টা যখন মস্ত বেড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে তখন তো বুঝতে হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়া বারণ— নইলে এত বড়ো বড়ো পাথর জড়ো করে এতবড়ো একটা কাণ্ড করার দরকার কী ছিল!

অমল। পিসেমশায়, তোমার কি মনে হয় ও বারণ করছে? আমার ঠিক বোধ হয় পৃথিবীটা কথা কইতে পারে না, তাই অমনি করে নীল আকাশে হাত তুলে ডাকছে। অনেক দূরের যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে তারাও দুপুরবেলা একলা জানলার ধারে বসে ঐ ডাক শুনতে পায়। পণ্ডিতরা বুঝি শুনতে পায় না?

মাধব দত্ত। তারা তো তোমার মতো খেপা নয় – তারা শুনতে চায়ও না।

অমল। আমার মতো খেপা আমি কালকে একজনকে দেখেছিলুম।

মাধব দত্ত। সত্যি নাকি? কী রকম শুনি।

অমল। তার কাঁধে এক বাঁশের লাঠি। লাঠির আগায় একটা পুঁটুলি বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা ঘটি। পুরানো একজোড়া নাগরাজুতো পরে সে এই মাঠের পথ দিয়ে ঐ পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বললে, কী জানি, যেখানে হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন যাচ্ছ? সে বললে, কাজ খুঁজতে যাচ্ছি। আচ্ছা পিসেমশায়, কাজ কি খুঁজতে হয়?

মাধব দত্ত। হয় বৈকি। কত লোক কাজ খুঁজে বেড়ায়।

অমল। বেশ তো। আমিও তাদের মতো কাজ খুঁজে বেড়াব।

মাধব দত্ত। খুঁজে যদি না পাও।

অমল। খুঁজে যদি না পাই তো আবার খুঁজব। তার পরে সেই নাগরাজুতো-পরা লোকটা চলে গেল— আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। সেই যেখানে ডুমুরগাছের তলা দিয়ে ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে ঝরনার জলে আস্তে আস্তে পা ধুয়ে নিলে— তার পরে পুঁটুলি খুলে ছাতু বের করে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে— পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝরনার ভিতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হয়ে চলে গেল। পিসিমাকে বলে রেখেছি ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে একদিন আমি ছাতু খাব।

মাধব দত্ত। পিসিমা কী বললে?

অমল। পিসিমা বললেন, তুমি ভালো হও, তার পর তোমাকে ঐ ঝরনার ধারে নিয়ে গিয়ে ছাতু খাইয়ে আনব। কবে আমি ভালো হব?

মাধব দত্ত। আর তো দেরি নেই বাবা!

অমল। দেরি নেই? ভালো হলেই কিন্তু আমি চলে যাব।

মাধব দত্ত। কোথায় যাবে?

অমল। কত বাঁকা বাঁকা ঝরনার জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে চলে যাব— দুপুরবেলায় সবাই যখন ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব।

মাধব দত্ত। আচ্ছা বেশ, আগে তুমি ভালো হও, তার পরে তুমি—

অমল। তার পরে আমাকে পণ্ডিত হতে বোলো না পিসেমশায়!

মাধব দত্ত। তুমি কী হতে চাও বলো।

অমল। এখন আমার কিছু মনে পড়ছে না— আচ্ছা আমি ভেবে বলব।

মাধব দত্ত। কিন্তু তুমি অমন করে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা বোলো না।

অমল। বিদেশী লোক আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যেত?

অমল। তা হলে তো সে বেশ হত। কিন্তু আমাকে তো কেউ ধরে নিয়ে যায় না— সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। আমার কাজ আছে আমি চললুম— কিন্তু বাবা দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেয়ো না।

অমল। যাব না। কিন্তু পিসেমশায়, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি বসে থাকব।

২

দইওআলা। দই— দই— ভালো দই!

অমল। দইওআলা, দইওআলা, ও দইওআলা!

দইওআলা। ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল। কেমন করে কিনব! আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?

অমল। আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওআলা। আমার সঙ্গে!

অমল। হাঁ। তুমি যে কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওআলা। (দধির বাঁক নামাইয়া) বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে, তাই আমি সারাদিন এইখেনেই বসে থাকি।

দইওআলা। আহা, বাছা তোমার কী হয়েছে?

অমল। আমি জানি নে। আমি তো কিচ্ছু পড়ি নি, তাই আমি জানি নে আমার কী হয়েছে। দইওআলা, তুমি কোথা থেকে আসছ?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম থেকে আসছি।

অমল। তোমাদের গ্রাম? অনে—ক দূরে তোমাদের গ্রাম?

দইওআলা। আমাদের গ্রাম সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়। শামলী নদীর ধারে।

অমল। পাঁচমুড়া পাহাড়— শামলী নদী— কী জানি, হয়তো তোমাদের গ্রাম দেখেছি— কবে সে আমার মনে পড়ে না।

দইওআলা। তুমি দেখেছ? পাহাড়তলায় কোনোদিন গিয়েছিলে নাকি?

অমল। না, কোনোদিন যাই নি। কিন্তু আমার মনে হয় যেন আমি দেখেছি।

অনেক পুরোনোকালের খুব বড়ো বড়ো গাছের তলায় তোমাদের গ্রাম— একটি লাল রঙের রাস্তার ধারে। না?

দইওআলা। ঠিক বলেছ বাবা।

অমল। সেখানে পাহাড়ের গায়ে সব গোরু চরে বেড়াচ্ছে।

দইওআলা। কী আশ্চর্য! ঠিক বলছ। আমাদের গ্রামে গোরু চরে বৈকি, খুব চরে।

অমল। মেয়েরা সব নদী থেকে জল তুলে মাথায় কলসী করে নিয়ে যায়— তাদের লাল শাড়ি পরা।

দইওআলা। বা! বা! ঠিক কথা। আমাদের সব গয়লাপাড়ার মেয়েরা নদী থেকে জল তুলে তো নিয়ে যায়ই। তবে কিনা তারা সবাই যে লাল শাড়ি পরে তা নয়— কিন্তু বাবা, তুমি নিশ্চয় কোনোদিন সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলে!

অমল। সত্যি বলছি দইওআলা, আমি একদিনও যাই নি। কবিরাজ যেদিন আমাকে বাইরে যেতে বলবে সেদিন তুমি নিয়ে যাবে তোমাদের গ্রামে?

দইওআলা। যাব বৈকি বাবা, খুব নিয়ে যাব!

অমল। আমাকে তোমার মতো ঐ রকম দই বেচতে শিখিয়ে দিয়ো। ঐ রকম বাঁক কাঁধে নিয়ে— ঐ রকম খুব দূরের রাস্তা দিয়ে।

দইওআলা। মরে যাই! দই বেচতে যাবে কেন বাবা। এত এত পুঁথি পড়ে তুমি পণ্ডিত হয়ে উঠবে।

অমল। না, না, আমি কক্‌খনো পণ্ডিত হব না। আমি তোমাদের রাঙা রাস্তার ধারে তোমাদের বুড়ো বটের তলায় গোয়ালপাড়া থেকে দই নিয়ে এসে দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে বেচে বেচে বেড়াব। কী রকম করে তুমি বল, দই, দই, দই— ভালো দই। আমাকে সুরটা শিখিয়ে দাও।

দইওআলা। হায় পোড়াকপাল! এ সুরও কি শেখবার সুর!

অমল। না, না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়— তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে ঐ গাছের সারির মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল, আমার মনে হচ্ছিল— কী জানি কী মনে হচ্ছিল!

দইওআলা। বাবা, এক ভাঁড় দই তুমি খাও।

অমল। আমার তো পয়সা নেই।

দইওআলা। না না না না—পয়সার কথা বোলো না। তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব।

অমল। তোমার কি অনেক দেরি হয়ে গেল?

দইওআলা। কিছু দেরি হয় নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয় নি। দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম। [প্রস্থান

অমল। (সুর করিয়া) দই, দই, দই, ভালো দই! সেই পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায় শামলী নদীর ধারে গয়লাদের বাড়ির দই। তারা ভোরের বেলায় গাছের তলায় গোরু দাঁড় করিয়ে দুধ দোয়, সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা দই পাতে, সেই দই। দই, দই, দই—ই, ভালো দই! এই-যে রাস্তায় প্রহরী পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

প্রহরী, প্রহরী, একটিবার শুনে যাও-না প্রহরী!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। অমন করে ডাকাডাকি করছ কেন? আমাকে ভয় কর না তুমি?

অমল। কেন, তোমাকে কেন ভয় করব?

প্রহরী। যদি তোমাকে ধরে নিয়ে যাই।

অমল। কোথায় ধরে নিয়ে যাবে? অনেক দূরে? ঐ পাহাড় পেরিয়ে?

প্রহরী। একেবারে রাজার কাছে যদি নিয়ে যাই।

অমল। রাজার কাছে? নিয়ে যাও না আমাকে! কিন্তু আমাকে যে কবিরাজ বাইরে যেতে বারণ করেছে। আমাকে কেউ কোত্থাও ধরে নিয়ে যেতে পারবে না— আমাকে কেবল দিনরাত্রি এখানেই বসে থাকতে হবে।

প্রহরী। কবিরাজ বারণ করেছে? আহা, তাই বটে— তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোমার হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্ছে।

অমল। তুমি ঘণ্টা বাজাবে না প্রহরী?

প্রহরী। এখনো সময় হয় নি।

অমল। কেউ বলে 'সময় বয়ে যাচ্ছে', কেউ বলে 'সময় হয় নি'। আচ্ছা, তুমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেই তো সময় হবে?

প্রহরী। সে কি হয়! সময় হলে তবে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিই।

অমল। বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা— আমার শুনতে ভারি ভালো লাগে— দুপুরবেলা আমাদের বাড়িতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায়— পিসেমশায় কোথায় কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিমা রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের খুদে কুকুরটা উঠোনের ঐ কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমোতে থাকে— তখন তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে— ঢং ঢং ঢং, ঢং ঢং ঢং। তোমার ঘণ্টা কেন বাজে?

প্রহরী। ঘণ্টা এই কথা সবাইকে বলে, সময় বসে নেই, সময় কেবলই চলে যাচ্ছে।

অমল। কোথায় চলে যাচ্ছে? কোন্ দেশে?

প্রহরী। সে কথা কেউ জানে না।

অমল। সে দেশ বুঝি কেউ দেখে আসে নি? আমার ভারি ইচ্ছে করছে ঐ সময়ের সঙ্গে চলে যাই— যে দেশের কথা কেউ জানে না সেই অনেক দূরে।

প্রহরী। সে দেশে সবাইকে যেতে হবে বাবা!

অমল। আমাকেও যেতে হবে?

প্রহরী। হবে বৈকি!

অমল। কিন্তু কবিরাজ যে আমাকে বাইরে যেতে বারণ করেছে।

প্রহরী। কোন্‌দিন কবিরাজই হয়তো স্বয়ং হাতে ধরে নিয়ে যাবেন!

অমল। না না, তুমি তাকে জান না, সে কেবলই ধরে রেখে দেয়।

প্রহরী। তার চেয়ে ভালো কবিরাজ যিনি আছেন, তিনি এসে ছেড়ে দিয়ে যান।

অমল। আমার সেই ভালো কবিরাজ কবে আসবেন? আমার যে আর বসে থাকতে ভালো লাগছে না।

প্রহরী। অমন কথা বলতে নেই বাবা!

অমল। না— আমি তো বসেই আছি— যেখানে আমাকে বসিয়ে রেখেছে সেখান থেকে আমি তো বেরোই নে— কিন্তু তোমার ঐ ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আর আমার মন-কেমন করে। আচ্ছা প্রহরী!

প্রহরী। কী বাবা?

অমল। আচ্ছা, ঐ-যে রাস্তার ওপারের বড়ো বাড়িতে নিশেন উড়িয়ে দিয়েছে, আর ওখানে সব লোকজন কেবলই আসছে যাচ্ছে— ওখানে কী হয়েছে?

প্রহরী। ওখানে নতুন ডাকঘর বসেছে।

অমল। ডাকঘর? কার ডাকঘর?

প্রহরী। ডাকঘর আর কার হবে? রাজার ডাকঘর।— এ ছেলেটি ভারি মজার।

অমল। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে সব চিঠি আসে?

প্রহরী। আসে বৈকি। দেখো একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে।

অমল। আমার নামেও চিঠি আসবে? আমি যে ছেলেমানুষ।

প্রহরী। ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকুটুকু ছোট্ট ছোট্ট চিঠি লেখেন।

অমল। বেশ হবে। আমি কবে চিঠি পাব? আমাকেও তিনি চিঠি লিখবেন তুমি কেমন করে জানলে?

প্রহরী। তা নইলে তিনি ঠিক তোমার এই খোলা জানলাটার সামনেই অতবড়ো একটা সোনালি রঙের নিশেন উড়িয়ে ডাকঘর খুলতে যাবেন কেন?— ছেলেটাকে আমার বেশ লাগছে।

অমল। আচ্ছা, রাজার কাছ থেকে আমার চিঠি এলে আমাকে কে এনে দেবে?

প্রহরী। রাজার যে অনেক ডাক-হরকরা আছে— দেখ নি বুকে গোল গোল সোনার তকমা প'রে তারা ঘুরে বেড়ায়।

অমল। আচ্ছা, কোথায় তারা ঘোরে?

প্রহরী। ঘরে ঘরে, দেশে দেশে।— এর প্রশ্ন শুনলে হাসি পায়।

অমল। বড়ো হলে আমি রাজার ডাক-হরকরা হব।

প্রহরী। হা হা হা হা! ডাক-হরকরা! সে ভারি মস্ত কাজ! রোদ নেই বৃষ্টি নেই, গরিব নেই বড়োমানুষ নেই, সকলের ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করে বেড়ানো— সে খুব জবর কাজ!

অমল। তুমি হাসছ কেন! আমার ঐ কাজটাই সকলের চেয়ে ভালো লাগছে। না না তোমার কাজও খুব ভালো— দুপুরবেলা যখন রোদ্দুর ঝাঁঝাঁ করে, তখন ঘণ্টা বাজে ঢং ঢং ঢং— আবার এক-এক দিন রাত্রে হঠাৎ বিছানায় জেগে উঠে দেখি ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, বাইরের কোন্ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং।

প্রহরী। ঐ যে মোড়ল আসছে— আমি এবার পালাই। ও যদি দেখতে পায় তোমার সঙ্গে গল্প করছি, তা হলেই মুশকিল বাধাবে।

অমল। কই মোড়ল, কই, কই?

প্রহরী। ঐ যে, অনেক দূরে। মাথায় একটা মস্ত গোলপাতার ছাতি।

অমল। ওকে বুঝি রাজা মোড়ল করে দিয়েছে?

প্রহরী। আরে না। ও আপনি মোড়লি করে। যে ওকে না মানতে চায় ও তার সঙ্গে দিনরাত এমনি লাগে যে ওকে সকলেই ভয় করে। কেবল সকলের সঙ্গে শত্রুতা করেই ও আপনার ব্যাবসা চালায়। আজ তবে যাই, আমার কাজ কামাই যাচ্ছে। আমি আবার কাল সকালে এসে তোমাকে সমস্ত শহরের খবর শুনিয়ে যাব। [প্রস্থান

অমল। রাজার কাছ থেকে রোজ একটা করে চিঠি যদি পাই তা হলে বেশ হয়— এই জানলার কাছে বসে বসে পড়ি। কিন্তু আমি তো পড়তে পারি নে! কে পড়ে দেবে? পিসিমা তো রামায়ণ পড়ে। পিসিমা কি রাজার লেখা পড়তে পারে? কেউ যদি পড়তে না পারে জমিয়ে রেখে দেব, আমি বড়ো হলে পড়ব। কিন্তু ডাক-হরকরা যদি আমাকে না চেনে! মোড়লমশায়, ও মোড়লমশায়— একটা কথা শুনে যাও।

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। কে রে! রাস্তার মধ্যে আমাকে ডাকাডাকি করে! কোথাকার বাঁদর এটা!

অমল। তুমি মোড়লমশায়, তোমাকে তো সবাই মানে।

মোড়ল। (খুশি হইয়া) হাঁ, হাঁ, মানে বৈকি। খুব মানে।

অমল। রাজার ডাক-হরকরা তোমার কথা শোনে?

মোড়ল। না শুনে তার প্রাণ বাঁচে? বাস্‌ রে, সাধ্য কী!

অমল। তুমি ডাক-হরকরাকে বলে দেবে আমারই নাম অমল— আমি এই জানলার কাছটাতে বসে থাকি।

মোড়ল। কেন বলো দেখি।

অমল। আমার নামে যদি চিঠি আসে—

মোড়ল। তোমার নামে চিঠি! তোমাকে কে চিঠি লিখবে?

অমল। রাজা যদি চিঠি লেখে তা হলে—

মোড়ল। হা হা হা হা! এ ছেলেটা তো কম নয়। হা হা হা হা! রাজা তোমাকে চিঠি লিখবে! তা লিখবে বৈকি! তুমি যে তাঁর পরম বন্ধু! কদিন তোমার সঙ্গে দেখা না হয়ে রাজা শুকিয়ে যাচ্ছে, খবর পেয়েছি। আর বেশি দেরি নেই, চিঠি হয়তো আজই আসে কি কালই আসে।

অমল। মোড়লমশায়, তুমি অমন করে কথা কচ্ছ কেন! তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?

মোড়ল। বাস্‌ রে। তোমার উপর রাগ করব! এত সাহস আমার! রাজার সঙ্গে তোমার চিঠি চলে!— মাধব দত্তের বড়ো বাড় হয়েছে দেখছি। দু-পয়সা জমিয়েছে কিনা, এখন তার ঘরে রাজা-বাদশার কথা ছাড়া আর কথা নেই। রোসো-না ওকে মজা দেখাচ্ছি। ওরে ছোঁড়া, বেশ, শীঘ্রই যাতে রাজার চিঠি তোদের বাড়িতে আসে, আমি তার বন্দোবস্ত করছি।

অমল। না, না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।

মোড়ল। কেন রে? তোর খবর আমি রাজাকে জানিয়ে দেব— তিনি তা হলে আর দেরি করতে পারবেন না— তোমাদের খবর নেওয়ার জন্যে এখনই পাইক পাঠিয়ে দেবেন!— না, মাধব দত্তর ভারি আস্পর্ধা— রাজার কানে একবার উঠলে দুরস্ত হয়ে যাবে। [প্রস্থান

অমল। কে তুমি মল ঝম্‌ ঝম্‌ করতে করতে চলেছ— একটু দাঁড়াও-না ভাই।

বালিকার প্রবেশ

বালিকা। আমার কি দাঁড়াবার জো আছে! বেলা বয়ে যায় যে।

অমল। তোমার দাঁড়াতে ইচ্ছা করছে না— আমারও এখানে আর বসে থাকতে ইচ্ছা করে না।

বালিকা। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যেন সকালবেলাকার তারা— তোমার কী হয়েছে বলো তো।

অমল। জানি নে কী হয়েছে, কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে।

বালিকা। আহা, তবে বেরিয়ো না— কবিরাজের কথা মেনে চলতে হয়— দুরন্তপনা করতে নেই, তা হলে লোকে দুষ্টু বলবে। বাইরের দিকে তাকিয়ে তোমার মন ছটফট করছে, আমি বরঞ্চ তোমার এই আধখানা দরজা বন্ধ করে দিই।

অমল। না, না, বন্ধ কোরো না— এখানে আমার আর-সব বন্ধ কেবল এইটুকু খোলা। তুমি কে বলো-না— আমি তো তোমাকে চিনি নে!

বালিকা। আমি সুধা।

অমল। সুধা?

সুধা। জান না? আমি এখানকার মালিনীর মেয়ে।

অমল। তুমি কী কর?

সুধা। সাজি ভরে ফুল তুলে নিয়ে এসে মালা গাঁথি। এখন ফুল তুলতে চলেছি।

অমল। ফুল তুলতে চলেছ? তাই তোমার পা দুটি অমন খুশি হয়ে উঠেছে— যতই চলেছ, মল বাজছে ঝম্ ঝম্ ঝম্। আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারতুম, তা হলে উঁচু ডালে যেখানে দেখা যায় না সেইখান থেকে আমি তোমাকে ফুল পেড়ে দিতুম।

সুধা। তাই বৈকি! ফুলের খবর আমার চেয়ে তুমি নাকি বেশি জান!

অমল। জানি, আমি খুব জানি। আমি সাত ভাই চম্পার খবর জানি। আমার মনে হয় আমাকে যদি সবাই ছেড়ে দেয় তা হলে আমি চলে যেতে পারি খুব ঘন বনের মধ্যে যেখানে রাস্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। সরু ডালের সব-আগায় যেখানে মনুয়া পাখি বসে বসে দোলা খায় সেইখানে আমি চাঁপা হয়ে ফুটতে পারি। তুমি আমার পারুলদিদি হবে?

সুধা। কী বুদ্ধি তোমার! পারুলদিদি আমি কী করে হব! আমি যে সুধা— আমি শশী মালিনীর মেয়ে। আমাকে রোজ এত এত মালা গাঁথতে হয়। আমি যদি তোমার মতো এইখানে বসে থাকতে পারতুম তা হলে কেমন মজা হত!

অমল। তা হলে সমস্ত দিন কী করতে?

সুধা। আমার বেনে-বউ পুতুল আছে, তার বিয়ে দিতুম। আমার পুষি মেনি আছে, তাকে নিয়ে— যাই, বেলা বয়ে যাচ্ছে, দেরি হলে ফুল আর থাকবে না।

অমল। আমার সঙ্গে আর-একটু গল্প করো-না, আমার খুব ভালো লাগছে।

সুধা। আচ্ছা বেশ, তুমি দুষ্টুমি কোরো না, লক্ষ্মী ছেলে হয়ে এইখানে স্থির হয়ে বসে থাকো, আমি ফুল তুলে ফেরবার পথে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

অমল। আর আমাকে একটি ফুল দিয়ে যাবে?

সুধা। ফুল অমনি কেমন করে দেব? দাম দিতে হবে যে।

অমল। আমি যখন বড়ো হব তখন তোমাকে দাম দেব। আমি কাজ খুঁজতে চলে যাব ঐ ঝরনা পার হয়ে, তখন তোমাকে দাম দিয়ে যাব।

সুধা। আচ্ছা বেশ।

অমল। তুমি তা হলে ফুল তুলে আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আসবে?

সুধা। আসব।

অমল। আমাকে ভুলে যাবে না? আমার নাম অমল। মনে থাকবে তোমার?

সুধা। না, ভুলব না। দেখো, মনে থাকবে। [প্রস্থান

ছেলের দলের প্রবেশ

অমল। ভাই, তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ ভাই? একবার একটুখানি এইখানে দাঁড়াও-না।

ছেলেরা। আমরা খেলতে চলেছি।

অমল। কী খেলবে তোমরা ভাই?

ছেলেরা। আমরা চাষ-খেলা খেলব।

প্রথম। (লাঠি দেখাইয়া) এই যে আমাদের লাঙল।

দ্বিতীয়। আমরা দুজনে দুই গোরু হব।

অমল। সমস্ত দিন খেলবে?

ছেলেরা। হাঁ, সমস্ত দি—ন।

অমল। তার পরে সন্ধ্যার সময় নদীর ধার দিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে?

ছেলেরা। হাঁ, সন্ধ্যার সময় ফিরব।

অমল। আমার এই ঘরের সামনে দিয়েই ফিরো ভাই।

ছেলেরা। তুমি বেরিয়ে এসো-না, খেলবে চলো।

অমল। কবিরাজ আমাকে বেরিয়ে যেতে মানা করেছে।

ছেলেরা। কবিরাজ! কবিরাজের মানা তুমি শোন বুঝি! চল্‌ ভাই চল্‌ আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

অমল। না ভাই, তোমরা আমার এই জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু খেলা করো— আমি একটু দেখি।

ছেলেরা। এখেনে কী নিয়ে খেলব ?

অমল। এই যে আমার সব খেলনা পড়ে রয়েছে— এ-সব তোমরাই নাও ভাই— ঘরের ভিতরে একলা খেলতে ভালো লাগে না— এ-সব ধুলোয় ছড়ানো পড়েই থাকে— এ আমার কোনো কাজে লাগে না।

ছেলেরা। বা, বা, বা, কী চমৎকার খেলনা! এ যে জাহাজ! এ যে জটাইবুড়ি! দেখছিস ভাই ? কেমন সুন্দর সেপাই!— এ-সব তুমি আমাদের দিয়ে দিলে ? তোমার কষ্ট হচ্ছে না ?

অমল। না, কিছু কষ্ট হচ্ছে না, সব তোমাদের দিলুম।

ছেলেরা। আর কিন্তু ফিরিয়ে দেব না।

অমল। না, ফিরিয়ে দিতে হবে না।

ছেলেরা। কেউ তো বকবে না ?

অমল। কেউ না, কেউ না। কিন্তু রোজ সকালে তোমরা এই খেলনাগুলো নিয়ে আমার এই দরজার সামনে খানিকক্ষণ ধরে খেলো। আবার এগুলো যখন পুরোনো হয়ে যাবে আমি নতুন খেলনা আনিয়ে দেব।

ছেলেরা। বেশ ভাই, আমরা রোজ এখানে খেলে যাব। ও ভাই, সেপাইগুলোকে এখানে সব সাজা— আমরা লড়াই-লড়াই খেলি। বন্দুক কোথায় পাই ? ঐ-যে একটা মস্ত শরকাঠি পড়ে আছে— ঐটেকে ভেঙে ভেঙে নিয়ে আমরা বন্দুক বানাই। কিন্তু ভাই তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ!

অমল। হাঁ, আমার ভারি ঘুম পেয়ে আসছে। জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে— আমার পিঠ ব্যথা করছে।

ছেলেরা। এখন যে সবে এক প্রহর বেলা— এখনই তোমার ঘুম পায় কেন ? ঐ শোনো এক প্রহরের ঘণ্টা বাজছে।

অমল। হাঁ, ঐ যে বাজছে ঢং ঢং ঢং— আমাকে ঘুমোতে যেতে ডাকছে।

ছেলেরা। তবে আমরা এখন যাই, আবার কাল সকালে আসব।

অমল। যাবার আগে তোমাদের একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি ভাই। তোমরা তো বাইরে থাক, তোমরা ঐ রাজার ডাকঘরের ডাক-হরকরাদের চেন?

ছেলেরা। হাঁ চিনি বৈকি, খুব চিনি।

অমল। কে তারা, নাম কী?

ছেলেরা। একজন আছে বাদল হরকরা, একজন আছে শরৎ— আরো কত আছে।

অমল। আচ্ছা, আমার নামে যদি চিঠি আসে তারা কি আমাকে চিনতে পারবে?

ছেলেরা। কেন পারবে না? চিঠিতে তোমার নাম থাকলেই তারা তোমাকে ঠিক চিনে নেবে।

অমল। কাল সকালে যখন আসবে তাদের একজনকে ডেকে এনে আমাকে চিনিয়ে দিয়ো-না।

ছেলেরা। আচ্ছা দেব।

৩

অমল শয্যাগত

অমল। পিসেমশায়, আজ আর আমার সেই জানলার কাছেও যেতে পারব না? কবিরাজ বারণ করেছে?

মাধব দত্ত। হাঁ বাবা। সেখানে রোজ রোজ বসে থেকেই তো তোমার ব্যামো বেড়ে গেছে।

অমল। না পিসেমশায়, না— আমার ব্যামোর কথা আমি কিছুই জানি নে কিন্তু সেখানে থাকলে আমি খুব ভালো থাকি।

মাধব দত্ত। সেখানে বসে বসে তুমি এই শহরের যত রাজ্যের ছেলেবুড়ো সকলের সঙ্গেই ভাব করে নিয়েছ— আমার দরজার কাছে রোজ যেন একটা মস্ত মেলা বসে যায়— এতেও কি কখনো শরীর টেঁকে! দেখো দেখি, আজ তোমার মুখখানা কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

অমল। পিসেমশায়, আমার সেই ফকির হয়তো আজ আমাকে জানলার কাছে না দেখতে পেয়ে চলে যাবে।

মাধব দত্ত। তোমার আবার ফকির কে?

অমল। সেই যে রোজ আমার কাছে এসে নানা দেশবিদেশের কথা বলে যায়— শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে।

মাধব দত্ত। কই আমি তো কোনো ফকিরকে জানি নে।

অমল। এই ঠিক তার আসবার সময় হয়েছে— তোমার পায়ে পড়ি, তুমি তাকে একবার বলে এসো-না, সে যেন আমার ঘরে এসে একবার বসে।

ফকিরবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

অমল। এই-যে, এই-যে ফকির— এসো আমার বিছানায় এসে বসো।

মাধব দত্ত। এ কী। এ যে—

ঠাকুরদা। (চোখ ঠারিয়া) আমি ফকির।

মাধব দত্ত। তুমি যে কী নও তা তো ভেবে পাই নে!

অমল। এবারে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ফকির ?

ফকির। আমি ক্রৌঞ্চদ্বীপে গিয়েছিলুম— সেইখান থেকেই এইমাত্র আসছি।

মাধব দত্ত। ক্রৌঞ্চদ্বীপে ?

ফকির। এতে আশ্চর্য হও কেন ? তোমাদের মতো আমাকে পেয়েছ ? আমার তো যেতে কোনো খরচ নেই। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।

অমল। (হাততালি দিয়া) তোমার ভারি মজা। আমি যখন ভালো হব তখন তুমি আমাকে চেলা করে নেবে বলেছিলে, মনে আছে ফকির ?

ঠাকুরদা। খুব মনে আছে। বেড়াবার এমন সব মন্ত্র শিখিয়ে দেব যে সমুদ্রে পাহাড়ে অরণ্যে কোথাও কিছুতে বাধা দিতে পারবে না।

মাধব দত্ত। এ-সব কী পাগলের মতো কথা হচ্ছে তোমাদের!

ঠাকুরদা। বাবা অমল, পাহাড়-পর্বত-সমুদ্রকে ভয় করি নে— কিন্তু তোমার এই পিসেটির সঙ্গে যদি আবার কবিরাজ এসে জোটেন তা হলে আমার মন্ত্রকে হার মানতে হবে।

অমল। না, না, পিসেমশায়, তুমি কবিরাজকে কিছু বোলো না।— এখন আমি এইখানেই শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করব না— কিন্তু যেদিন আমি ভালো হব সেইদিনই আমি ফকিরের মন্ত্র নিয়ে চলে যাব— নদী-পাহাড়-সমুদ্রে আমাকে আর ধরে রাখতে পারবে না।

মাধব দত্ত। ছি, বাবা, কেবলই অমন যাই-যাই করতে নেই— শুনলে আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়।

অমল। ক্রৌঞ্চদ্বীপ কিরকম দ্বীপ আমাকে বলো-না ফকির!

ঠাকুরদা। সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ— সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায় আর ওড়ে।

অমল। বাঃ, কী চমৎকার! সমুদ্রের ধারে?

ঠাকুরদা। সমুদ্রের ধারে বৈকি।

অমল। সব নীল রঙের পাহাড় আছে?

ঠাকুরদা। নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে— সেই আকাশের রঙে পাখির রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কাণ্ড হয়ে ওঠে।

অমল। পাহাড়ে ঝরনা আছে?

ঠাকুরদা। বিলক্ষণ! ঝরনা না থাকলে কি চলে! একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর, তার কী নৃত্য! নুড়িগুলোকে ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তা হলে ঐ ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

অমল। আমি যদি পাখি হতুম তা হলে—

ঠাকুরদা। তা হলে একটা ভারি মুশকিল হত। শুনলুম, তুমি নাকি দইওআলাকে বলে রেখেছ বড়ো হলে তুমি দই বিক্রি করবে— পাখিদের মধ্যে তোমার দইয়ের ব্যাবসাটা তেমন বেশ জমত না। বোধ হয় ওতে তোমার কিছু লোকসানই হত।

মাধব দত্ত। আর তো আমার চলল না। আমাকে সুদ্ধ তোমরা খেপিয়ে দেবে দেখছি। আমি চললুম।

অমল। পিসেমশায়, আমার দইওআলা এসে চলে গেছে?

মাধব দত্ত। গেছে বৈকি। তোমার ঐ শখের ফকিরের তলপি বয়ে ক্রৌঞ্চ-দ্বীপের পাখির বাসায় উড়ে বেড়ালে তার তো পেট চলে না। সে তোমার জন্য এক ভাঁড় দই রেখে গেছে। বলে গেছে, তাদের গ্রামে তার বোনঝির বিয়ে— তাই সে কলমিপাড়ায় বাঁশির ফরমাশ দিতে যাচ্ছে— তাই বড়ো ব্যস্ত আছে।

অমল। সে যে বলেছিল, আমার সঙ্গে তার ছোটো বোনঝিটির বিয়ে দেবে।

ঠাকুরদা। তবে তো বড়ো মুশকিল দেখছি।

অমল। বলেছিল, সে আমার টুকটুকে বউ হবে— তার নাকে নোলক, তার লাল ডুরে শাড়ি। সে সকালবেলা নিজের হাতে কালো গোরু দুইয়ে নতুন মাটির ভাঁড়ে আমাকে ফেনাসুদ্ধ দুধ খাওয়াবে, আর সন্ধের সময় গোয়ালঘরে প্রদীপ দেখিয়ে এসে আমার কাছে বসে সাত ভাই চম্পার গল্প করবে।

ঠাকুরদা। বা, বা, খাসা বউ তো! আমি যে ফকির মানুষ আমারই লোভ হয়। তা বাবা, ভয় নেই, এবারকার মতো বিয়ে দিক-না, আমি তোমাকে বলছি, তোমার দরকার হলে কোনোদিন ওর ঘরে বোনঝির অভাব হবে না।

মাধব দত্ত। যাও, যাও। আর তো পারা যায় না। [প্রস্থান

অমল। ফকির, পিসেমশাই তো গিয়েছেন— এইবার আমাকে চুপিচুপি বলো-না ডাকঘরে কি আমার নামে রাজার চিঠি এসেছে।

ঠাকুরদা। শুনেছি তো তাঁর চিঠি রওনা হয়ে বেরিয়েছে। সে-চিঠি এখন পথে আছে।

অমল। পথে? কোন্ পথে! সেই যে বৃষ্টি হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে অনেক দূরে দেখা যায়, সেই ঘন বনের পথে?

ঠাকুরদা। তবে তো তুমি সব জান দেখছি, সেই পথেই তো।

অমল। আমি সব জানি ফকির!

ঠাকুরদা। তাই তো দেখতে পাচ্ছি— কেমন করে জানলে?

অমল। তা আমি জানি নে। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই— মনে হয় যেন আমি অনেকবার দেখেছি— সে অনেকদিন আগে— কতদিন তা মনে পড়ে না। বলব? আমি দেখতে পাচ্ছি, রাজার ডাক-হরকরা পাহাড়ের উপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে— বাঁ হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি। কত দিন কত রাত ধরে সে কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝরনার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেখানে বাঁকা নদীর পথ ধরে সে কেবলই চলে আসছে— নদীর ধারে জোয়ারির খেত, তারই সরু গলির ভিতর দিয়ে দিয়ে সে কেবল আসছে— তার পরে আখের খেত— সেই আখের খেতের পাশ দিয়ে উঁচু আল চলে গিয়েছে, সেই আলের উপর দিয়ে সে কেবলই চলে আসছে— রাতদিন একলাটি চলে আসছে; খেতের মধ্যে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে— নদীর ধারে একটিও মানুষ নেই, কেবল কাদা-খোঁচা লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়াচ্ছে— আমি সমস্ত দেখতে পাচ্ছি। যতই সে আসছে দেখছি, আমার বুকের ভিতরে ভারি খুশি হয়ে হয়ে উঠছে।

ঠাকুরদা। অমন নবীন চোখ তো আমার নেই তবু তোমার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখতে পাচ্ছি।

অমল। আচ্ছা ফকির, যাঁর ডাকঘর তুমি সেই রাজাকে জান?

ঠাকুরদা। জানি বৈকি। আমি যে তাঁর কাছে রোজ ভিক্ষা নিতে যাই।

অমল। সে তো বেশ! আমি ভালো হয়ে উঠলে আমিও তাঁর কাছে ভিক্ষা নিতে যাব। পারব না যেতে?

ঠাকুরদা। বাবা, তোমার আর ভিক্ষার দরকার হবে না, তিনি তোমাকে যা দেবেন অমনিই দিয়ে দেবেন।

অমল। না, না, আমি তাঁর দরজার সামনে পথের ধারে দাঁড়িয়ে জয় হোক বলে ভিক্ষা চাইব— আমি খঞ্জনি বাজিয়ে নাচব— সে বেশ হবে, না?

ঠাকুরদা। সে খুব ভালো হবে। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলে আমারও পেট ভরে ভিক্ষা মিলবে। তুমি কী ভিক্ষা চাইবে?

অমল। আমি বলব, আমাকে তোমার ডাক-হরকরা করে দাও, আমি অমনি লণ্ঠন হাতে ঘরে ঘরে তোমার চিঠি বিলি করে বেড়াব। জান ফকির, আমাকে একজন বলেছে আমি ভালো হয়ে উঠলে সে আমাকে ভিক্ষা করতে শেখাবে। আমি তার সঙ্গে যেখানে খুশি ভিক্ষা করে বেড়াব।

ঠাকুরদা। কে বলো দেখি?

অমল। ছিদাম।

ঠাকুরদা। কোন্ ছিদাম?

অমল। সেই যে অন্ধ খোঁড়া। সে রোজ আমার জানলার কাছে আসে। ঠিক আমার মতো একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। আমি তাকে বলেছি, আমি ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াব।

ঠাকুরদা। সে তো বেশ মজা হবে দেখছি।

অমল। সেই আমাকে বলেছে কেমন করে ভিক্ষা করতে হয় আমাকে শিখিয়ে দেবে। পিসেমশায়কে আমি বলি ওকে ভিক্ষা দিতে, তিনি বলেন ও মিথ্যা কানা, মিথ্যা খোঁড়া। আচ্ছা, ও যেন মিথ্যা কানা-ই হল, কিন্তু চোখে দেখতে পায় না— সেটা তো সত্যি।

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছ বাবা, ওর মধ্যে সত্যি হচ্ছে ঐটুকু যে, ও চোখে দেখতে পায় না— তা ওকে কানা বল আর না-ই বল। তা ও ভিক্ষা পায় না, তবে তোমার কাছে বসে থাকে কী করতে।

অমল। ওকে যে আমি শোনাই কোথায় কী আছে। বেচারা দেখতে পায় না। তুমি যে-সব দেশের কথা আমাকে বল সে-সব আমি ওকে শুনিয়ে দিই। তুমি সেদিন আমাকে সেই যে হালকা দেশের কথা বলেছিলে, যেখানে কোনো জিনিসের কোনো ভার নেই— যেখানে একটু লাফ দিলেই অমনি পাহাড় ডিঙিয়ে চলে যাওয়া যায়, সেই হালকা দেশের কথা শুনে ও ভারি খুশি হয়ে উঠেছিল। আচ্ছা ফকির, সে দেশে কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যায় ?

ঠাকুরদা। ভিতরের দিক দিয়ে সে একটা রাস্তা আছে, সে হয়তো খুঁজে পাওয়া শক্ত।

অমল। ও বেচারা যে অন্ধ, ও হয়তো দেখতেই পাবে না— ওকে কেবল ভিক্ষাই করে বেড়াতে হবে। তাই নিয়ে ও দুঃখ করছিল— আমি ওকে বললুম ভিক্ষা করতে গিয়ে তুমি যে কত বেড়াতে পাও, সবাই তো সে পায় না।

ঠাকুরদা। বাবা, ঘরে বসে থাকলেই বা এত কিসের দুঃখ ?

অমল। না, না, দুঃখ নেই। প্রথমে যখন আমাকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে রেখে দিয়েছিল আমার মনে হয়েছিল যেন দিন ফুরোচ্ছে না, আমাদের রাজার ডাকঘর দেখে অবধি এখন আমার রোজই ভালো লাগে— এই ঘরের মধ্যে বসে বসেই ভালো লাগে— একদিন আমার চিঠি এসে পৌঁছোবে, সে কথা মনে করলেই আমি খুব খুশি হয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারি। কিন্তু রাজার চিঠিতে কী যে লেখা থাকবে তা তো আমি জানি নে।

ঠাকুরদা। তা না-ই জানলে। তোমার নামটি তো লেখা থাকবে— তা হলেই হল।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মাধব দত্ত। তোমরা দুজনে মিলে এ কী ফেসাদ বাধিয়ে বসে আছ বলো দেখি ?

ঠাকুরদা। কেন হয়েছে কী ?

মাধব দত্ত। শুনছি, তোমরা নাকি রটিয়েছ, রাজা তোমাদেরই চিঠি লিখবেন বলে ডাকঘর বসিয়েছেন।

ঠাকুরদা। তাতে হয়েছে কী ?

মাধব দত্ত। আমাদের পঞ্চানন মোড়ল সেই কথাটি রাজার কাছে লাগিয়ে বেনামি চিঠি লিখে দিয়েছে।

ঠাকুরদা। সকল কথাই রাজার কানে ওঠে, সে কি আমরা জানি নে ?

মাধব দত্ত। তবে সামলে চল না কেন। রাজাবাদশার নাম করে অমন যা-তা কথা মুখে আনো কেন ? তোমরা যে আমাকে সুদ্ধ মুশকিলে ফেলবে।

অমল। ফকির, রাজা কি রাগ করবে?

ঠাকুরদা। অমনি বললেই হল! রাগ করবে! কেমন রাগ করে দেখি-না। আমার মতো ফকির আর তোমার মতো ছেলের উপর রাগ ক'রে সে কেমন রাজাগিরি ফলায় তা দেখা যাবে।

অমল। দেখো ফকির, আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে-থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে; মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন। একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছে করছে। কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না। রাজার চিঠি কি আসবে না? এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়— যদি—

ঠাকুরদা। (অমলকে বাতাস করিতে করিতে) আসবে, চিঠি আজই আসবে।

কবিরাজের প্রবেশ

কবিরাজ। আজ কেমন ঠেকছে?

অমল। কবিরাজমশায়, আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে— মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।

কবিরাজ। (জনান্তিকে মাধব দত্তের প্রতি) ঐ হাসিটি তো ভালো ঠেকছে না। ঐ-যে বলছে খুব ভালো বোধ হচ্ছে ঐটেই হল খারাপ লক্ষণ। আমাদের চক্রধরদত্ত বলছেন—

মাধব দত্ত। দোহাই কবিরাজমশায়, চক্রধরদত্তের কথা রেখে দিন। এখন বলুন ব্যাপারখানা কী।

কবিরাজ। বোধ হচ্ছে, আর ধরে রাখা যাবে না। আমি তো নিষেধ করে গিয়েছিলুম কিন্তু বোধ হচ্ছে বাইরের হাওয়া লেগেছে।

মাধব দত্ত। না কবিরাজমশায়, আমি ওকে খুব করেই চারি দিক থেকে আগলে সামলে রেখেছি। ওকে বাইরে যেতে দিই নে— দরজা তো প্রায়ই বন্ধই রাখি।

কবিরাজ। হঠাৎ আজ একটা কেমন হাওয়া দিয়েছে— আমি দেখে এলুম, তোমাদের সদর-দরজার ভিতর দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইছে। ওটা একেবারেই ভালো নয়। ও-দরজাটা বেশ ভালো করে তালাচাবি-বন্ধ করে দাও। না-হয় দিন দুই-তিন তোমাদের এখানে লোক-আনাগোনা বন্ধই থাক্-না। যদি কেউ এসে পড়ে খিড়কি-দরজা আছে। ঐ-যে জানলা দিয়ে সূর্যাস্তের আভাটা আসছে, ওটাও বন্ধ করে দাও, ওতে রোগীকে বড়ো জাগিয়ে রেখে দেয়।

মাধব দত্ত। অমল চোখ বুজে রয়েছে, বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। ওর মুখ দেখে মনে

হয় যেন— কবিরাজমশায়, যে আপনার নয় তাকে ঘরে এনে রাখলুম, তাকে ভালো-বাসলুম, এখন বুঝি আর তাকে রাখতে পারব না।

কবিরাজ। ওকি! তোমার ঘরে যে মোড়ল আসছে! এ কী উৎপাত! আমি আসি ভাই! কিন্তু তুমি যাও, এখনই ভালো করে দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি বাড়ি গিয়েই একটা বিষবড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি— সেইটে খাইয়ে দেখো— যদি রাখবার হয় তো সেইটেতেই টেনে রাখতে পারবে। [মাধব দত্ত ও কবিরাজের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। কী রে ছোঁড়া!

ঠাকুরদা। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আরে আরে, চুপ চুপ!

অমল। না ফকির, তুমি ভাবছ আমি ঘুমোচ্ছি। আমি ঘুমোই নি। আমি সব শুনছি। আমি যেন অনেক দূরের কথাও শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার মা আমার বাবা যেন শিয়রের কাছে কথা কচ্ছেন।

মাধব দত্তের প্রবেশ

মোড়ল। ওহে মাধব দত্ত, আজকাল তোমাদের যে খুব বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে সম্বন্ধ!

মাধব দত্ত। বলেন কী, মোড়লমশায়! এমন পরিহাস করবেন না। আমরা নিতান্তই সামান্য লোক।

মোড়ল। তোমাদের এই ছেলেটি যে রাজার চিঠির জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

মাধব দত্ত। ও ছেলেমানুষ, ও পাগল, ওর কথা কি ধরতে আছে!

মোড়ল। না-না, এতে আর আশ্চর্য কী? তোমাদের মতো এমন যোগ্য ঘর রাজা পাবেন কোথায়? সেইজন্যেই দেখছ না, ঠিক তোমাদের জানলার সামনেই রাজার নতুন ডাকঘর বসেছে? ওরে ছোঁড়া, তোর নামে রাজার চিঠি এসেছে যে।

অমল। (চমকিয়া উঠিয়া) সত্যি!

মোড়ল। এ কি সত্যি না হয়ে যায়! তোমার সঙ্গে রাজার বন্ধুত্ব! (একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া) হা হা হা হা, এই যে তাঁর চিঠি।

অমল। আমাকে ঠাট্টা কোরো না। ফকির, ফকির, তুমি বলো-না, এই কি সত্যি তাঁর চিঠি?

ঠাকুরদা। হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।

অমল। কিন্তু, আমি যে এতে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে— আমার চোখে আজ সব সাদা হয়ে গেছে! মোড়লমশায়, বলে দাও-না, এ-চিঠিতে কী লেখা আছে।

মোড়ল। রাজা লিখছেন, আমি আজকালের মধ্যেই তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি, আমার জন্যে তোমাদের মুড়ি-মুড়কির ভোগ তৈরি করে রেখো— রাজভবন আর আমার এক দণ্ড ভালো লাগছে না। হা হা হা হা!

মাধব দত্ত। (হাত জোড় করিয়া) মোড়লমশায়, দোহাই আপনার, এ-সব কথা নিয়ে পরিহাস করবেন না।

ঠাকুরদা। পরিহাস! কিসের পরিহাস! পরিহাস করেন, এমন সাধ্য আছে ওঁর!

মাধব। আরে! ঠাকুরদা, তুমিও খেপে গেলে নাকি!

ঠাকুরদা। হাঁ, আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজ-কবিরাজকেও সঙ্গে করে আনছেন।

অমল। ফকির, ঐ-যে, ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে, শুনতে পাচ্ছ না?

মোড়ল। হা হা হা হা! উনি আরো একটু না খেপলে তো শুনতে পাবেন না।

অমল। মোড়লমশায়, আমি মনে করতুম, তুমি আমার উপর রাগ করেছ— তুমি আমাকে ভালোবাস না। তুমি যে সত্যি রাজার চিঠি আনবে এ আমি মনে করি নি— দাও আমাকে তোমার পায়ের ধুলো দাও।

মোড়ল। না, এ ছেলেটার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। বুদ্ধি নেই বটে, কিন্তু মনটা ভালো।

অমল। এতক্ষণে চার প্রহর হয়ে গেছে বোধ হয়। ঐ-যে ঢং ঢং ঢং— ঢং ঢং ঢং। সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি নে?

ঠাকুরদা। ওরা যে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্ছি।

বাহিরে দ্বারে আঘাত

মাধব দত্ত। ওকি ও! ও কে ও! এ কী উৎপাত?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত। কে তোমরা?

(বাহির হইতে) খোলো দ্বার।

মাধব দত্ত। মোড়লমশায়, এ তো ডাকাত নয়!

মোড়ল। কে রে? আমি পঞ্চানন মোড়ল। তোদের মনে ভয় নেই নাকি?
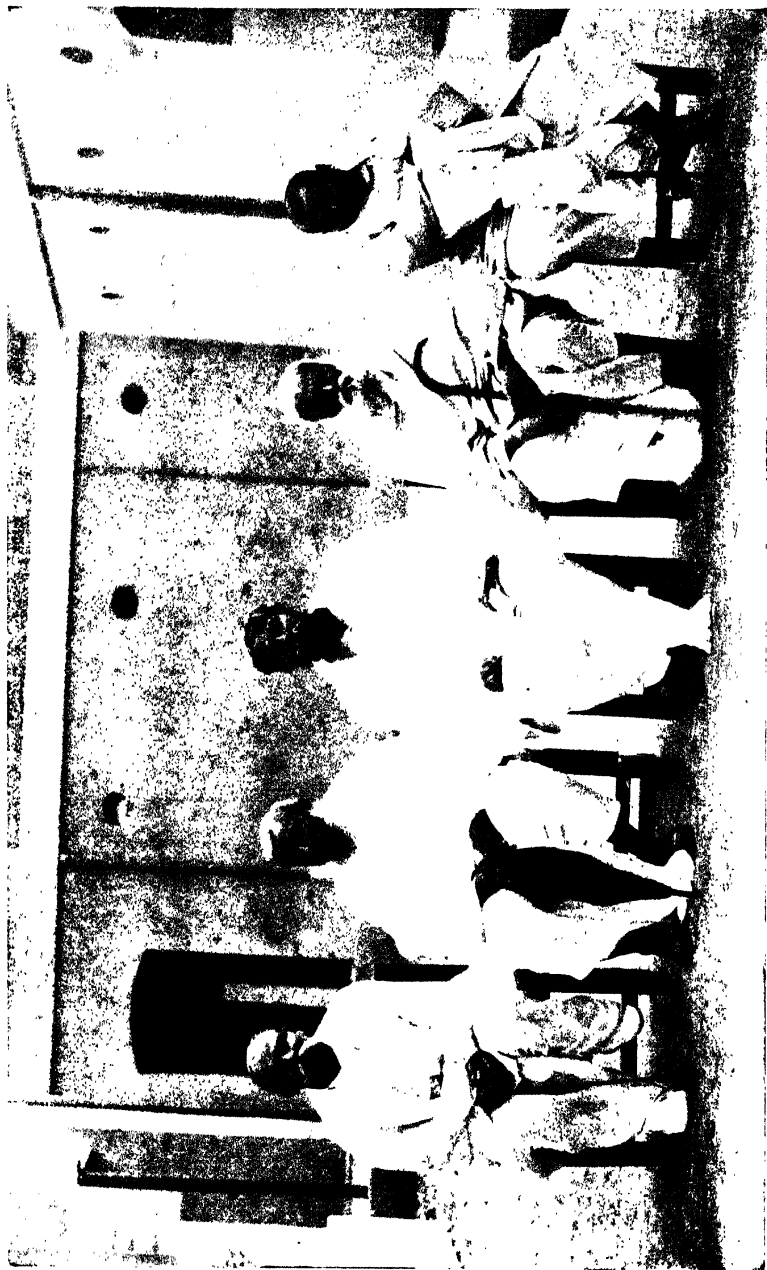
সুহৃদ্‌বর্গসহ রবীন্দ্রনাথ

আশুতোষ চৌধুরী   রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়   রবীন্দ্রনাথ   ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল   শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

১৩১৮ সালে গৃহীত ফোটোগ্রাফ। সুহাসচন্দ্র মজুমদারের সৌজন্যে

রাজকবিরাজ। আচ্ছা, বাবা, উনি যখন তোমার বন্ধু তখন উনিও এ-ঘরে রইলেন।

মাধব দত্ত। (অমলের কানে কানে) বাবা, রাজা তোমাকে ভালোবাসেন, তিনি স্বয়ং আজ আসছেন— তাঁর কাছে আজ কিছু প্রার্থনা কোরো। আমাদের অবস্থা তো ভালো নয়। জান তো সব।

অমল। সে আমি সব ঠিক করে রেখেছি, পসেমশায়— সে তোমার কোনো ভাবনা নেই।

মাধব দত্ত। কী ঠিক করেছ বাবা?

অমল। আমি তাঁর কাছে চাইব, তিনি যেন আমাকে তাঁর ডাকঘরের হরকরা করে দেন— আমি দেশে দেশে ঘরে ঘরে তাঁর চিঠি বিলি করব।

মাধব দত্ত। (ললাটে করাঘাত করিয়া) হায় আমার কপাল!

অমল। পিসেমশায়, রাজা আসবেন, তাঁর জন্যে কী ভোগ তৈরি রাখবে।

দূত। তিনি বলে দিয়েছেন তোমাদের এখানে তাঁর মুড়িমুড়কির ভোগ হবে।

অমল। মুড়ি-মুড়কি! মোড়লমশায়, তুমি তো আগেই বলে দিয়েছিলে, রাজার সব খবরই তুমি জান! আমরা তো কিছুই জানতুম না।

মোড়ল। আমার বাড়িতে যদি লোক পাঠিয়ে দাও তা হলে রাজার জন্যে ভালো ভালো কিছু—

রাজকবিরাজ। কোনো দরকার নেই। এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এলো, এলো, ওর ঘুম এলো। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব— ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও— এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।

মাধব দত্ত। (ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাতজোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ-সব কি ভালো লক্ষণ! এরা আমার ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন! তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা। চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কোয়ো না।

সুধার প্রবেশ

সুধা। অমল।

রাজকবিরাজ। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা। আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি — ওর হাতে কি দিতে পারব না?

রাজকবিরাজ। আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা। ও কখন জাগবে?

রাজকবিরাজ। এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা। তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে?

রাজকবিরাজ। কী বলব?

সুধা। বোলো যে, 'সুধা তোমাকে ভোলে নি'।

—

উপন্যাস ও গল্প

দুই বোন

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
করকমলে

দুই বোন

শর্মিলা

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।

বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর চাহনি; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা, সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।

স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনো প্রত্যন্তদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল। স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। ফাউণ্টেন কলমটা সামান্য দুর্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ক্ষণকালের জন্যে অগোচর হলে সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার স্ত্রীর 'পরে। স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে শশাঙ্কর হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না, স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের দু-জোড়া মোজার এক-এক পাটি এক-এক পায়ে পরে বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, স্ত্রী এসে তার প্রমাদ সংশোধন করে দেয়।

বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে পড়েছে। স্ত্রী সস্নেহ তিরস্কারে বলে, "আর তো পারি নে। তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না!" যদি শিক্ষা হত তবে শর্মিলার দিনগুলো হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।

শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণে গেছে। রাত এগারোটা হল, দুপুর হল, ব্রিজ খেলা চলছে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠল, "ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।"

সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গোঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন, বগলে বাঁশের লাঠি। মাঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন বাবু কি আছেন এখানে? মাঠাকরুনের ভয়, পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্যোগ ঘটে। সঙ্গে একটা লণ্ঠনও পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুরা বলে, "আহা, একা অরক্ষিত পুরুষমানুষ।" বাড়ি ফিরে এসে শশাঙ্ক স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ করে সেটা না স্নিগ্ধ ভাষায় না শান্ত ভঙ্গিতে। শর্মিলা চুপ করে ভর্ৎসনা মেনে নেয়। কী করবে, পারে না থাকতে। যতপ্রকার অসম্ভব বিপত্তি ওর অনুপস্থিতির অপেক্ষায় স্বামীর পথে ষড়যন্ত্র করে এ আশঙ্কা ও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

বাইরে লোক এসেছে, হয়তো কাজের কথায়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোটো ছোটো চিরকুট আসছে, "মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল। আজ সকাল সকাল খেতে এসো।" রাগ করে শশাঙ্ক, আবার হারও মানে। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল, "দোহাই তোমার, চক্রবর্তীবাড়ির গিন্নীর মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি। দেবতার সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারলে সহজ হয়। যতই বাড়াবাড়ি করো দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্বল।"

শর্মিলা বললে, "হায় হায়, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে যখন হরিদ্বার গিয়েছিলুম, মনে আছে তোমার অবস্থা।"

অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এ কথা শশাঙ্কই প্রচুর অলংকার দিয়ে একদা স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে। জানত এই অত্যুক্তিতে শর্মিলা যেমন অনুতপ্ত

তেমনি আনন্দিত হবে। আজ সেই অমিতভাষণের প্রতিবাদ করবে কোন্‌ মুখে। চুপ করে মেনে যেতে হল, শুধু তাই নয়, সেদিনই ভোরবেলায় অল্প একটু যেন সর্দির আভাস দেখা দিয়েছে শর্মিলার এই কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনিন খেতে হল দশ গ্রেন, তা ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। আপত্তি করবার মুখ ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে অনুরূপ অবস্থায় আপত্তি করেছিল, কুইনিন খায় নি, জ্বরও হয়েছিল, এই বৃত্তান্তটি শশাঙ্কের ইতিহাসে অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা, বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে।

একবার বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ছিল রিজার্ভ-করা। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দিপরা দুর্জন মূর্তি ওদের বেদখল করবার উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত। স্টেশনমাস্টার এসে এক বিশ্ববিশ্রুত জেনেরালের নাম করে বললে, কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েছে। শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে সসম্ভ্রমে অন্যত্র যাবার উপক্রম করছে, হেনকালে শর্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বললে, "দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।" শশাঙ্ক তখনো সরকারি কর্মচারী, উপরওআলার জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদ পথে চলতে সে অভ্যস্ত। সে ব্যস্ত হয়ে যত বলে, "আহা, কাজ কী, আরো তো গাড়ি আছে"— শর্মিলা কানই দেয় না! অবশেষে জেনেরালসাহেব রিফ্রেশমেণ্ট রুমে আহার সমাধা করে চুরুট মুখে দূর থেকে স্ত্রীমূর্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "জান কতবড়ো লোকটা!" স্ত্রী বললে, "জানার গরজ নেই। যে-গাড়িটা আমাদের, সে-গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।"

শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে, "যদি অপমান করত ?"

শর্মিলা জবাব দিলে, "তুমি আছ কী করতে।"

শশাঙ্ক শিবপুরে পাস-করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাক চাকরির কাজে সে পাকা। প্রধান কারণ, কর্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্মম দৃষ্টি সে হচ্ছে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়োসাহেব। স্ত্রীগ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারি পদে যখন অ্যাকটিনি করছে এমন সময় আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উলটো দিকে। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তার সম্পর্ক ও সুপারিশ বহন করে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েছে এই অর্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে নীচের স্তরে থেকে তাকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বললে, "ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।" এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিটখিট শুরু করে দিলে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার আপিসঘরের এককোণে ঝুল, হঠাৎ মনে হল চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে-রঙটা ও দু-চক্ষে দেখতে পারে না। বেহারা বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিল, ধুলো উড়ছে বলে তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। অনিবার্য ধুলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা সদ্য নূতন।

অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালে না। ভাবলে যদি কানে ওঠে তা হলে চাকরির জালটাতে আরো একটা গ্রন্থি পাকিয়ে তুলবে—হয়তো বা স্বয়ং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ডসনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে সার্কিট-হাউসের বাগানে বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছররা-গুলিতে শশাঙ্কর সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটে নি কিন্তু ঘটতে তো পারত। লোকে বলে দোষ শশাঙ্করই, শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনল্ডসনের 'পরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণটা এই, বাঁদরকে লক্ষ্য-করা গুলি শশাঙ্কের উপর পড়াতে শত্রুপক্ষ এই দুটো ব্যাপারের সমীকরণ করে উচ্চহাস্য করেছে।

শশাঙ্কের পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর রকম দেখেই বুঝেছিল সংসারে কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উঁচিয়ে উঠেছে। তার পরে কারণ বের করতে সময় লাগে নি। কনস্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্‌ফ-ডিটার্মিনেশনের অভিমুখে। স্বামীকে বললে, "আর নয়, এখনই কাজ ছেড়ে দাও।"

দিতে পারলে অপমানের জোঁকটা বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র, এবং তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

শশাঙ্কমৌলী যে-বছরে এম. এসসি. ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়, সেই বছরেই তার শ্বশুর শুভকর্মে বিলম্ব করেন নি— শশাঙ্কের বিবাহ হয়ে গেল শর্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে। তার পরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারামবাবু জামাতার ভাবী সচ্ছলতার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্যন্ত অনুভব করে নি তার অবস্থান্তর ঘটেছে। শুধু যে

সংসারে অনটন নেই তা নয়, বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্মিলার অধিকারে। ওর সন্তান হয় নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েছে। স্বামীর সমস্ত উপার্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবি অসংগত হলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনো দিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

শশাঙ্ক বললে, "চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারই।"

শর্মিলা বললে, "তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যায়টাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।"

শশাঙ্ক বললে, "কাজ তো করা চাই, ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে খুঁজে বেড়াব কোন্ পাড়ায়।"

"সে-পাড়া তোমার চোখে পড়ে না। তুমি যাকে ঠাট্টা করে বল তোমার চাকরির লুচি-স্থান, বেলুচিস্থান মরুপ্রদেশের ও পারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই কর না।"

"সর্বনাশ। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে। অতবড়ো দুরবীন পাই কোন্ বাজারে।"

"মস্ত দুরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতায় বড়ো কন্ট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।"

"ভাগটা ওজনে অসমান হবে। এ পক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদমর্যাদা থাকবে না।"

"এ পক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জানো, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন সুদে বাড়ছে! শরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবে না।"

"সে কি হয়। ও টাকা যে তোমার।" বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে।

শর্মিলা স্বামীর কাপড় টেনে বসিয়ে বললে, "আমিও যে তোমারই।"

তার পর বললে, "বের করো তোমার জেব থেকে ফাউন্টেন্‌পেন, এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগ্‌নেশন-পত্র। সেটা ডাকে রওনা না করে আমার শান্তি নেই।"

"আমারও শান্তি নেই বোধ হচ্ছে।"

লিখলে রেজিগ্‌নেশন-পত্র।

পরদিনই শর্মিলা চলে গেল কলকাতায়, উঠল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বললে, "একদিনও তো বোনের খবর নাও না।"

মেয়ে-প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বলত, 'তুমিও তো নাও না।' পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগাল না। অপরাধ মেনে নিলে। বললে, "নিশ্বাস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কিনা তাই ভুল হয়ে যায়। আর, তা ছাড়া তোমরাও তো দূরে দূরে বেড়াও।"

শর্মিলা বললে, "কাগজে দেখলুম ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। পড়ে এত খুশি হলুম। তখনই মনে হল মথুরদাদাকে নিজে গিয়ে কন্‌গ্র্যাচুলেট করে আসি।"

"একটু সবুর কোরো খুকি। এখনো সময় হয় নি।"

ব্যাপারখানা এই: নগদ টাকা ফেলার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা। শেষকালে প্রকাশ হল যে-রকম শর্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর ছিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে। তাই পিছোবার চেষ্টা।

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, "এ কখনো হতেই পারে না। ভাগে কাজ করতে যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফসকে গেলে ভারি অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ হতেই দেব না, যাই বল তুমি।"

এর পরে লেখাপড়া হতেও দেরি হল না; মথুরদাদার হৃদয়ও বিগলিত হল।

ব্যাবসা চলল বেগে। এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেছে, সে দায়িত্বের সীমা ছিল পরিমিত। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবি এবং দেয় সমান সমান ওজন মিলিয়ে চলত। এখন নিজেরই প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবি এবং দেয় এক জায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ছুটিতে কাজেতে জাল-বোনা নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত কড়া। আর কিছু নয়, স্ত্রীর ঋণ শুধতেই হবে, তার পরে ধীরেসুস্থে চলবার সময় পাওয়া যাবে। বাঁ হাতের কব্জিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা, মোটা-সুকতলা-ওআলা জুতো, চোখে রোদ বাঁচাবার রঙিন চশমা— শশাঙ্ক উঠেপড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এল তখনো ইস্টিমের দম কমায় না, মনটা তখন উঠেছে গরম হয়ে।

ইতিপূর্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে, এখন হল দুই শাখা।

একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর-একটা ঘরের দিকে। শর্মিলার বরাদ্দ পূর্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার রহস্য শশাঙ্কর অগোচরে। আবার ব্যবসায়ের ঐ চামড়া-বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গবিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান উপেক্ষিত হতে থাকে। মিনতি করে বলে, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।' কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য এই, শরীরও ভাঙছে না। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্‌বেগ, বিশ্রামের অভাব নিয়ে আক্ষেপ, আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা সবেগে উপেক্ষা করে শশাঙ্ক সকালবেলায় সেকেণ্ড্‌হ্যাণ্ড্ ফোর্ডগাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলা দুটো-আড়াইটার সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায়, এবং আর-আর খাওয়াও দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

একদিন ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হল জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বললে, "গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।"

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, "পরের হাতের আপদও একই জাতের দুষমন।"

একদিন কোন্ মেরামতের কাজ তদন্ত করতে গিয়ে জুতো ফুঁড়ে পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাকবাক্সর পেরেক, হাঁসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টংকারের টিকে নিলে, সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্মিলা; বললে, "কিছুদিন থাকো শুয়ে।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বললে, "কাজ।" এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্মিলা বললে, "কিন্তু"— এবার বিনা বাক্যেই ব্যাণ্ডেজসুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েছে। যুক্তিতর্ক-কাকুতিমিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা— 'কাজ আছে।' শর্মিলা অকারণে উদ্‌বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরি হলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেছে। রোদ্দুর লাগিয়ে স্বামীর মুখ যখন দেখে রক্তবর্ণ, মনে করে নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের— স্বামীর ভাবখানা দেখে ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্‌বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

শশাঙ্ক দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া খট্‌খটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। শর্মিলার সেবা এই দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। স্টোভের কাছে কিছু খাবার

সর্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন স্বামী হঠাৎ অসময়ে বলে বসে, 'চললুম, ফিরতে দেরি হবে।' মোটরগাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওআটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে শুকনোজাতের খাবার। একটা ওডিকোলনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচররূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা করে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয় নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্যভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চার দিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরনে, সেও চলতে চলতে, পিছু ডাকতে ডাকতে, বলতে বলতে 'ওগো শুনে যাও কথাটা'। ওদের ব্যাবসার মধ্যে শর্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল তাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েছে মাপজোখ-করা হিসেবে, দস্তুরমত রসিদ নিয়ে। শর্মিলা বলে, 'বাস রে, ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।'

লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ভবানীপুরে। ওর শখের জিনিস। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান আসছে মাথায়। শর্মিলাকে আশ্চর্য করবার চেষ্টা। শর্মিলাও বিধিমত আশ্চর্য হতে ত্রুটি করে না। এঞ্জিনিয়ার একটা কাপড়-কাচা কলের পত্তন করেছে, শর্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বললে, 'কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দভবাহনকে বুঝে নিয়েছি, তার বিজ্ঞানবাহনকে বুঝি নে।' আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা দেখে তাক লেগে গেল, বললে, 'আলুর দম তৈরি করবার বারো-আনা দুঃখ যাবে কেটে।' পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাৎলি প্রভৃতির সঙ্গে এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্য লাভ করেছে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেলে। সুবিধা এই যে, ইটকাঠের দেহটাতে ধৈর্য অটল। গোছানো-গাছানো সাজানো-গোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল, একজন দিয়ে গেল জবাব। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলছে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানাঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না, তবু তারই ক্লান্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্ছে নানা ফ্যাশনের; ফুলদানি একটা-আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ঝালরওআলা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে

কাজ যখন বন্ধ তখনো ছুটোছাটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস-ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিম্বা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চলছে। মোটা গদিওআলা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটিজোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি। আপিস-ঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতি-কালে ঝাড়ন হাতে শর্মিলা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানকার রক্ষণীয় এবং বর্জনীয় বস্তু-বূ্যহের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়-সাধনে তার অধ্যবসায় অপ্রতিহত।

শর্মিলা সেবা করছে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখানি অগোচরে। আগে তার যে আত্মনিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে— বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওআড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগন্ধার গুচ্ছে সজ্জিত নীল স্ফটিকের ফুলদানিতে।

নিজের অর্ঘ্যকে পূজাবেদীর থেকে দূরে স্থাপন করতে হল, কিন্তু অনেক দুঃখে। এই অল্পদিন আগেই যে ঘা পেয়েছে তার চিহ্ন গোপনে চোখের জল ফেলে ফেলে মুছতে হয়েছে। সেদিন উনত্রিশে কার্তিক, শশাঙ্কের জন্মদিন। শর্মিলার জীবনে সব চেয়ে বড়ো পরব। যথারীতি বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হল, ঘরদুয়োর বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।

সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, "এ কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি।"

"হায় রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ? যাই বল, বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।"

"বিজ্‌নেস মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।"

"আর কখনো বলব না। আজ লোকজন নেমন্তন্ন করে ফেলেছি।"

"দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না" এই বলে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলে।

অপরাহ্নে লোকজন এল। বিজ্‌নেসের সর্বোচ্চ দাবি তারা সহজেই মেনে নিলে। এটা যদি হত কালিদাসের জন্মদিন তবে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক লেখবার ওজরটাকে সকলেই নিশ্চয় নিতান্ত বাজে বলে ধরে নিত। কিন্তু বিজ্‌নেস! আমোদপ্রমোদ

যথেষ্ট হল। নালুবাবু থিয়েটারের নকল করে সবাইকে খুব হাসালেন, শর্মিলাও সে হাসিতে যোগ দিলে। শশাঙ্ক-বিরহিত শশাঙ্কের জন্মদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে শশাঙ্ক-অধিষ্ঠিত বিজ্‌নেসের কাছে।

দুঃখ যথেষ্ট হল, তবু শর্মিলার মনও দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের এই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটাকে। ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারো খাতির করে না, স্ত্রীর মিনতিকে না, বন্ধুর নিমন্ত্রণকে না, নিজের আরামকে না। এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষমানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন। শর্মিলা ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কের কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সে দূরদেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা-অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসনজালে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম; তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহু-বন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে তবে পুরুষ তাকে নির্মম বেগে ছিন্ন করে যাবে বৈকি। এই নির্মমতাকে শর্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাকতে পারে না, যেখানে অধিকার নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সকরুণ উৎকণ্ঠা, আঘাত পায়, সে আঘাতকে প্রাপ্য গণ্য করেই ব্যথিতমনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। দেবতাকে বলে 'দৃষ্টি রেখো', যেখানে তার নিজের গতিবিধি অবরুদ্ধ।

নীরদ

ব্যাঙ্কে-জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যে সময়টাতে ছুটে চলেছে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে সেই সময়ে শর্মিলাকে ধরল দুর্বোধ কোন্‌-এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না। এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

রাজারামবাবু ছিলেন শর্মিলার বাপ। বরিশাল অঞ্চলে এবং গঙ্গার মোহনার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারি। তা ছাড়া জাহাজ-তৈরির ব্যবসায়ে তাঁর শেয়ার আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায়, একালের শুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চেণ্ট-অফ ভেনিস, জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট থেকে দু-চার পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ, বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলাভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ।ছল মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত। মধ্যবয়সে মদ এবং নিষিদ্ধ ভোজ্যকে আধুনিক চিত্তোৎকর্ষের আবশ্যক অঙ্গ বলে জানতেন, শেষবয়সে ছেড়ে দিয়েছেন। সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দরগম্ভীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজলিশি, কোনো প্রার্থী তাঁকে ধরে পড়লে 'না' বলতে জানতেন না। নিষ্ঠা ছিল না পূজার্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ দ্বারা কৌলিক মর্যাদা প্রকাশ পেত, পূজাটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্যে। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই রাজা উপাধি পেতে পারতেন; ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাজারাম হেসে বলতেন, পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করছেন, তার উপরে অন্য উপাধিকে আসন দিলে সম্মান খর্ব হবে। গবর্মেণ্ট্‌ হাউসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্তৃপক্ষীয় পদস্থ ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রী-পূজায় শ্যাম্পেন-প্রসাদ ভূরিপরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।

শর্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোটো মেয়ে ঊর্মিমালা। ছেলেটিকে অধ্যাপকবর্গ বলতেন দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট্‌। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েছে পরীক্ষামানের ঊর্ধ্বতম মার্কা পর্যন্ত। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য তার চারি দিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষপ্রদক্ষিণ সবেগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন

তখনো উদাসীন। উপস্থিত লক্ষ ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জর্মন শেখা শুরু করেছিল।

আর কিছু হাতে না পেয়ে অনাবশ্যক হলেও আইন পড়া যখন আরম্ভ করেছে এমন সময় হেমন্তের অন্ত্রে কিম্বা শরীরে কোন্ যন্ত্রে কী একটা বিকার ঘটল ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলেন না। গোপনচারী রোগ সবল দেহে যেন দুর্গের আশ্রয় পেয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যেমন শক্ত হল তাকে আক্রমণ করাও তেমনি। সেকালের এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্রচিকিৎসায় লোকটি যশস্বী। রোগীর দেহে সন্ধান শুরু করলেন। অস্ত্রব্যবহারের অভ্যাসবশত অনুমান করলেন, দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বদ্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য। অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদ করে যেখানটা অনাবৃত হল সেখানে কল্পিত শত্রুও নেই, তার অত্যাচারের চিহ্নও নেই। ভুল শোধরাবার রাস্তা রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজে নি, কিন্তু অমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন করে খণ্ডিত করার স্মৃতিটা দিন-রাত তাঁর মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। মর্ম শোষণ করে টানলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে।

নতুন-পাস-করা ডাক্তার, হেমন্তের পূর্বসহাধ্যায়ী, নীরদ মুখুজ্জে ছিল শুশ্রূষার সহায়তা-কাজে। বরাবর জোর করে সে বলে এসেছে, ভুল হচ্ছে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয় করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে। কিন্তু রাজারামের মনে তাঁদের পৈত্রিক যুগের সংস্কার ছিল অটল। তিনি জানতেন যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। এই ব্যাপারে নীরদের 'পরে অযথামাত্রায় তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর ছোটো মেয়ে উর্মির অকস্মাৎ মনে হল, এ মানুষটার প্রতিভা অসামান্য। বাবাকে বললে, "দেখো তো বাবা, অল্প বয়স অথচ নিজের পরে কী দৃঢ় বিশ্বাস আর অতবড়ো হাড়-চওড়া বিলিতি ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে পারে এমন অসংকুচিত সাহস।"

বাবা বললেন, "ডাক্তারিবিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারো কারো মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখছি তাই।"

এদের ভক্তির শুরু হল একটা ছোটো প্রমাণ নিয়ে, শোকের আঘাতে, পরিতাপের বেদনায়। তার পরে প্রমাণের অপেক্ষা না করে সেটা আপনিই বেড়ে চলল।

রাজারাম একদিন মেয়েকে বললেন, "দেখ্ উর্মি, আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত

আমাকে কেবলই ডাকছে, বলছে, 'মানুষের রোগের দুঃখ দূর করো।' স্থির করেছি তার নামে একটা হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।"

উর্মি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, "খুব ভালো হবে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো য়ুরোপে, ডাক্তারি শিখে ফিরে এসে যেন হাঁসপাতালের ভার নিতে পারি।"

কথাটা রাজারামের হৃদয়ে গিয়ে লাগল। বললেন, "ঐ হাঁসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি সেবায়েত। হেমন্ত বড়ো দুঃখ পেয়ে গেছে, তোকে সে বড়ো ভালোবাসত, তোর এই পুণ্যকাজে পরলোকে সে শান্তি পাবে। তার রোগশয্যায় তুই তো দিনরাত্রি তার সেবা করেছিস, সেই সেবাই তোর হাতে আরো বড়ো হয়ে উঠবে।"

বনেদি ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও সৃষ্টিছাড়া বলে বৃদ্ধের মনে হল না। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বলতে যে কতখানি বোঝায় আজ সেটা আপন মর্মের মধ্যে বুঝেছেন। তাঁর ছেলে বাঁচে নি, কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তা হলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তাঁর শোকের লাঘব হতে পারে। মেয়েকে বললেন, "এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ হয়ে যাক আগে, তার পরে য়ুরোপে।"

এখন থেকে রাজারামের মনে একটা কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুকরো। যত দেখছেন ততই লাগছে চমৎকার। পাস করেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারিবিদ্যের সাত সমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনোকিছুতে টলে না মন। হালের যতকিছু আবিষ্কার তাই আলোচনা করছে উল্টেপাল্টে, পরীক্ষা করছে, আর ক্ষতি করছে নিজের পসারের। অত্যন্ত অবজ্ঞা করছে তাদের যাদের পসার জমেছে। বলত, মূর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্য ব্যক্তিরা লাভ করে গৌরব। কথাটা সংগ্রহ করেছে কোনো-একটা বই থেকে।

অবশেষে একদিন রাজারাম উর্মিকে বললেন, "ভেবে দেখলুম, আমাদের হাঁসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে, আর আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওর মতো অমন ছেলে পাব কোথায়।"

রাজারাম আর যাই পারুন হেমন্তের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। সে বলত, মেয়ের পছন্দ উপেক্ষা করে বাপমায়ের পছন্দে বিবাহ ঘটানো বর্বরতা। রাজারাম একদা তর্ক করেছিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার সঙ্গে সংসার জড়িত, তাই বিবাহে শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয় অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়ার দরকার আছে। তর্ক যেমনই করুন, অভিরুচি যেমনই থাক্‌, হেমন্তের 'পরে তাঁর স্নেহ এত গভীর যে, তার ইচ্ছাই এ পরিবারে জয়ী হল।

নীরদ মুখুজ্জের এ বাড়িতে গতিবিধি ছিল। হেমন্ত ওর নাম দিয়েছিল আউল, অর্থাৎ প্যাঁচা। অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে সে বলত, ও মানুষটা পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই, কেবল আছে বিদ্যে, তাই আমি ওকে বলি মিনার্ভার বাহন।

নীরদ এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেয়েছে, হেমন্তর সঙ্গে তুমুল তর্ক চালিয়েছে, মনে মনে ঊর্মিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু ব্যবহারে করে নি যে তার কারণ, এ ক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবহারটাই ওর স্বভাবে নেই। ও আলোচনা করতে পারে, আলাপ করতে জানে না। যৌবনের উত্তাপ ওর মধ্যে যদি-বা থাকে, তার আলোটা নেই। এইজন্যেই, যে-সব যুবকের মধ্যে যৌবনটা যথেষ্ট প্রকাশমান তাদের অবজ্ঞা করেই ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই-সকল কারণে ওকে ঊর্মির উমেদার-শ্রেণীতে গণ্য করতে কেউ সাহস করে নি। অথচ সেই প্রতীয়মান নিরাসক্তিই বর্তমান কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর 'পরে ঊর্মির শ্রদ্ধাকে সম্ভ্রমের সীমায় টেনে এনেছিল।

রাজারাম যখন স্পষ্ট করেই বললেন যে, যদি মেয়ের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তবে নীরদের সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি খুশি হবেন তখন মেয়ে অনুকূল ইঙ্গিতেই মাথাটা নাড়লে। কেবল সেইসঙ্গে জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার পালা সমাধা করে বিবাহ তার পরিণামে। বাবা বললেন, "সেই কথাই ভালো, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনা থাকে না।"

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয় নি, যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্‌বাহবন্ধন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগ স্বীকার, প্রায় আত্মঘাতের কাছাকাছি। বোধ করি এই দুর্যোগ কথঞ্চিৎ-উপশমের উপায়-স্বরূপে শর্ত রইল যে, পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ ঊর্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নী-রূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুলবে। সেটাও হবে বৈজ্ঞানিকভাবে, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরির অভ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।

নীরদ ঊর্মিকে বললে, "পশুপক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েছে তৈরি জিনিস। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা।"

ঊর্মি নম্রভাবে বললে, "আচ্ছা, পরীক্ষা করুন। বাধা পাবেন না।"

নীরদ বললে, "তোমার মধ্যে শক্তি নানাবিধ আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারি দিকে। তা হলেই তোমার জীবন অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল অর্গানিজম্‌।"

উর্মি পুলকিত হয়ে ভাবলে, অনেক যুবক ওদের চায়ের টেবিলে ওদের টেনিস কোর্টে এসেছে, কিন্তু ভাববার যোগ্য কথা তারা কখনো বলে না, আর-কেউ বললে হাই তোলে। বস্তুত নিরতিশয় গভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরন আছে নীরদের। সে যাই বলুক উর্মির মনে হয় এর মধ্যে একটা আশ্চর্য তাৎপর্য আছে। অত্যন্ত বেশি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল।

রাজারাম ওঁর বড়ো জামাইকেও ডাকলেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে চেষ্টা করলেন পরস্পরকে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলে, "ছেলেটা অসহ্য জেঠা ; ও মনে করে আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও পড়ে আছি শেষ বেঞ্চির শেষ কোণে।"

শর্মিলা হেসে বলে, "ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।"

শশাঙ্ক বলে, "ছোটো বোনের সঙ্গে ঠাঁই বদল করলে কেমন হয়।"

শর্মিলা বলে, "তা হলে তুমি হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচ, আমার কথা আলাদা।"

শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃভাব বেড়ে উঠছে তা মনে হয় না। মনে মনে বলে, 'ও তো মজুর, ও কি বৈজ্ঞানিক। হাত আছে মাথাটা কই।'

শশাঙ্ক নীরদকে নিয়ে তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। বলে, "এবার পুরোনো নাম বদলাবার দিন এল।"

"ইংরেজি মতে ?"

"না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে।"

"নতুন নামটা শুনি।"

"বিদ্যুৎলতা। নীরদের পছন্দ হবে। ল্যাবরেটরিতে ঐ পদার্থটার সঙ্গে পরিচয় আছে, এবার ঘরে পড়বে বাঁধা।"

মনে মনে বলে, 'সত্যি ঐ নামটাই একে ঠিক মানায় বটে।' ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে। 'হায় রে, এতবড়ো প্রিগ্‌টার হাতে পড়বে এমন মেয়ে।' কার হাতে পড়লে যে শশাঙ্কের রুচিতে ঠিক সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাজনক হতে পারত, বলা শক্ত।

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হল। উর্মির ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ একাগ্রমনে তার পরিণতি-সাধনের ভার নিলে।

উর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল

দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝল্‌মল্‌ করে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন তার মন সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত। রেডিয়োতে কান পাতে, হয়তো বলে 'ছ্যাঃ', কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। বিয়ে করতে রাস্তা দিয়ে বর চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ও ছুটে আসে বারান্দায়। জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত। টেনিস খেলে, ব্যাড্‌মিন্টন খেলায় ওস্তাদ। এ-সব দাদার কাছে শিক্ষা। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে শাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনেটুনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ঢিল দিয়ে, আঁট ক'রে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্যভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না, কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর দুরন্ত আঙুলগুলি কোলাহল করছে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্যে সংগত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে। কেবল নীরদের কাছে ও হয়ে যায় আর-এক মানুষ, পালের নৌকোর হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।

সবাই বলে, ঊর্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ। ঊর্মি জানে, ওর ভাই ওর মনকে মুক্তি দিয়েছে। হেমন্ত বলত, আমাদের ঘরগুলো এক-একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশ কোটি পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েছে। সে বলত, 'আমার যখন সময় আসবে তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।' সময় হল না, কিন্তু ঊর্মির মনকে খুবই সজীব করে রেখে দিয়ে গেছে।

মুশকিল বাধল এই নিয়ে। নীরদের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। ঊর্মির জন্যে পাঠ্যপর্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিয়ে বললে, "দেখো ঊর্মি, মনটাকে পথে চলতে চলতে কেবলই চলকিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছোবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কী।"

বলত, "তুমি প্রজাপতির মতো চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আন না। হতে হবে মউমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।"

নীরদ সম্প্রতি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বর বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে এইরকম সব কথা আছে। ওর ভাষাটা বইয়ের ভাষা, কেননা, ওর নিজের সহজ ভাষা নেই। ঊর্মির সন্দেহ রইল না যে সে অপরাধী। মহৎ ব্রত তার, অথচ তার থেকে কথায় কথায় মন আশেপাশে চলে যায়! নিজেকে কেবলই লাঞ্ছিত করে। সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে নীরদের— কী আশ্চর্য দৃঢ়তা, কী একাগ্র লক্ষ্য, সকল-প্রকার আমোদ-আহ্লাদের প্রতি কী কঠোর বিরুদ্ধতা। ঊর্মির টেবিলে গল্প কিম্বা হালকা সাহিত্যের কোনো বই যদি দেখে তবে তখনই সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন বিকেলবেলায় ঊর্মির তদারক করতে এসে শুনলে সে গেছে ইংরেজি নাট্য-শালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এরকম সুযোগ প্রায় বাদ যেত না। সেদিন নীরদ তাকে যথোচিত তিরস্কার করেছিল। অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে ইংরেজি ভাষায় বলেছিল, "দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েছ তুমি। এরই মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেছ।"

শুনে ঊর্মির অত্যন্ত পরিতাপ লাগল। ভাবলে, 'এ মানুষটার কী অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি। শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কমে আসছে— আমি নিজে তা বুঝতে পারি নি। ধিক্, এত চাপল্য আমার চরিত্রে।' সতর্ক হতে লাগল, কাপড়-চোপড় থেকে শোভার আভাস পর্যন্ত দূর করলে। শাড়িটা হল মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। দেরাজের মধ্যে জমা থাকা সত্ত্বেও চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে খুব কষে বাঁধতে লাগল সংকীর্ণ গণ্ডিতে, শুষ্ক কর্তব্যের খোঁটায়। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশে যে-সব প্রখর বিশেষণ বর্ষণ করে সেগুলোর ভাষা অভিধানবহির্ভূত উগ্র পরদেশীয়, একটুও সুশ্রাব্য নয়।

একটা জায়গায় নীরদের সঙ্গে শশাঙ্কের মেলে। শশাঙ্কের গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজি, নীরদের যখন উপদেশের বিষয়টা হয় অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর ইংরেজিই হয় তার বাহন। নীরদের সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে ঊর্মি তার দিদির ওখানে যায়। শুধু যায় তা নয়, যাবার ভারি আগ্রহ। ওদের সঙ্গে ঊর্মির যে আত্মীয়সম্বন্ধ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে।

নীরদ মুখ গম্ভীর করে একদিন ঊর্মিকে বললে, "দেখো ঊর্মি, কিছু মনে কোরো না। কী করব বলো, তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে, তাই কর্তব্যবোধে অপ্রিয় কথা বলতে হয়। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্রগঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আত্মীয়তার মোহে তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দুর্গতির সম্ভাবনা সমস্তই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।"

ঊর্মির চরিত্র বললে যে পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকি দলিল নীরদেরই সিন্ধুকে, সেই চরিত্রের কোথাও কিছু হেরফের হলে লোকসান নীরদেরই। নিষেধের ফলে ভবানীপুর অঞ্চলে ঊর্মির গতিবিধি আজকাল নানাপ্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে এসেছে। ঊর্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণশোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মতো নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে, বিজ্ঞানতপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হতে পারে।

নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করবার দুঃখটা ঊর্মির একরকম করে সয়ে আসছে। তবুও থেকে থেকে একটা বেদনা মনে দুর্বার হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা বলে সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না। নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে ওর সাধনা করে না কেন। এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে— এই সাধনার অভাবেই ওর হৃদয়ের মাধুর্য পূর্ণবিকাশের দিকে পৌঁছয় না, ওর সকল কর্তব্য নির্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক-একদিন হঠাৎ মনে হয়, যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেছে, যেন দেরি নেই, প্রাণের গভীরতম রহস্য এখনই ধরা পড়বে। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই গভীরের বেদনা যদি বা কোথাও থাকে তার ভাষা নীরদের জানা নেই। বলতে পারে না বলেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিত্তকে মূক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় বলে মনে গর্ব করে। বলে, 'সেন্টিমেণ্টালিটি করা আমার কর্ম নয়।' ঊর্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে সেও ভক্তিভরে মনে করে একেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্বল মনকে তখন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক-না কেন, মাঝে মাঝে এ কথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্তব্য নিজের ইচ্ছায় সে গ্রহণ করেছিল কালক্রমে নিজের সেই ইচ্ছা দুর্বল হয়ে আসাতে অন্যের ইচ্ছাকেই আঁকড়ে ধরেছে।

নীরদ ওকে স্পষ্ট করেই বলে, "দেখো ঊর্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে-সব স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই, এ কথা জেনে

রেখো। আমি তোমাকে যা দেব তা এই-সব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশি মূল্যবান।”

ঊর্মি মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, ‘এঁর কাছে কি কোনো কথাই লুকোনো থাকবে না।’

কিছুতে মন বাঁধতে পারে না। ছাদের উপর একলা বেড়াতে যায়। অপরাহ্নের আলো ধূসর হয়ে আসে। শহরের উঁচুনিচু নানা আকারের বাড়ির চূড়া পেরিয়ে সূর্য অস্ত যায় দূর গঙ্গার ঘাটে জাহাজগুলোর মাস্তুলের পরপ্রান্তে। নানা রঙের লম্বা লম্বা মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়। ক্রমে বেড়া যায় লুপ্ত হয়ে। চাঁদ উঠে আসে গির্জের শিখরের ঊর্ধ্বে; অনতিস্ফুট আলোতে শহর হয়ে আসে স্বপ্নের মতো, যেন অলৌকিক মায়াপুরী। মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর, সে কি এত কৃপণ। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস! হঠাৎ মনটা খেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্টুমি করতে, চেঁচিয়ে বলতে ‘আমি কিচ্ছু মানি নে’।

ঊর্মিমালা

নীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল সেটা সমাপ্ত হল। য়ুরোপের কোনো বৈজ্ঞানিক-সমাজে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে। তারা প্রশংসা করলে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কলারশিপ জুটল— স্থির করলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী নেবার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

বিদায় নেবার সময় কোনো করুণ আলাপ হল না। কেবল এই কথাটাই বারবার করে বললে যে, "আমি চলে যাচ্ছি, এখন তোমার কর্তব্যসাধনে শৈথিল্য করবে এই আমার আশঙ্কা।"

ঊর্মি বললে, "কোনো ভয় করবেন না।"

নীরদ বললে, "কিরকম ভাবে চলতে হবে, পড়াশুনো করতে হবে, তার একটা বিস্তৃত নোট দিয়ে যাচ্ছি।"

ঊর্মি বললে, "আমি ঠিক সেই অনুসারেই চলব।"

"তোমার ঐ আলমারির বইগুলি কিন্তু আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখতে চাই।"

"নিয়ে যান" বলে ঊর্মি চাবি দিল তার হাতে। সেতারটার দিকে একবার নীরদের চোখ পড়েছিল। দ্বিধা করে থেমে গেল।

অবশেষে নিতান্তই কর্তব্যের অনুরোধে নীরদকে বলতে হল, "আমার কেবল একটা ভয় আছে, শশাঙ্কবাবুদের ওখানে আবার যদি তোমার যাতায়াত ঘন ঘন হতে থাকে তা হলে তোমার নিষ্ঠা যাবে দুর্বল হয়ে, কোনো সন্দেহ নেই। মনে কোরো না আমি শশাঙ্কবাবুকে নিন্দা করি। উনি খুবই ভালো লোক। ব্যবসায়ে ও রকম উৎসাহ ও রকম বুদ্ধি কম বাঙালির মধ্যেই দেখেছি। ওর একমাত্র দোষ এই যে, উনি কোনো আইডিয়ালকেই মানেন না। সত্যি বলছি, ওর জন্যে অনেক সময়ই আমার ভয় হয়।"

এর থেকে শশাঙ্কের অনেক দোষের কথাই উঠল এবং যে-সব দোষ আজ ঢাকা পড়ে আছে সেগুলো বয়সের সঙ্গে একে একে প্রবল আকারে প্রকাশ হয়ে পড়বে এই অত্যন্ত শোচনীয় দুর্ভাবনার কথা নীরদ চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তা হোক, তবু উনি যে খুব ভালো লোক সে কথা ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে চায়। সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে চায় ওর সঙ্গদোষ থেকে, ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো ঊর্মির পক্ষে বিশেষ দরকার। ঊর্মির মন ওদের সমভূমিতে যদি নেবে যায় সেটা হবে অধঃপতন।

উর্মি বললে, "আপনি কেন এত বেশি উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন ?"

"কেন হচ্ছি শুনবে ? রাগ করবে না ?"

"সত্য কথা শোনবার শক্তি আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। জানি সহজ নয়, তবু সহ্য করতে পারি।"

"তবে বলি শোনো। তোমার স্বভাবের সঙ্গে শশাঙ্কবাবুর স্বভাবের একটা মিল আছে, এ আমি লক্ষ করে দেখেছি। তাঁর মনটা একেবারে হালকা। সেইটেই তোমাকে ভালো লাগে, ঠিক কিনা বলো।"

উর্মি ভাবে, লোকটা সর্বজ্ঞ নাকি। ভগ্নীপতিকে ওর খুব ভালো লাগে সন্দেহ নেই। তার প্রধান কারণ, শশাঙ্ক হো হো করে হাসতে পারে, উৎপাত করতে জানে, ঠাট্টা করে। আর ঠিকটি জানে উর্মি কোন্ ফুল ভালোবাসে আর কোন্ রঙের শাড়ি।

উর্মি বললে, "হাঁ, আমার ভালো লাগে সে কথা সত্যি।"

নীরদ বললে, "শর্মিলাদিদির ভালোবাসা স্নিগ্ধগম্ভীর, তাঁর সেবা যেন একটা পুণ্য-কর্ম, কখনো কর্তব্য থেকে ছুটি নেন না। তারই প্রভাবে শশাঙ্কবাবু একমনে কাজ করতে শিখেছেন। কিন্তু যেদিন তুমি ভবানীপুরে যাও সেই দিনই ওঁর যেন মুখোশ খসে পড়ে, তোমার সঙ্গে ঝুটোপুটি বেঁধে যায়, চুলের কাঁটা তুলে নিয়ে খোঁপা এলিয়ে দেন, হাতে তোমার পড়বার বই দেখলে আলমারির মাথার উপর রাখেন তুলে। টেনিস খেলবার শখ হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে, হাতে কাজ থাকলেও।"

উর্মিকে মনে মনে মানতেই হল যে, শশাঙ্কদা এইরকম দৌরাত্ম্য করেন বলেই তাঁকে ওর এত ভালো লাগে। ওর নিজের ছেলেমানুষি তাঁর কাছে এলে ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। সেও তাঁর 'পরে কম অত্যাচার করে না। দিদি ওদের দুজনের এই দুরন্তপনা দেখে তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। কখনো বা মৃদু তিরস্কারও করেন, কিন্তু সেটা তিরস্কারের ভান।

নীরদ উপসংহারে বললে, "যেখানে তোমার নিজের স্বভাব প্রশ্রয় না পায় সেইখানেই তোমার থাকা চাই। আমি কাছে থাকলে ভাবনা থাকত না, কেননা আমার স্বভাব একেবারে তোমার বিপরীত। তোমার মন রক্ষে করতে গিয়ে তোমার মনকে মাটি করা, এ আমার দ্বারা কখনোই হতে পারত না।"

উর্মি মাথা নিচু করে বললে, "আপনার কথা আমি সর্বদাই স্মরণ রাখব।"

নীরদ বললে, "আমি কতকগুলো বই তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি। তার যে-সব চ্যাপ্টারে দাগ দিয়েছি সেইগুলো বিশেষ করে পোড়ো, এর পরে কাজে লাগবে।"

ঊর্মির পক্ষে এই সাহায্যের দরকার ছিল। কেননা ইদানীং মাঝে মাঝে তার মনে কেবলই সন্দেহ আসছিল, ভাবছিল, 'হয়তো প্রথম উৎসাহের মুখে ভুল করেছি। হয়তো ডাক্তারি আমার ধাতের সঙ্গে মিলবে না।'

নীরদের দাগ-দেওয়া বইগুলো ওর পক্ষে শক্ত বাঁধনের কাজ করবে, ওকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে উজান-পথে।

নীরদ চলে গেলে ঊর্মি নিজের প্রতি আরো কঠিন অত্যাচার করলে শুরু। কলেজে যায়, আর বাকি সময় নিজেকে যেন একেবারে জেনেনার মধ্যে বন্ধ করে রাখে। সারা দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে যতই তার শ্রান্ত মন ছুটি পেতে চায় ততই সে নিষ্ঠুর-ভাবে তাকে অধ্যয়নের শিকল জড়িয়ে আটকে রাখে। পড়া এগোয় না, একই পাতার উপর বার বার করে মন বৃথা ঘুরে বেড়ায়, তবু হার মানতে চায় না। নীরদ উপস্থিত নেই বলেই তার দূরবর্তী ইচ্ছাশক্তি ওর প্রতি অধিক করে কাজ করতে লাগল।

নিজের উপর সব চেয়ে ধিক্‌কার হয় যখন কাজ করতে করতে আগেকার দিনের কথা কেবলই ফিরে ফিরে মনে আসে। যুবকদলের মধ্যে ওর ভক্ত ছিল অনেক। সেদিন তাদের কাউকে বা উপেক্ষা করেছে, কারো প্রতি ওর মনের টানও হয়েছিল। ভালোবাসা পরিণত হয় নি, কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই তখন মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তাই আপন-মনে গান গাইত গুন গুন করে, পছন্দসই কবিতা কপি করে রাখত খাতায়। মন অত্যন্ত উতলা হলে বাজাত সেতার। আজকাল এক-এক দিন সন্ধেবেলায় বইয়ের পাতায় যখন চোখ আছে তখন হঠাৎ চমকে উঠে জানতে পারে যে, তার মনে ঘুরছে এমন কোনো দিনের এমন কোনো মানুষের ছবি যে দিনকে যে মানুষকে পূর্বে সে কখনোই বিশেষভাবে আমল দেয় নি। এমন-কি, সে মানুষের অবিশ্রাম আগ্রহে সেদিন তাকে বিরক্ত করেছিল। আজ বুঝি তার সেই আগ্রহটাই নিজের ভিতরকার অতৃপ্তির বেদনাকে স্পর্শ করে করে যাচ্ছে, প্রজাপতির ক্ষণিক হালকা ডানা ফুলকে যেমন বসন্তের স্পর্শ দিয়ে যায়।

এ-সব চিন্তাকে যত বেগে সে মন থেকে দূর করতে চায় সেই বেগের প্রতিঘাতই চিন্তাগুলিকে ততই ওর মনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। নীরদের একখানা ফোটোগ্রাফ রেখেছে ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কাকে।

মনে মনে কেবলই জপ করে, 'কী প্রতিভা! কী তপস্যা! কী নির্মল চরিত্র! কী আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য!'

একটা বিষয়ে নীরদের জিত হয়েছে, সে কথাটাও বলা দরকার। নীরদের সঙ্গে ঊর্মির বিবাহের সম্বন্ধ হলে শশাঙ্ক এবং সন্দিগ্ধমনা আরো দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল। বলেছিল, রাজারামবাবু সাদা লোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট্। ওর আইডিয়ালিজম্ যে গোপনে ডিম পাড়ছে ঊর্মির টাকার থলির মধ্যে, এ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়। আপনাকে স্যাক্রিফাইস করেছে বৈকি, কিন্তু যে দেবতার কাছে তাঁর মন্দিরটা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। আমরা সোজাসুজি শ্বশুরকে জানিয়ে থাকি, টাকার দরকার আছে, আর সে টাকা জলে পড়বে না, তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগবে। ইনি মহৎ লোক, বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিয়ে করবেন। তার পরে সেই উদ্দেশ্যটাকে দিনে দিনে তর্জমা করবেন শ্বশুরের চেকবইয়ের খাতায়।

নীরদ জানত এই-রকম কথাবার্তা অপরিহার্য। ঊর্মিকে বললে, 'আমার বিয়ে করার একটা শর্ত আছে; তোমার টাকা থেকে এক পয়সা নেব না, নিজের উপার্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে।' শ্বশুর ওকে য়ুরোপে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন, ও কিছুতেই রাজি হল না। সেজন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করতেও হল। রাজারাম-বাবুকে জানিয়েছিল, হাঁসপাতাল-প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে যত টাকা দিতে চান সমস্তই দেবেন আপনার মেয়ের নামে। আমি যখন সেই হাঁসপাতালের ভার নেব তার থেকে কোনো বৃত্তি নেব না। আমি ডাক্তার, জীবিকার জন্যে আমার ভাবনা নেই।'

এই একান্ত নিস্পৃহতা দেখে ওর 'পরে রাজারামের ভক্তি দৃঢ় হল, আর ঊর্মি খুব গর্ব অনুভব করলে। এই গর্বের ন্যায্য কারণ ঘটাতেই শর্মিলার মন নীরদের 'পরে একে-বারে বিরূপ হয়ে গেল। বললে, 'ইস! দেখব দেমাক কত দিন টেঁকে!' তার পর থেকে নীরদ যখন অভ্যাসমত অত্যন্ত গভীরভাবে কথা কইত শর্মিলা আলাপের মাঝখানে হঠাৎ উঠে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত। কিছু দূর পর্যন্ত শোনা যেত তার পায়ের শব্দ। ঊর্মির খাতিরে কিছু বলত না, কিন্তু তার না-বলার ব্যঞ্জনা যথেষ্ট তেজোত্তপ্ত ছিল।

প্রথম-প্রথম নীরদ প্রতি মেলে চিঠিপত্রে চার-পাঁচ পাতা ধরে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে এসেছে। কিছু দিন পরে চমক লাগিয়ে দিলে টেলিগ্রাম। বড়ো অঙ্কের টাকার জরুরি দাবি, অধ্যয়নের প্রয়োজন। যে গর্ব এত দিন ঊর্মির প্রধান সম্বল ছিল তাতে যথেষ্ট ঘা লাগল বটে, কিন্তু মনে একটু সান্ত্বনাও পেলে। যত দিন যায় এবং নীরদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়ে ওঠে ততই ঊর্মির পূর্বস্বভাবটা কর্তব্যের বেড়ার মধ্যে

ফাঁক খুঁজে বেড়ায়। নিজেকে নানা ছলে ফাঁকিও দেয়, অনুতাপও করে। এই-রকম আত্মগ্লানির সময় নীরদকে অর্থসাহায্য ওর পরিতপ্ত মনের সান্ত্বনাজনক।

উর্মি টেলিগ্রামটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে সসংকোচে বলে, "কাকাবাবু, টাকাটা—"

ম্যানেজারবাবু বলেন, "ধাঁধা লাগছে। আমরা তো জানতুম টাকাটা ও পক্ষে অস্পৃশ্য ছিল।"

ম্যানেজার নীরদকে পছন্দ করতেন না।

উর্মি বলে, "কিন্তু বিদেশে—" কথাটা শেষ করে না।

কাকাবাবু বলেন, "এ দেশের স্বভাব বিদেশের মাটিতে বদলে যেতে পারে সে জানি— কিন্তু আমরা তার সঙ্গে তাল রাখব কী করে।"

উর্মি বলে, "টাকাটা না পেলে হয়তো বিপদে পড়তে পারেন।"

"আচ্ছা বেশ, পাঠাচ্ছি মা, তুমি বেশি ভেবো না। বলে রাখছি এই শুরু হল, কিন্তু এই শেষ নয়।"

শেষ যে নয় অনতিকাল পরেই আরো বড়ো অঙ্কে তার প্রমাণ হল। এবার প্রয়োজন স্বাস্থ্যের। ম্যানেজার গম্ভীরমুখে বললেন, "শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো।"

উর্মি শশব্যস্ত হয়ে বললে, "আর যাই কর, দিদিরা এ খবরটা যেন না পান।"

"একলা এই দায়িত্ব নিতে ভালো লাগছে না।"

"এক দিন তো টাকা তাঁর হাতেই পড়বে।"

"পড়বার আগে দেখতে হবে যেন জলে না পড়ে।"

"কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্যের কথা তো ভাবতে হবে।"

"অস্বাস্থ্য নানা জাতের আছে, এটা ঠিক কোন্ জাতের বুঝে উঠতে পারছি নে। এখানে ফিরে এলে হয়তো হাওয়ার বদলে সুস্থ হতে পারেন। ফিরতি প্যাসেঞ্জের ব্যবস্থা করে পাঠানো যাক।"

ফেরবার প্রস্তাবে উর্মি এত যে বেশি বিচলিত হয়ে উঠল, ও নিজে ভাবলে তার কারণ পাছে নীরদের উচ্চ উদ্দেশ্য মাঝখানে বাধা পায়।

কাকা বললেন, "এবারকার মতো টাকা পাঠাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে এতে ডাক্তার-বাবুর স্বাস্থ্য আরো বিগড়ে যাবে।"

রাধাগোবিন্দ উর্মির অনতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়। কাকার কথাটার ইঙ্গিত ওকে বাজল। সন্দেহ এল মনে। ভাবতে লাগল, 'দিদিকে হয়তো বলতে হবে।' এ দিকে নিজেকে ধাক্কা দিয়ে বার বার প্রশ্ন করছে, 'যথোচিত দুঃখ হচ্ছে না কেন।'

এই সময়ে শর্মিলার রোগটা নিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে দেয়। নানা ডাক্তার লাগল নানা দিক থেকে ব্যাধির আবাস-গুহাটা খুঁজে বের করতে। শর্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বললে, "সি. আই. ডি.দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে নিরপরাধ।"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বললে, "দেহটার খানাতল্লাশি চলুক শাস্ত্রমতেই, কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।"

এই সময়টাতেই শশাঙ্কর হাতে দুটো ভারী কাজ এসেছিল। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে। আর-একটা টালিগঞ্জের দিকে, মীরপুরের জমিদারের নূতন বাগানবাড়িতে। পাটকলের কুলিবস্তির কাজটা শেষ করে দেবার মেয়াদ ছিল তিন মাসের। গোটাকতক টিউবওয়েলের কাজ ছিল নানা জায়গায়। শশাঙ্কর একটুও ফুরসুত ছিল না। শর্মিলার ব্যামোটা নিয়ে প্রায় তাকে আটকা পড়তে হয়, অথচ উৎকণ্ঠা থাকে কাজের জন্যে।

এত দিন ওদের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এমন কোনো ব্যামো শর্মিলার হয় নি যা নিয়ে শশাঙ্ককে কখনো বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে। তাই এবারকার এই রোগটার উদ্‌বেগে ছেলেমানুষের মতো ছট্‌ফট্‌ করছে ওর মন। কাজ কামাই করে ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে নিরুপায়ভাবে এসে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ ?' তখনই শর্মিলা উত্তর দেয়, 'তুমি মিথ্যে ভেবো না, আমি ভালোই আছি।' সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা বলেই শশাঙ্ক অবিলম্বে বিশ্বাস করে ছুটি পায়।

শশাঙ্ক বললে, "ঢেঙ্কানলের রাজার একটা বড়ো কাজ আমার হাতে এসেছে। প্ল্যানটা নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব ডাক্তার আসবার আগেই।"

শর্মিলা অনুযোগ করে বললে, "আমার মাথার দিব্যি রইল, তাড়াতাড়ি করে কাজ নষ্ট করতে পারবে না। বুঝতে পারছি ওদের দেশে তোমার যাবার দরকার আছে। নিশ্চয় যেয়ো, না গেলে আমি ভালো থাকব না। আমাকে দেখবার লোক ঢের আছে।"

প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য গড়ে তোলবার সংকল্প দিন-রাত জাগছে শশাঙ্কের মনে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্যে নয়, বড়োত্বে। বড়ো কিছুকে গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব। অর্থ-জিনিসটাকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা চলে তখনই যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ করে তোলা যায় তখনই সর্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় বলে নয়, তার বড়োত্ব দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্তি। শর্মিলার শিয়রে বসে

শশাঙ্কর মনে যখন উদ্‌বেগ চলছে সেই মুহূর্তেই সে না ভেবে থাকতে পারে না তার কাজের সৃষ্টিতে অনিষ্টের আশঙ্কা ঘটছে কোন্‌খানে। শর্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থার নিম্নতল হতে জয়স্তম্ভ ঊর্ধ্বে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষকারের ভাবনা। শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্মিলা গৌরবান্বিত। তাই, স্বামী যে ওর রোগের সেবা নিয়ে কাজে ঢিল দেবে এ তার পক্ষে সুখের হলেও ভালোই লাগে না। ওকে বারবার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

এ দিকে নিজের কর্তব্য নিয়ে শর্মিলার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। সে রইল বিছানায় পড়ে, ঠাকুর-চাকররা কী কাণ্ড করছে কে জানে। মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্ছে খারাপ, নাবার ঘরে যথাসময়ে গরম জল দিতে ভুলেছে, বিছানার চাদর বদল করা হয় নি, নর্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়ছে না। ও দিকে ধোবার বাড়ির কাপড় ফর্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কিরকম উলটপালটা হয় সে তো জানা আছে। থাকতে পারে না, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না এ কী হল!

অবশেষে ঊর্মিমালাকে তার দিদি ডেকে পাঠালে। বললে, "কিছুদিন তোর কলেজ থাক্‌, আমার সংসারটাকে রক্ষা কর্‌ বোন। নইলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছি নে।"

এই ইতিহাসটা যাঁরা পড়ছেন এই জায়গাটাতে এসে মুচকে হেসে বলবেন 'বুঝেছি'। বুঝতে অত্যন্ত বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যা ঘটবার তাই ঘটে, আর তাই যথেষ্ট। এমনও মনে করবার হেতু নেই ভাগ্যের খেলা চলবে তাসের কাগজ গোপন করে শর্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।

'দিদির সেবা করতে চলেছি', বলে ঊর্মির মনে খুব একটা উৎসাহ হল। এই কর্তব্যের খাতিরে অন্য সমস্ত কাজকে সরিয়ে রাখতেই হবে। উপায় নেই। তা ছাড়া এই শুশ্রূষার কাজটা ওর ভাবীকালের ডাক্তারি কাজেরই সংলগ্ন, এ তর্কও তার মনে এসেছে।

ঘটা করে একটা চামড়া-বাঁধানো নোটবই নিলে। তার মধ্যে রোগের দৈনিক জোয়ার-ভাঁটার পরিমাণটাকে রেখাঙ্কিত করবার ছক কাটা আছে। ডাক্তার পাছে অনভিজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করে এইজন্যে স্থির করলে দিদির রোগ সম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় পড়ে নেবে। ওর এম. এস্‌সি. পরীক্ষার বিষয় শারীরতত্ত্ব, এইজন্যে রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না। অর্থাৎ, দিদির সেবার উপলক্ষে ওর কর্তব্যসূত্র যে ছিন্ন হবে না, বরঞ্চ আরো বেশি একান্তমনে কঠিনতর চেষ্টায় তারই অনুসরণ করা হবে, এ কথাটা মনে সে নিশ্চিত করে নিয়ে ওর পড়বার বই আর খাতাপত্র ব্যাগে পুরে ভবানীপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। দিদির ব্যামোটা নিয়ে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটা

বইটা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ঘটল না। কেননা বিশেষজ্ঞেরাও রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারলে না।

উর্মি ভাবলে, সে শাসনকর্তার কাজ পেয়েছে। তাই সে গম্ভীরমুখে দিদিকে বললে, "ডাক্তারের কথা যাতে খাটে তাই দেখবার ভার আমার উপর, আমার কথা কিন্তু মেনে চলতে হবে আমি তোমাকে বলে রাখছি।"

দিদি ওর দায়িত্বের আড়ম্বর দেখে হেসে বললে, "তাই তো, হঠাৎ এত গম্ভীর হতে শিখলে কোন্ গুরুর কাছে। নতুন দীক্ষা বলেই এত বেশি উৎসাহ। আমারই কথা মেনে চলবি বলেই তোকে আমি ডেকেছি। তোর হাঁসপাতাল তো এখনো তৈরি হয় নি, আমার ঘরকন্না তৈরি হয়েই আছে। আপাতত সেই ভারটা নে, তোর দিদি একটু ছুটি পাক।"

রোগশয্যার কাছ থেকে উর্মিকে জোর করেই দিদি সরিয়ে দিলে।

আজ দিদির গৃহরাজ্যে প্রতিনিধিপদ ওর। সেখানে অরাজকতা ঘটছে, আশু তার প্রতিবিধান চাই। এ সংসারের সর্বোচ্চ শিখরে একটিমাত্র যে পুরুষ বিরাজ করছেন তাঁর সেবায় সামান্য কোনো ত্রুটি না হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ত্যাগস্বীকার এই ঘরের ছোটো বড়ো সমস্ত অধিবাসীর একটিমাত্র সাধনার বিষয়। মানুষটি নিরতিশয় নিরুপায় এবং দেহযাত্রানির্বাহে শোচনীয়ভাবে অকর্মণ্য, এই সংস্কার কোনোমতেই শর্মিলার মন থেকে ঘুচতে চায় না। হাসিও পায়, অথচ মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে, যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আস্তিন খানিকটা পুড়েছে, অথচ লক্ষ্যই নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবার ঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে এঞ্জিনিয়র কাজের তাড়ায় দৌড় দিয়েছে বাইরে, ফিরে এসে দেখে মেজে জলে থই-থই করছে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। এই জায়গায় কলটা বসাবার সময়ে গোড়াতেই আপত্তি করেছিল শর্মিলা। জানত এই পুরুষটির হাতে বিছানার অদূরে ঐ কোণাটাতে প্রতিদিন জলে-স্থলে একটা পঙ্কিল অনাসৃষ্টি বাধবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যত-রকম অসুবিধাকে জটিল করে তুলতেই ওর উৎসাহ। খামকা কী মাথায় এল একবার, নিজের সম্পূর্ণ ওরিজিনাল প্ল্যানে একটা স্টোভ বানিয়ে বসল। তার এ দিকে দরজা, ও দিকে দরজা; এ দিকে একটা চোঙ, ও দিকে আর-একটা; এক দিকে আগুনের অপব্যয়হীন উদ্দীপন, আর-এক দিকে ঢালু পথে ছাইয়ের নিঃশেষে অধঃপতন— তার পরে সেঁকবার ভাজবার সিদ্ধ-করবার জল-গরমের নানা আকারের খোপখাপ, গুহাগহ্বর, কলকৌশল। কলটাকে উৎসাহের ভঙ্গিতে ও ভাষাতেই মেনে নিতে হয়েছিল, ব্যবহারের জন্যে নয়, শান্তি ও সদ্‌ভাব -রক্ষার জন্যে। প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই খেলা! বাধা দিলে অনর্থ বাধে,

অথচ দু দিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় মন যায় না, উদ্ভট একটা-কিছু সৃষ্টি করে, আর স্ত্রীদের দায়িত্ব হচ্ছে মুখে ওদের মতে সায় দেওয়া এবং কাজে নিজের মতে চলা। এই স্বামী-পালনের দায় এত দিন আনন্দে বহন করে এসেছে শর্মিলা।

এত কাল তো কাটল। নিজেকে বিবর্জিত করে শশাঙ্কের জগৎকে শর্মিলা কল্পনাই করতে পারে না। আজ ভয় হচ্ছে মৃত্যুর দূত এসে জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় বুঝি বা। এমন-কি, ওর আশঙ্কা যে, মৃত্যুর পরেও শশাঙ্কের দৈহিক অযত্ন শর্মিলার বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন করে রাখবে। ভাগ্যে উর্মি ছিল। সে ওর মতো শান্ত নয়। তবু ওর হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে নিচ্ছে। সে কাজও তো মেয়েদের হাতের কাজ। ঐ স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাকলে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না যে, সমস্তই যে কিরকম শ্রীহীন হয়ে যায়। তাই উর্মি যখন তার সুন্দর হাতে ছুরি নিয়ে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে রাখে, কমলালেবুর কোয়া-গুলিকে গুছিয়ে রাখে সাদা পাথরের থালার এক পাশে, বেদানা ভেঙে তার দানা-গুলিকে যত্ন করে সাজিয়ে দেয়, তখন শর্মিলা তার বোনের মধ্যে যেন নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্বদাই কাজের ফরমাশ করছে

ওর সিগারেট-কেসটা ভরে দে-না, উর্মি।

দেখছিস নে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই ?

ঐ দেখ্, জুতোটা সিমেণ্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে। বেহারাকে সাফ করতে হুকুম করবে তার হুঁশ নেই।

বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে দে-না, ভাই।

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে।

একবার আপিস-ঘরটা দেখে আসিস তো উর্মি, আমি নিশ্চয় বলছি ওঁর ক্যাশবাক্সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছেন।

ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হল, মনে থাকে যেন।

মালীকে বলিস গোলাপের ডালগুলো ছেঁটে দিতে।

ঐ দেখ্ কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে— এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও-না— উর্মি, দে তো বোন, বুরুশ ক'রে।

উর্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়, তবু ভারি মজা লাগছে। যে কড়া নিয়মের মধ্যে সে ছিল তার থেকে বেরিয়ে এসে কাজকর্ম সমস্তই ওর কাছে অনিয়মের মতোই ঠেকছে। এই সংসারের কর্মধারার ভিতরে ভিতরে যে উদ্‌বেগ আছে, সাধনা আছে, সে তো ওর মনে নেই— সেই চিন্তার সূত্রটি আছে ওর দিদির মধ্যে। তাই ওর

কাছে এই কাজগুলো খেলা, এক-রকম ছুটি, উদ্দেশ্যবিবর্জিত উদ্‌যোগ। ও যেখানে এত দিন ছিল এ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ। এখানে ওর সম্মুখে কোনো লক্ষ্য তর্জনী তুলে নেই; অথচ দিনগুলো কাজ দিয়ে পূর্ণ, সে কাজ বিচিত্র। ভুল হয়, ত্রুটি হয়, তার জন্যে কঠিন জবাবদিহি নেই। যদি বা দিদি একটু তিরস্কার করতে চেষ্টা করে শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দেয়; যেন ঊর্মির ভুলটাতেই বিশেষ একটা রস আছে। বস্তুত আজকাল ওদের ঘরকন্নাতে দায়িত্বের গাম্ভীর্য চলে গেছে; ভুলচুকে কিছু আসে যায় না এমন একটা আলগা অবস্থা ঘটেছে। এইটেই শশাঙ্কের কাছে ভারি আরামের ও কৌতুকের। মনে হচ্ছে যেন পিকনিক চলছে। আর, ঊর্মি যে কিছুতেই চিন্তিত নয়, দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়, সব-তাতেই উচ্ছ্বসিত, এতে শশাঙ্কের নিজের মন থেকে তার গুরুভার কর্মের পীড়নকে লঘু করে দেয়। কাজ শেষ হলেই, এমন-কি, না হলেও বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে ওর মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

এ কথা মানতেই হবে ঊর্মি কাজে পটু নয়। তবু একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখা গেল, কাজ দিয়ে না হোক, নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির অনেক দিনের মস্ত একটা অভাব পূরণ করেছে— সেই অভাবটা ঠিক যে কী তা নির্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই, শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের সেবায় নয়, কেবল অবকাশমাত্রে নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে। বস্তুত ঊর্মির নিজের ছুটির আনন্দ এখানকার সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করেছে, দিনরাত্রিকে চঞ্চল করে রেখেছে। সেই নিরন্তর চাঞ্চল্য কর্মক্লান্ত শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে। অপর পক্ষে শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ঊর্মিকে আনন্দ দেয়। এত কাল সেই সুখটাই ঊর্মি পায় নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুশি করতে পারে এই তথ্যটি অনেক দিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

শশাঙ্কের খাওয়া-পরা অভ্যাসমত চলছে কি না, ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসের জোগান হল কি হল না, সেটা এ বাড়ির প্রভুর মনে গৌণ হয়েছে আজ; অমনিতেই, অকারণেই আছে প্রসন্ন। শর্মিলাকে সে বলে, 'তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অভ্যাসের একটু হেরফের হলে তো অসুবিধে হয় না, সে তো ভালোই লাগে।'

শশাঙ্কের মনটা এখন জোয়ার-ভাঁটার মাঝখানকার নদীর মতো। কাজের বেগটা থম্‌থমে হয়ে এসেছে। একটু কোনো দেরিতেই বা বাধাতেই মুশকিল হবে, লোকসান

হবে, এমনতরো উদ্‌বেগের কথা সদাসর্বদা শোনা যায় না। সে-রকম কিছু প্রকাশ হলে ঊর্মি তার গাম্ভীর্য ভেঙে দেয়, হেসে ওঠে, মুখের ভাবখানা দেখে বলে, "আজ তোমার জুজু এসেছিল বুঝি, সেই সবুজ-পাগড়ি-পরা কোন্‌দেশী দালাল— ভয় দেখিয়ে গেছে বুঝি।"

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলে, "তুমি তাকে জানলে কী করে।"

"আমি তাকে খুব চিনি। তুমি সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, ও একলা বারান্দায় বসে ছিল। আমিই তাকে নানাকথা বলে ভুলিয়ে রেখেছিলুম। তার বাড়ি বিকানীয়রে; তার স্ত্রী মরেছে মশারিতে আগুন লেগে, আর-একটা বিয়ের সন্ধানে আছে।"

"তা হলে এখন থেকে হিসেব করে সে রোজ আসবে, যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। যত দিন স্ত্রীর ঠিকানা না মেলে ততদিন তার স্বপ্নটা জমবে।"

"আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে। ভাব দেখে বোধ হয় আমি পারব।"

আজকাল শশাঙ্কের মুনফার খাতায় নিরেনব্বইয়ের ওপারে যে মোটা অঙ্কগুলো চলৎ অবস্থায়, তারা মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে কান পাতবার জন্যে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ এত কাল অনভিব্যক্ত ছিল। আজকাল ঊর্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। এরোপ্লেন-ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্যন্ত যেতে হল, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান আকর্ষণ নয়। নিউমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি। এর আগে শর্মিলা মাঝে মাঝে মাছমাংস ফলমূল শাকসবজি কিনতে সেখানে যেত। সে জানত, এ কাজটা বিশেষভাবে তারই বিভাগের। এখানে শশাঙ্ক যে তার সহযোগিতা করবে এমন কথা সে কখনো মনেও করে নি, ইচ্ছেও করে নি। কিন্তু ঊর্মি তো কিনতে যায় না, কেবল জিনিসপত্র উলটেপালটে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায় তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে হাজতে রাখে।

শশাঙ্কর কাজের দরদ ঊর্মি একটুও বোঝে না। কখনো কখনো অত্যন্ত বাধা দেওয়ায় শশাঙ্কর কাছে তিরস্কার পেয়েছে। তার ফল এমন শোকাবহ হয়েছিল যে তার শোচনীয়তা অপসারণ করবার জন্যে শশাঙ্ককে দ্বিগুণ সময় দিতে হয়েছে। এক দিকে ঊর্মির চোখে বাষ্পসঞ্চার, অন্য দিকে অপরিহার্য কাজের তাড়া। তাই, সংকটে পড়ে অবশেষে বাড়ির বাইরে চেম্বারেই ওর সমস্ত কাজকর্ম সেরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাহ্ণ পেরোলেই সেখানে থাকা দুঃসহ হয়ে ওঠে। কোনো কারণে যেদিন বিশেষ দেরি করে সেদিন ঊর্মির অভিমান দুর্ভেদ্য মৌনের অন্তরালে দুরভিভব হয়ে ওঠে।

এই রুদ্ধ অশ্রুতে কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিমানটা ভিতরে ভিতরে শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়। ভালোমানুষটির মতো বলে, 'উর্মি, কথা কইবে না এ সত্যাগ্রহ রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু দোহাই ধর্ম, খেলবে না এমন পণ তো ছিল না।' তার পরে টেনিস-ব্যাট হাতে করে চলে আসে। খেলায় শশাঙ্ক জিতের কাছাকাছি এসে ইচ্ছে করেই হারে। নষ্ট সময়ের জন্যে আবার পরের দিন সকালে উঠেই অনুতাপ করতে থাকে।

কোনো-একটা ছুটির দিনে বিকালবেলায় শশাঙ্ক যখন ডান হাতে লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে বাঁ আঙুলগুলো দিয়ে অকারণে চুল উস্‌কোখুস্‌কো করতে করতে আপিসের ডেস্কে বসে কোনো-একটা দুঃসাধ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েছে, উর্মি এসে বলে, "তোমার সেই দালালের সঙ্গে ঠিক করেছি আজ আমাকে পরেশনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। চলো আমার সঙ্গে। লক্ষ্মীটি।"

শশাঙ্ক মিনতি করে বলে, "না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।"

কাজের গুরুত্বে উর্মি একটুও ভয় পায় না। বলে, "অবলা রমণীকে অরক্ষিত অবস্থায় সবুজ-পাগড়ি-ধারীর হাতে সমর্পণ করে দিতে সংকোচ নেই, এই বুঝি তোমার শিভল্‌রি!"

শেষকালে ওর টানাটানিতে শশাঙ্ক কাজ ফেলে যায় মোটর হাঁকিয়ে। এই-রকম উৎপাত চলছে টের পেলে শর্মিলা বিষম বিরক্ত হয়। কেননা, ওর মতে পুরুষের সাধনার ক্ষেত্রে মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ কোনোমতেই মার্জনীয় নয়। উর্মিকে শর্মিলা বরাবর ছেলেমানুষ বলেই জেনেছে। আজও সেই ধারণাটা ওর মনে আছে। তা হোক, তাই বলে আপিস-ঘর তো ছেলেখেলার জায়গা নয়। তাই, উর্মিকে ডেকে যথেষ্ট কঠিনভাবেই তিরস্কার করে। সে তিরস্কারের নিশ্চিত ফল হতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে শশাঙ্ক স্বয়ং দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে উর্মিকে আশ্বাস দিয়ে চোখ টিপতে থাকে। তাসের প্যাক দেখিয়ে ইশারা করে, ভাবখানা এই যে, 'চলে এসো, আপিস-ঘরে বসে তোমাকে পোকার খেলা শেখাব।' এখন খেলার সময় একেবারেই নয়, এবং খেলবার কথা মনে আনবারও সময় ও অভিপ্রায় ওর ছিল না। কিন্তু দিদির কঠোর ভর্ৎসনায় উর্মির মনে বেদনা লাগছে, এটা তাকে যেন উর্মির চেয়েও বেশি বাজে। ও নিজেই তাকে অনুনয়, এমন-কি, ঈষৎ তিরস্কার করে কাজের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু শর্মিলা যে এই নিয়ে উর্মিকে শাসন করবে এইটে সহ্য করা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

শর্মিলা শশাঙ্ককে ডেকে বলে, "তুমি ওর সব আবদার এমন করে শুনলে চলবে কেন। সময় নেই, অসময় নেই, তোমার কাজের লোকসান হয় যে।"

শশাঙ্ক বলে, "আহা ছেলেমানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধুলো না পেলে বাঁচবে কেন।"

এই তো গেল নানাপ্রকার ছেলেমানুষি। ও দিকে শশাঙ্ক যখন বাড়ি-তৈরির প্ল্যান নিয়ে পড়ে, ও তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে বলে 'বুঝিয়ে দাও'। সহজেই বোঝে, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক ভারি খুশি হয়ে উঠে ওকে প্রব্লেম দেয়, ও কষে নিয়ে আসে। জুট কোম্পানির স্টীমলঞ্চে শশাঙ্ক কাজ তদন্ত করতে যায়, ও ধরে বসে 'আমিও যাব'। শুধু যায় তা নয়, মাপজোখের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি। এখন তাই চেম্বারের কাজ যখন বাড়িতে নিয়ে আসে তা নিয়ে ওর মনে আশঙ্কা থাকে না। লাইন টানা, আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেছে। ঊর্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। খুব দ্রুত বেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

এইখানটাতে শর্মিলাকে রীতিমত ধাক্কা দেয়। ঊর্মির ছেলেমানুষিও সে বোঝে, তার গৃহিণীপনার ত্রুটিও সস্নেহে সহ্য করে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছিল— সেখানে ঊর্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়েই এক দিন ওকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঊর্মি, তোর কি ঐ-সব আঁকাজোখা, আঁক কষা, ট্রেস করা সত্যিই ভালো লাগে?"

"আমার ভারি ভালো লাগে, দিদি।"

শর্মিলা অবিশ্বাসের সুরে বললে, "হাঁঃ ভালো লাগে! ওকে খুশি করবার জন্যই দেখাস যেন ভালো লাগে।"

নাহয় তাই হল। খাওয়ানো পরানো সেবা যত্নে শশাঙ্ককে খুশি করাটা তো শর্মিলার মনঃপূত। কিন্তু এই জাতের খুশিটা ওর নিজের খুশির জাতের সঙ্গে মেলে না।

শশাঙ্ককে বার বার ডেকে বলে, "ওকে নিয়ে সময় নষ্ট কর কেন? ওতে যে তোমার কাজের ক্ষতি হয়। ও ছেলেমানুষ, এ-সব কী বুঝবে?"

শশাঙ্ক বলে, "আমার চেয়ে কম বোঝে না।"

মনে করে এই প্রশংসায় দিদিকে বুঝি আনন্দ দেওয়াই হল। নির্বোধ!

নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন আপন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল তখন শর্মিলা সেটা যে শুধু অগত্যা মেনে নিয়েছিল তা নয়, তাতে সে গর্ব

বোধ করত। তাই, ইদানীং আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে। ও বলত, পুরুষমানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নিচু হয়ে যায়। কেননা, মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্যে, ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্যেই, সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকে সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ যুদ্ধের দ্বারা। সে কালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত। রাজ্য-লোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে। এই গৌরবে মেয়েরা যেন বাধা না দেয়। শর্মিলা বাধা দেয় নি, ইচ্ছা করেই শশাঙ্ককে তার লক্ষ্য-সাধনায় সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়েছে। এক সময়ে তাকে ওর সেবাজালে জড়িয়ে ফেলেছিল, মনে দুঃখ পেলেও সেই জালকে ক্রমশ খর্ব করে এনেছে। এখনো সেবা যথেষ্ট করে, অদৃশ্যে, নেপথ্যে।

হায় রে, আজ ওর স্বামীর এ কী পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। রোগ-শয্যা থেকে সব ও দেখতে পায় না, কিন্তু যথেষ্ট আভাস পায়। শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে, সে যেন সর্বদাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই ক'দিনেই এত বড়ো সাধনার আসন থেকে ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে। আজ স্বামার এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও বেশি করে বাজছে।

শশাঙ্কের আহারবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানা-রকম ত্রুটি হচ্ছে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা তার বিশেষ রুচিকর সেটাই খাবার সময় হঠাৎ দেখা যায় অবর্তমান। তার কৈফিয়ত মেলে, কিন্তু কোনো কৈফিয়তকে এ সংসার এত দিন আমল দেয় নি। এ-সব অনবধানতা ছিল অমার্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য; সেই বিধিবদ্ধ সংসারে আজ এত বড়ো যুগান্তর ঘটেছে যে, গুরুতর ত্রুটিগুলোও প্রহসনের মতো হয়ে উঠল। দোষ দেবে কাকে! দিদির নির্দেশমত ঊর্মি যখন রান্নাঘরে বেতের মোড়ার উপর বসে পাকপ্রণালীর পরিচালনকার্যে নিযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে পাচক-ঠাকরুনের পূর্বজীবনের বিবরণগুলির পর্যালোচনাও চলছে, এমন সময় শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে, "ও-সব এখন থাক্।"

"কেন, কী করতে হবে?"

"আমার এ বেলা ছুটি আছে, চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিলডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।"

এত বড়ো প্রলোভনে কর্তব্যে ফাঁকি দিতে ঊর্মির মনও তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে।

শর্মিলা জানে পাকশালা থেকে তার সহোদরার অন্তর্ধানে আহার্যের উৎকর্ষ-সাধনে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না, তবু স্নিগ্ধ হৃদয়ের যত্নটুকু শশাঙ্কের আরামকে অলংকৃত করে। কিন্তু আরামের কথা তুলে কী হবে যখন প্রতিদিনই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েছে খুশি।

এই দিক থেকে শর্মিলার মনে এল অশান্তি। রোগশয্যায় এ-পাশ ও-পাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে বার বার করে বলছে, 'মরবার আগে ঐ কথাটুকু বুঝে গেলুম। আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারি নি। ভেবেছিলুম ঊর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে।' জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, 'আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।'

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসছে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দেওয়া চাই। ঊর্মি তখন শশাঙ্কের সঙ্গে পিংপং খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বললে, "ঊর্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।"

ঊর্মি আলমারিতে চাবি সবেমাত্র লাগিয়েছে এমন সময় শশাঙ্ক এসে বললে, "ও-সব পরে হবে, ঢের সময় আছে। খেলাটা শেষ করে যাও।"

"কিন্তু দিদি—"

"আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসছি।"

দিদি ছুটি দিলে, সেইসঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

দাসীকে ডেকে বললে, "দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি।"

যদিও অনেক দিন পরে হঠাৎ ঊর্মি ছাড়া পেয়ে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তবু সহসা এক-এক দিন মনে পড়ত ওর জীবনের কঠিন দায়িত্ব। ও তো স্বাধীন নয়, ও যে বাঁধা ওর ব্রতের সঙ্গে। তারই সঙ্গে মিলিয়ে যে বাঁধন ওকে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বেঁধেছে তার অনুশাসন আছে ওর 'পরে। ওর দৈনিক কর্তব্যের খুঁটিনাটি সেই তো স্থির করে দিয়েছে। ওর জীবনের 'পরে তার চিরকালের অধিকার, এ কথা ঊর্মি কোনোমতে অস্বীকার করতে পারে না। যখন নীরদ উপস্থিত ছিল স্বীকার করা সহজ ছিল, জোর পেত মনে। এখন ওর ইচ্ছে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে, অথচ কর্তব্যবুদ্ধি তাড়া দিচ্ছে। কর্তব্যবুদ্ধির অত্যাচারেই মন আরো যাচ্ছে বিগড়িয়ে। নিজের অপরাধ ক্ষমা

করা কঠিন হয়ে উঠল বলেই অপরাধ প্রশ্রয় পেতে লাগল। বেদনায় আফিমের প্রলেপ দেবার জন্যে শশাঙ্কের সঙ্গে খেলায় আমোদে নিজেকে সর্বক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বলে, যখন সময় আসবে তখন আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন যে-কয়দিন ছুটি ও-সব কথা থাক্। আবার হঠাৎ এক-এক দিন মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গুঁজে বসে। তখন শশাঙ্কর পালা। বইগুলো টেনে নিয়ে পুনরায় বাক্সজাত ক'রে সেই বাক্সর উপর সে চেপে বসে। উর্মি বলে, "শশাঙ্কদা, ভারি অন্যায়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।"

শশাঙ্ক বলে, "তোমার সময় নষ্ট করতে গেলে আমারও সময় নষ্ট। অতএব শোধ-বোধ।"

তার পরে খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির চেষ্টা করে অবশেষে উর্মি হার মানে। সেটা যে ওর পক্ষে নিতান্ত আপত্তিজনক তা মনে হয় না। এই-রকম বাধা পেলেও কর্তব্যবুদ্ধির পীড়ন দিন পাঁচ-ছয় একাদিক্রমে চলে, তার পরে আবার তার জোর কমে যায়। বলে, "শশাঙ্কদা, আমাকে দুর্বল মনে কোরো না। মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেছি।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, এখানে ডিগ্রি নিয়ে য়ুরোপে যাব ডাক্তারি শিখতে।"

"তার পরে?"

"তার পরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তার ভার নেব।"

"আর কার ভার নেবে। ঐ-যে নীরদ মুখুজ্জে বলে একটা ইনসাফারেব্‌ল্‌—"

শশাঙ্কের মুখ চাপা দিয়ে উর্মি বলে, "চুপ করো। এই-সব কথা বল যদি তোমার সঙ্গে একেবারে ঝগড়া হয়ে যাবে।"

নিজেকে উর্মি খুব কঠিন করে বলে, 'সত্য হতে হবে আমাকে, সত্য হতে হবে।' নীরদের সঙ্গে ওর যে সম্বন্ধ বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েছেন তার প্রতি খাঁটি না হতে পারাকে ও অসতীত্ব বলে মনে করে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, অপর পক্ষ থেকে কোনো জোর পায় না। উর্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিকে আঁকড়ে আছে, কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত, পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। এক-এক সময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; মনে মনে ভাবে, এ মানুষটা চিঠির মতো চিঠি লিখতে পারে না কেন।

উর্মি অনেক কাল কন্‌ভেণ্টে পড়েছে। আর-কিছু না হোক ইংরেজিতে ওর বিদ্যে পাকা। সে কথা নীরদের জানা ছিল। সেইজন্যেই, ইংরেজি লিখে নীরদ ওকে অভিভূত করবে এই ছিল তার পণ। বাংলায় চিঠি লিখলে বিপদ বাঁচত, কিন্তু নিজের

সম্বন্ধে বেচারা জানে না যে সে ইংরেজি জানে না। ভারী ভারী শব্দ জুটিয়ে এনে, পুঁথিগত দীর্ঘপ্রস্থ বচন যোজনা ক'রে, ওর বাক্যগুলোকে করে তুলত বস্তা-বোঝাই গোরুর গাড়ির মতো। ঊর্মির হাসি আসত, কিন্তু হাসতে সে লজ্জা পেত; নিজেকে তিরস্কার করে বলত, বাঙালির ইংরেজিতে ত্রুটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ।

দেশে থাকতে মোকাবিলায় যখন নীরদ ক্ষণে ক্ষণে সদুপদেশ দিয়েছে তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেছে গৌরবে। যতটা কানে শোনা যেত তার চেয়ে আন্দাজে তার ওজন হত বেশি। কিন্তু লম্বা চিঠিতে আন্দাজের জায়গা থাকে না। কোমর-বাঁধা ভারী ভারী কথা হালকা হয়ে যায়, মোটা মোটা আওয়াজেই ধরা পড়ে বলবার বিষয়ের কম্‌তি।

নীরদের যে ভাবটা কাছে থাকতে ও সয়ে গিয়েছিল সেইটে দূরের থেকে ওকে সব চেয়ে বাজে। লোকটা একেবারেই হাসতে জানে না। চিঠিতে সব চেয়ে প্রকাশ পায় সেই অভাবটা। এই নিয়ে শশাঙ্কের সঙ্গে তুলনা ওর মনে আপনিই এসে পড়ে।

তুলনার একটা উপলক্ষ এই সেদিন হঠাৎ ঘটেছে। কাপড় খুঁজতে গিয়ে বাক্সের তলা থেকে বেরোল পশমে-বোনা একপাটি অসমাপ্ত জুতো। মনে পড়ে গেল চার বছর আগেকার কথা। তখন হেমন্ত ছিল বেঁচে। ওরা সকলে মিলে গিয়েছিল দার্জিলিঙে। আমোদের অন্ত ছিল না। হেমন্তে আর শশাঙ্কে মিলে ঠাট্টাতামাশার পাগলা ঝোরা বইয়ে দিয়েছিল। ঊর্মি তার এক মাসির কাছ থেকে পশমের কাজ নতুন শিখেছে। জন্মদিনে দাদাকে দেবে বলে একজোড়া জুতো বুনছিল। তা নিয়ে শশাঙ্ক ওকে কেবলই ঠাট্টা করত; বলত, "দাদাকে আর যাই দাও, জুতো নয়। ভগবান মনু বলেছেন ওতে গুরুজনের অসম্মান হয়।"

ঊর্মি কটাক্ষ করে বলেছিল, "ভগবান মনু তবে কাকে প্রয়োগ করতে বলেন।"

শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে বললে, "অসম্মানের সনাতন অধিকার ভগ্নীপতির। আমার পাওনা আছে। সেটা সুদে ভারী হয়ে উঠল।"

"মনে তো পড়ছে না।"

"পড়বার কথা নয়, তখন ছিলে নিতান্ত নাবালিকা। সেই কারণেই তোমার দিদির সঙ্গে শুভলগ্নে যেদিন এই সৌভাগ্যবানের বিবাহ হয়, সেদিন বাসররজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করতে পার নি। আজ সেই কোমল করপল্লবের অরচিত কান-মলাটাই রূপ গ্রহণ করছে সেই করপল্লবরচিত জুতোযুগলে। ওটার প্রতি আমার দাবি রইল জানিয়ে রেখে দিলুম।"

দাবি শোধ হয় নি, সে জুতো যথাসময়ে প্রণামীরূপে নিবেদিত হয়েছিল দাদার চরণে।

তার পর কিছুকাল পরে শশাঙ্কর কাছ থেকে ঊর্মি একখানি চিঠি পেল। পেয়ে খুব হেসেছে সে। সেই চিঠি আজও তার বাক্সে আছে। আজ খুলে সে আবার পড়লে—

কাল তো তুমি চলে গেলে। তোমার স্মৃতি পুরাতন হতে না হতে তোমার নামে একটা কলঙ্ক রটনা হয়েছে, সেটা তোমার কাছে গোপন করা অকর্তব্য মনে করি।

আমার পায়ে একজোড়া তালতলীয় চটি অনেকেই লক্ষ করেছে। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ করেছে তার ছিদ্র ভেদ করে আমার চরণনখরপঙ্‌ক্তি মেঘমুক্ত চন্দ্রমালার মতো। (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল দ্রষ্টব্য। উপমার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।) আজ সকালে আমার আপিসের বৃন্দাবন নন্দী যখন আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে তখন আমার পদমর্যাদায় যে বিদীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তারই অগৌরব মনে আন্দোলিত হল। সেবককে জিজ্ঞাসা করলেম, 'মহেশ, আমার সেই অন্য নূতন চটিজোড়াটা গতিলাভ করেছে অন্য কোন্ অনধিকারীর শ্রীচরণে।' সে মাথা চুলকিয়ে বললে, 'ও বাড়ির ঊর্মিমাসিদের সঙ্গে আপনিও যখন দার্জিলিঙ যান সেই সময়ে চটিজোড়াটাও গিয়েছিল। আপনি ফিরে এসেছেন সেইসঙ্গে ফিরে এসেছে তার একপাটি, আর-এক পাটি—' তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, 'ব্যস, চুপ।' সেখানে অনেক লোক ছিল। চটিজুতো-হরণ হীনকার্য। কিন্তু মানুষের মন দুর্বল, লোভ দুর্দম, এমন কাজ করে ফেলে, ঈশ্বর বোধ করি ক্ষমা করেন। তবু অপহরণ-কাজে বুদ্ধির পরিচয় থাকলে দুষ্কার্যের গ্লানি অনেকটা কাটে। কিন্তু একপাটি চটি !!! ধিক্ !!!

যে এ কাজ করেছে, যথাসাধ্য তার নাম আমি উহ্য রেখেছি। সে যদি তার স্বভাবসিদ্ধ মুখরতার সঙ্গে এই নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করে তা হলে কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাবে। চটি নিয়ে চটাচটি সেইখানেই খাটে যেখানে মন খাঁটি। মহেশের মতো নিন্দুকের মুখ বন্ধ এখনই করতে পার একজোড়া শিল্পকার্যখচিত চটির সাহায্যে। যেমন তার আস্পর্ধা !

পায়ের মাপ এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি।

চিঠিখানা পেয়ে ঊর্মি স্মিতমুখে পশমের জুতো বুনতে বসেছিল, কিন্তু শেষ করে নি। পশমের কাজে আর তার উৎসাহ ছিল না। আজ এটা আবিষ্কার করে স্থির করলে এই অসমাপ্ত জুতোটাই দেবে শশাঙ্ককে সেই দার্জিলিঙযাত্রার সাম্বৎসরিক দিনে। সেদিন আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আসছে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল— হায় রে কোথায়

সেই হাস্যোজ্জ্বল আকাশে হালকা পাখায় উড়ে-যাওয়া দিনগুলি! এখন থেকে সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যকঠোর মরুজীবন।

আজ ২৬শে ফাল্গুন। হোলিখেলার দিন। মফঃস্বলের কাজে এ খেলায় শশাঙ্কের সময় ছিল না, এ দিনের কথা তারা ভুলেই গেছে। ঊর্মি আজ তার শয্যাগত দিদির পায়ে আবীরের টিপ দিয়ে প্রণাম করেছে। তার পরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলে, শশাঙ্ক আপিস-ঘরের ডেস্কে ঝুঁকে পড়ে একমনে কাজ করছে। পিছন থেকে গিয়ে দিলে তার মাথায় আবীর মাখিয়ে, রাঙিয়ে উঠল তার কাগজপত্র। মাতামাতির পালা পড়ে গেল। ডেস্কে ছিল দোয়াতে লাল কালি। শশাঙ্ক দিলে ঊর্মির শাড়িতে ঢেলে। হাত চেপে ধরে তার আঁচল থেকে ফাগ কেড়ে নিয়ে ঊর্মির মুখে দিলে ঘষে, তার পরে দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি। বেলা যায় চলে, স্নানাহারের সময় যায় পিছিয়ে, ঊর্মির উচ্চহাসির স্বরোচ্ছ্বাসে সমস্ত বাড়ি মুখরিত। শেষকালে শশাঙ্কের অস্বাস্থ্য-আশঙ্কায় দূতের পরে দূত পাঠিয়ে শর্মিলা এদের নিবৃত্ত করলে।

দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে পূর্ণচাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় ঝর্‌ঝর্‌ শব্দে দোলাদুলি করে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছপালা, তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানলার কাছে ঊর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবী-লতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে কিছুক্ষণ পরে স্বপ্ন-জড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙেছে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারিগাছের বীথিকা। ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না। উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না— ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে, কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা?

সকালে ঊর্মি যখন ঘুম ভেঙে উঠল তখন ঘরের মধ্যে রৌদ্র এসে পড়েছে। সকাল-বেলাকার কাজে ফাঁক পড়ল, ক্লান্তির কথা মনে করে শর্মিলা ওকে ক্ষমা করেছে। কিসের অনুতাপে ঊর্মি আজ অবসন্ন। কেন মনে হচ্ছে, ওর হার হতে চলল। দিদিকে

গিয়ে বললে, "দিদি, আমি তো তোমার কোনো কাজ করতেই পারি নে— বল তো বাড়ি ফিরে যাই!"

আজ তো শর্মিলা বলতে পারলে না 'না, যাস নে'। বললে, "আচ্ছা, যা তুই। তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে। যখন মাঝে মাঝে সময় পাবি দেখে-শুনে যাস।"

শশাঙ্ক তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। সেই অবকাশে সেই দিনই ঊর্মি বাড়ি চলে গেল।

শশাঙ্ক সেদিন যান্ত্রিক ছবি আঁকার এক-সেট সরঞ্জাম কিনে বাড়ি ফিরলে। ঊর্মিকে দেবে, কথা ছিল তাকে এই বিদ্যেটা শেখাবে। ফিরে এসে তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে শর্মিলার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, "ঊর্মি গেল কোথায়।"

শর্মিলা বললে, "এখানে তার পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছে বলে সে বাড়ি চলে গেছে।"

"কিছু দিন অসুবিধে করবে বলে সে তো প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। অসুবিধের কথা হঠাৎ আজই মনে উঠল কেন।"

কথার সুর শুনে শর্মিলা বুঝলে শশাঙ্ক তাকেই সন্দেহ করছে। সে সম্বন্ধে কোনো বৃথা তর্ক না করে বললে, "আমার নাম করে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এসো, নিশ্চয় কোনো আপত্তি করবে না।"

ঊর্মি বাড়িতে ফিরে এসে দেখলে, অনেক দিন পরে বিলেত থেকে ওর নামে নীরদের চিঠি এসে অপেক্ষা করছে। ভয়ে খুলতেই পারছিল না। মনে জানে, নিজের তরফে অপরাধ জমা হয়ে উঠেছে। নিয়মভঙ্গের কৈফিয়ত-স্বরূপ এর আগে দিদির রোগের উল্লেখ করেছিল। কিছু দিন থেকে কৈফিয়তটা প্রায় এসেছে মিথ্যে হয়ে। শশাঙ্ক বিশেষ জেদ করে শর্মিলার জন্যে দিনে একজন রাত্রে একজন নার্স নিযুক্ত করে দিয়েছে। ডাক্তারের বিধান-মতে রোগীর ঘরে সর্বদা আত্মীয়দের আনাগোনা তারা রোধ করে। ঊর্মি মনে জানে নীরদ দিদির রোগের কৈফিয়তটাকেও গুরুতর মনে করবে না; বলবে, 'ওটা কোনো কাজের কথা নয়।' বস্তুতই কাজের কথা নয়— 'আমাকে তো দরকার হচ্ছে না'। অনুতপ্ত চিত্তে স্থির করলে, 'এবারে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। বলব, আর কখনো ত্রুটি হবে না, কিছুতে নিয়মভঙ্গ করব না।'

চিঠি খোলবার আগে অনেক দিন পরে আবার বের করলে সেই ফোটোগ্রাফখানা। টেবিলের উপর রেখে দিলে। জানে ঐ ছবিটা দেখলে শশাঙ্ক খুব বিদ্রূপ করবে। তবু ঊর্মি কিছুতেই কুণ্ঠিত হবে না তার বিদ্রূপে; এই তার প্রায়শ্চিত্ত। নীরদের সঙ্গে ওর বিবাহ হবে এই প্রসঙ্গটা দিদিদের বাড়িতে ও চাপা দিত। অন্যেরাও তুলত না;

কেননা এ প্রসঙ্গটা ওখানকার সকলের অপ্রিয়। আজ হাত মুঠো করে উর্মি স্থির করলে— ওর সকল ব্যবহারেই এই সংবাদটা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করবে। কিছু দিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এন্‌গেজমেন্ট্‌ আংটি। সেটা বের করে পরলে। আংটিটা নিতান্তই কম দামের— নীরদ আপন অনেস্ট্‌ গরিবিয়ানার গর্বের দ্বারাই ঐ সস্তা আংটির দাম হীরের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবখানা এই যে, 'আংটির দামেই আমার দাম নয়, আমার দামেই আংটির দাম।'

নিজেকে যথাসাধ্য শোধন করে নিয়ে উর্মি অতি ধীরে লেফাফাটা খুললে।

চিঠিখানা পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ইচ্ছা করল নাচতে, কিন্তু নাচ ওর অভ্যাস নেই। সেতারটা ছিল বিছানার উপর, সেটা তুলে নিয়ে সুর না বেঁধেই ঝনাঝন ঝংকার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।

ঠিক এমন সময়ে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপারখানা কী। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল বুঝি ?"

"হাঁ শশাঙ্কদা, স্থির হয়ে গেছে।"

"কিছুতেই নড়চড় হবে না ?"

"কিছুতেই না।"

"তা হলে এইবেলা সানাই বায়না দিই, আর ভীমনাগের সন্দেশ ?"

"তোমাকে কোনো চেষ্টা করতে হবে না।"

"নিজেই সব করবে ? ধন্য বীরাঙ্গনা। আর, কনেকে আশীর্বাদ ?"

"সে আশীর্বাদের টাকাটা আমার নিজের পকেট থেকেই গেছে।"

"মাছের তেলেই মাছভাজা ? ভালো বোঝা গেল না।"

"এই নাও, বুঝে দেখো।"

বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

পড়ে শশাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

লিখছে : যে রিসার্চের দুরূহ কাজে নীরদ আত্মনিবেদন করতে চায় ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই ওর জীবনে আর-একটা মস্ত স্যাক্রিফাইস মেনে নিতে হল। উর্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলে উপায় নেই। একজন য়ুরোপীয় মহিলা ওকে বিবাহ করে ওর কাজে আত্মদান করতে সম্মত। কিন্তু কাজটা সেই একই, ভারতবর্ষেই করা হোক আর এখানেই। রাজারামবাবু যে কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন তার কিয়দংশ সেখানে নিযুক্ত করলে অন্যায় হবে না। তাতে মৃতব্যক্তির 'পরে সম্মান করাই হবে।

শশাঙ্ক বললে, "জীবিত ব্যক্তিটাকে কিছু কিছু দিয়ে যদি সেই দূরদেশেই দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখতে পার তো মন্দ হয় না। টাকা বন্ধ করলে পাছে খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে এখানে দৌড়ে আসে এই ভয় আছে।"

উর্মি হেসে বললে, "সে ভয় যদি তোমার মনে থাকে টাকা তুমিই দিয়ো, আমি এক পয়সাও দেব না।"

শশাঙ্ক বললে, "আবার তো মন বদল হবে না? মানিনীর অভিমান তো অটল থাকবে?"

"বদল হলে তোমার তাতে কী শশাঙ্কদা!"

"প্রশ্নের সত্য উত্তর দিলে অহংকার বেড়ে যাবে, অতএব তোমার হিতের জন্যে চুপ করে রইলুম। কিন্তু ভাবছি, লোকটার গণ্ডদেশ তো কম নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে চীক্।"

উর্মির মনের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড একটা ভার নেমে গেল— বহু দিনের ভার। মুক্তির আনন্দে ও কী যে করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। ওর সেই কাজের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। গলিতে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, জানলা থেকে আংটিটা ছুঁড়ে ফেললে তার দিকে।

জিজ্ঞাসা করলে, "এই পেন্‌সিলের দাগ দেওয়া মোটা বইগুলো কি কোনো হকার কিনবে।"

"নাই যদি কেনে, তার ফলাফলটা কী আগে শুনি।"

"যদি ওর মধ্যে সাবেক কালের ভূতটা বাসা করে, মাঝে মাঝে অর্ধেক রাত্রে তর্জনী তুলে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।"

"সে আশঙ্কা যদি থাকে হকারের অপেক্ষা করব না, আমি নিজেই কিনব।"

"কিনে কী করবে।"

"হিন্দুশাস্ত্রমতে অন্ত্যেষ্টিসৎকার। গয়া পর্যন্ত যেতে রাজি, তাতে যদি তোমার মন সান্ত্বনা পায়।"

"না, অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না।"

"আচ্ছা, আমার লাইব্রেরির কোণে পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।"

"আজ কিন্তু তুমি কাজে বেরোতে পাবে না।"

"সমস্ত দিন?"

"সমস্ত দিনই।"

"কী করতে হবে।"

"মোটরে করে উধাও হয়ে যাব।"

"দিদির কাছে ছুটি নিয়ে এসো গে।"

"না, ফিরে এসে দিদিকে বলব, তখন খুব বকুনি খাব। সে বকুনি সইবে।"

"আচ্ছা, আমিও তোমার দিদির বকুনি হজম করতে রাজি। টায়ার যদি ফাটে দুঃখিত হব না। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে দুটো-চারটে মানুষ চাপা দিয়ে একেবারে জেলখানা পর্যন্ত পৌঁছতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিন সত্যি দাও যে, মোটর-রথযাত্রা সাঙ্গ করে আমাদেরই বাড়িতে তুমি ফিরে আসবে।"

"আসব, আসব, আসব।"

মোটর-যাত্রার শেষে ভবানীপুরের বাড়িতে দুজনে এল, কিন্তু ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ রক্ত থেকে এখনো কিছুতেই থামতে চায় না। সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয়লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কয়দিন শশাঙ্কের সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনের ভিতরে ভিতরে সে বুঝেছে যে, এটা ভালো হচ্ছে না। কাজের ক্ষতি খুব গুরুতর হওয়াও অসম্ভব নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার সে স্বাধিকারপ্রমত্ত, মেঘদূতের যক্ষের মতন। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।

শশাঙ্ক

কিছু কাল এই-রকম যায়। লাগল চোখে ঘোর, মন উঠল আবিল হয়ে।

নিজেকে সুস্পষ্ট বুঝতে উর্মির সময় লেগেছে, কিন্তু এক দিন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝলে।

মথুরদাদাকে উর্মি কী জানি কেন ভয় করত, এড়িয়ে বেড়াত তাকে। সেদিন মথুর সকালে দিদির ঘরে এসে বেলা তুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে গেল।

তার পরে দিদি উর্মিকে ডেকে পাঠালে। মুখ তার কঠোর, অথচ শান্ত। বললে, "প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস জানিস তা?"

উর্মি ভয় পেয়ে গেল। বললে, "কী হয়েছে দিদি।"

দিদি বললে, "মথুরদাদা জানিয়ে গেল, কিছু দিন ধরে তোর ভগ্নীপতি নিজে কাজ একেবারে দেখেন নি। জহরলালের উপরে ভার দিয়েছিলেন; সে মালমসলায় তুহাত চালিয়ে চুরি করেছে। বড়ো বড়ো গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁজরা; সেদিনকার বৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মাল যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। আমাদের কোম্পানির মস্ত নাম,তাই ওরা পরীক্ষা করে নি, এখন মস্ত অখ্যাতি এবং লোকসানের দায় পড়েছে ঘাড়ে। মথুরদাদা স্বতন্ত্র হবেন।"

উর্মির বুক ধক্ করে উঠল, মুখ হয়ে গেল পাঁশের মতো। এক মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় আপন মনের প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রকাশ পেলে। স্পষ্ট বুঝলে, কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মাতাল হয়ে, ভালোমন্দ কিছুই বিচার করতে পারে নি। শশাঙ্কর কাজটাই যেন ছিল তার প্রতিযোগী, তারই সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সর্বদা সম্পূর্ণ কাছে পাবার জন্যে উর্মি কেবল ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্ করত। কত দিন এমন ঘটেছে, শশাঙ্ক যখন স্নানে এমন সময় কাজের কথা নিয়ে লোক এসেছে; উর্মি কিছু না ভেবে বলে পাঠিয়েছে, "বল্ গে, এখন দেখা হবে না।"

ভয়, পাছে স্নান করে এসেই শশাঙ্ক আর অবকাশ না পায়, পাছে এমন করে কাজে জড়িয়ে পড়ে যে উর্মির দিনটা হয় ব্যর্থ। তার তুরন্ত নেশার সাংঘাতিক ছবিটা সম্পূর্ণ চোখে জেগে উঠল। তৎক্ষণাৎ দিদির পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বারবার করে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলতে লাগল, "তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঘর থেকে আমাকে, এখনই দূর করে তাড়িয়ে দাও।"

আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল, কিছুতেই উর্মিকে ক্ষমা করবে না। মন গেল গলে।

আস্তে আস্তে উর্মিমালার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, "কিছু ভাবিস নে, যা হয় একটা উপায় হবে।"

ঊর্মি উঠে বসল। বললে, "দিদি, তোমাদেরই বা কেন লোকসান হবে। আমারও তো টাকা আছে।"

শর্মিলা বললে, "পাগল হয়েছিস। আমার বুঝি কিছু নেই। মথুরদাদাকে বলেছি, এই নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পুরিয়ে দেব। আর, তোকেও বলছি, আমি যে কিছু জানতে পেরেছি এ কথা যেন তোর ভগ্নীপতি না টের পান।"

"মাপ করো, দিদি, আমাকে মাপ করো" এই বলে ঊর্মি আবার দিদির পায়ের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

শর্মিলা চোখের জল মুছে ক্লান্ত স্বরে বললে, "কে কাকে মাপ করবে, বোন। সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।"

দিদিকে ছেড়ে ঊর্মি এক মুহূর্ত নড়তে চায় না—ওষুধপত্র দেওয়া, নাওয়ানো, খাওয়ানো, শোওয়ানো সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের হাতে। আবার বই পড়তে আরম্ভ করেছে, সেও দিদির বিছানার পাশে বসে। নিজেকেও আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না।

ফল হল এই যে, শশাঙ্ক বারবার আসে রোগীর ঘরে। পুরুষমানুষের অন্ধতাবশতই বুঝতে পারে না ছট্‌ফটানির তাৎপর্য স্ত্রীর কাছে পড়ছে ধরা, লজ্জায় মরছে ঊর্মি। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে, ব্যর্থ হয়। পেন্‌সিলের দাগ-দেওয়া খবরের কাগজ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম, ফল হয় না কিছুই। ঊর্মি যখন দুর্লভ ছিল না তখনো বাধার ভিতর দিয়ে শশাঙ্ক কাজকর্ম চালাতে চেষ্টা করত। এখন অসম্ভব হয়ে এল।

হতভাগার এই নিরর্থক নিপীড়নে প্রথম প্রথম শর্মিলা বড়ো দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ওর যন্ত্রণা উঠছে প্রবল হয়ে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখের নীচে পড়ছে কালি। ঊর্মি খাওয়ার সময় কাছে বসে না, সেজন্য শশাঙ্কর খাওয়ার উৎসাহ এবং পরিমাণ কমে যাচ্ছে তা ওকে দেখলে বোঝা যায়। সম্প্রতি হঠাৎ এ বাড়িতে আনন্দের যে বান ডেকে এসেছিল সেটা গেছে সম্পূর্ণ ভাঁটিয়ে, অথচ পূর্বে ওদের যে একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না।

একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার চর্চায় উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাত প্রায় ন্যাড়া করে। আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল সিকির সিকিতে। শর্মিলা তাই নিয়ে অনেকবার প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ইদানীং ঊর্মির

উচ্চহাস্যসংযুক্ত সংক্ষিপ্ত আপত্তি নিষ্ফল হয় নি। নূতন সংস্করণের কেশোদ্‌গমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগসাধন শশাঙ্কর মাথায় এই প্রথম ঘটল। কিন্তু তার পর আজকাল কেশোন্নতিবিধানের অনাদরেই ধরা পড়ছে অন্তর্বেদনা। এতটা বেশি যে, এ নিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্মিলার উৎকণ্ঠা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল। স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ধিক্‌কারে তার বুকের মধ্যে টন্‌টন্‌ করে উঠছে, রোগের ব্যথাকে দিচ্ছে এগিয়ে।

ময়দানে হবে কেল্লার ফৌজদের যুদ্ধের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এল, "যাবে ঊর্মি, দেখতে ? ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেছি।"

ঊর্মি কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই শর্মিলা বলে উঠল, "যাবে বৈকি। নিশ্চয় যাবে। একটু বাইরে ঘুরে আসবার জন্যে ও যে ছট্‌ফট্‌ করছে।"

প্রশ্রয় পেয়ে দু দিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, "সার্কাস ?"

এ প্রস্তাবে ঊর্মিমালার উৎসাহই দেখা গেল।

তার পরে, "বোটানিকাল গার্ডেন ?"

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশি ক্ষণ দূরে থাকতে ঊর্মির মন সায় দিচ্ছে না।

দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। রাজ্যের রাজমজুরদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হয়রান হল— সারা দিন কেবল খাটছে ধুলোবালির মধ্যে। হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে পড়বে ভেঙে।

এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে করে রাজগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে আসা অসংগত হল না।

শর্মিলা মনে মনে বলে, যার জন্যে কাজ খোওয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোওয়ানো ওর সইবে না।

শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি বটে, কিন্তু চারি দিক থেকেই সে একটা অব্যক্ত সমর্থন পাচ্ছে। শশাঙ্ক এক-রকম ঠিক করে নিয়েছে, শর্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দুজনকে একত্র মিলিয়ে খুশি দেখেই সে খুশি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না, কিন্তু শর্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিস্ট্‌ রঙিন পেন্‌সিল দিয়ে শর্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এত দিন সেটা ছিল পোর্ট্‌ফোলিয়োর মধ্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতি দোকানে খুব দামি ফ্যাশানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিস-ঘরে যেখানে বসে ঠিক তার সমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে

রাখলে। সামনের ফুলদানিতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

অবশেষে এক দিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কিরকম ফুটছে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ ঊর্মির হাত চেপে ধরে বললে, "তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর, তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর-কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

এ কথা দিদি বারবার করে ঊর্মিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার অবর্তমানে সব চেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে ঊর্মিকে নিয়েই। এ সংসারে অন্য কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত, অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও দিদি মনে মনে সইতে পারত না। ব্যাবসার কথাও দিদি ওকে বুঝিয়েছে; বলেছে, যদি ভালোবাসায় বাধা পায় তা হলে সেই ধাক্কায় ওর কাজকর্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে তখনই আবার কাজকর্মে আপনি আসবে শৃঙ্খলা।

শশাঙ্কের মন উঠেছে মেতে। ও এমন একটা চন্দ্রলোকে আছে যেখানে সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন। আজকাল রবিবার-পালনে বিশুদ্ধ খৃস্টানের মতোই ওর অস্খলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্মিলাকে গিয়ে বললে, "দেখো, পাটের সাহেবদের কাছে তাদের স্টীমলঞ্চ পাওয়া গেছে— কাল রবিবার, মনে করছি ভোরে ঊর্মিকে নিয়ে ডায়মণ্ড্ হারবারের কাছে যাব, সন্ধ্যার আগেই আসব ফিরে।"

শর্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন দিলে মুচড়ে, বেদনায় কপালের চামড়া উঠল কুঞ্চিত হয়ে। শশাঙ্কের চোখেই পড়ল না।

শর্মিলা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করলে, "খাওয়াদাওয়ার কী হবে।"

শশাঙ্ক বললে, "হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছি।"

এক দিন এই-সমস্ত ঠিক করবার ভার যখন ছিল শর্মিলার উপর তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন। আজ সমস্ত উলটপালট হয়ে গেল।

যেমনি শর্মিলা বললে "আচ্ছা, তা যেয়ো" অমনি মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল ছুটে। শর্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বারবার করে বলতে লাগল, "আর কেন আছি বেঁচে।"

কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। আজ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানে কোনো দিন ছেদ পড়ে নি। এবারেও স্বামীকে না বলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত আয়োজন করছিল। আর-কিছুই নয়, বিয়ের দিন শশাঙ্ক যে লাল বেনারসির জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাবে, নিজে পরবে বিয়ের চেলি। স্বামীর গলায়

মালা পরিয়ে ওকে খাওয়াবে সামনে বসিয়ে— জ্বালাবে ধূপবাতি, পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে একটা-কিছু শখের জিনিস কিনে দিত। শর্মিলা ভেবেছিল 'এবারেও নিশ্চয় দেবে, কাল পাব জানতে।'

আজ ও আর কিছুই সহ্য করতে পারছে না। ঘরে যখন কেউ নেই তখন কেবলই বলে বলে উঠছে, "মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! কী হবে এই খেলায়!"

রাত্রে ঘুম হল না। ভোরবেলা শুনতে পেলে মোটর-গাড়ি দরজার কাছ থেকে চলে গেল। শর্মিলা ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে বললে, "ঠাকুর, তুমি মিথ্যে।"

এখন থেকে রোগ দ্রুত বেড়ে চলল। দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে সেদিন শর্মিলা ডেকে পাঠালে স্বামীকে। সন্ধ্যাবেলা, ক্ষীণ আলো ঘরে, নার্সকে সংকেত করলে চলে যেতে। স্বামীকে পাশে বসিয়ে হাতে ধরে বললে, "জীবনে আমি যে বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেন নি। সাধ্যে যা ছিল করেছি। ত্রুটি অনেক হয়েছে, মাপ কোরো আমাকে।"

শশাঙ্ক কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললে, "না, কিছু বোলো না। ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাও নি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল, তোমাকে সুখী করতে পারলুম।"

নার্স বাইরে থেকে বললে, "ডাক্তারবাবু এসেছেন।"

শর্মিলা বললে, "ডেকে দাও।"

কথাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শর্মিলার মামা যত-রকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী। সম্প্রতি এক সন্ন্যাসীর সেবায় তিনি নিযুক্ত। যখন ডাক্তাররা বললে আর-কিছু করবার নেই তখন তিনি ধরে পড়লেন, হিমালয়ের ফেরত বাবাজির ওষুধ পরীক্ষা করতে হবে। কোন্ তিব্বতি শিকড়ের গুঁড়ো আর প্রচুর পরিমাণে দুধ, এই হচ্ছে উপকরণ।

শশাঙ্ক কোনো-রকম হাতুড়েদের সহ্য করতে পারত না। সে আপত্তি করলে। শর্মিলা বললে, "আর কোনো ফল হবে না, অন্তত মামা সান্ত্বনা পাবেন।"

দেখতে দেখতে ফল হল। নিশ্বাসের কষ্ট কমেছে, রক্ত ওঠা গেল বন্ধ হয়ে।

সাত দিন যায়, পনেরো দিন যায়, শর্মিলা উঠে বসল। ডাক্তার বললে, মৃত্যুর ধাক্কাতেই অনেক সময় শরীর মরিয়া হয়ে উঠে শেষ ঠেলায় আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে তোলে।

শর্মিলা বেঁচে উঠল।

তখন সে ভাবতে লাগল, 'এ কী আপদ! কী করি! শেষকালে বেঁচে ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে দাঁড়াবে।'

ও দিকে ঊর্মি জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। এখানে তার পালা শেষ হল।

দিদি এসে বললে, "তুই যেতে পারবি নে।"

"সে কী কথা।"

"হিন্দুসমাজে বোন-সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনো দিন করে নি।"

"ছিঃ!"

"লোকনিন্দা! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো হবে লোকের মুখের কথা!"

শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বললে, "চলো আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজ-দরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল— চেষ্টা করলেই পাবে। সে দেশে কোনো কথা উঠবে না।"

শর্মিলা কাউকে দ্বিধা করবার অবকাশ দিল না। যাবার আয়োজন চলছে। ঊর্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায়।

শশাঙ্ক তাকে বললে, "আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তা হলে কী দশা হবে ভেবে দেখো।"

ঊর্মি বললে, "আমি কিছু ভাবতে পারি নে। তোমরা দুজনে যা ঠিক করবে তাই হবে।"

গুছিয়ে নিতে কিছু দিন লাগল। তার পর সময় যখন কাছে এসেছে ঊর্মি বললে, "আর দিন-সাতেক অপেক্ষা করো, কাকাবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসি গে।"

চলে গেল ঊর্মি।

এই সময়ে মথুর এল শর্মিলার কাছে মুখ ভার করে। বললে, "তোমরা চলে যাচ্ছ ঠিক সময়েই। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হয়ে যাবার পরেই আমি আপসে শশাঙ্কের জন্যে কাজ বিভাগ করে দিয়েছিলেম। আমার সঙ্গে ওর লাভলোকসানের দায় জড়িয়ে রাখি নি। সম্প্রতি কাজ গুটিয়ে নেবার উপলক্ষে শশাঙ্ক ক'দিন ধরে হিসাব বুঝে নিচ্ছিল। দেখা গেল তোমার টাকা সম্পূর্ণ ডুবেছে। তা ছাপিয়েও যা দেনা জমেছে তাতে বোধ হয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে।"

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "সর্বনাশ এত দূর এগিয়ে চলেছিল— উনি জানতে পারেন নি!"

মথুর বললে, "সর্বনাশ-জিনিসটা অনেক সময় বাজ পড়ার মতো, যে মুহূর্তে মারে তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ জানান দেয় না। ও বুঝেছিল ওর লোকসান হয়েছে। তখনো অল্পেই সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু দুর্বুদ্ধি ঘটল; ব্যাবসার গলদ তাড়াতাড়ি শুধরে নেবে মনে করে আমাকে লুকিয়ে পাথুরে কয়লার হাটে তেজিমন্দি খেলা শুরু করলে। চড়ার বাজারে যা কিনেছে সস্তার বাজারে তাই বেচে দিতে হল। হঠাৎ আজ দেখলে হাউইয়ের মতো ওর সব গেছে উড়ে পুড়ে, বাকি রইল ছাই। এখন ভগবানের কৃপায় নেপালে কাজ পেলে তোমাদের ভাবতে হবে না।"

শর্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না। বরঞ্চ ও জানে, অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে ওর স্থান আরো বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যের কঠোরতাকে যথাসম্ভব মৃদু করে এনে দিন চালাতে পারবে, এ বিশ্বাস ওর আছে। বিশেষত গয়না যা হাতে রইল তা নিয়ে এখনো কিছুকাল বিশেষ দুঃখ পেতে হবে না। এ কথাটাও সসংকোচে মনে উঁকি মেরেছে যে, ঊর্মির সঙ্গে বিয়ে হলে তার সম্পত্তিও তো স্বামীরই হবে। কিন্তু শুধু জীবনযাত্রাই তো যথেষ্ট নয়। এত দিন ধরে নিজের শক্তিতে নিজের হাতে স্বামী যে সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার খাতিরে আপন হৃদয়ের অনেক প্রবল দাবিকেও শর্মিলা ইচ্ছে করে দিনে দিনে ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই ওদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের মূর্তিমান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল, এরই অগৌরব ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। মনে মনে বলতে লাগল, তখনই যদি মরতুম তা হলে তো এই ধিক্কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল তা তো হল, কিন্তু দৈন্য-অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয়তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তার দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাতলামির

ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে ঊর্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে তা হলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে ঊর্মিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বালিয়ে মারবেন।

এ দিকে মথুরের সঙ্গে সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ জানতে পেরেছে যে শর্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেছে তার ব্যবসায়ে। এ কথা শর্মিলা এত দিন তাকে জানায় নি, মিটমাট করে নিয়েছিল মথুরের সঙ্গে।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, চাকরির অন্তে সে একদিন শর্মিলার টাকা ধার নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার ব্যাবসা। আজ নষ্ট ব্যাবসার অন্তে সেই শর্মিলারই ঋণ মাথায় করে চলেছে সে চাকরিতে। এ ঋণ তো আর নামাতে পারবে না। চাকরির মাইনে দিয়ে কোনো কালে শোধ হবার রাস্তা কই।

আর দিন-দশেক বাকি আছে নেপাল-যাত্রার। সমস্ত রাত ঘুমোতে পারে নি। ভোরবেলায় শশাঙ্ক ধড়্‌ফড়্‌ করে বিছানা থেকে উঠেই আয়নার টেবিলের উপরে হঠাৎ সবলে মুষ্টিঘাত করে বলে উঠল, "যাব না নেপাল।" দৃঢ় পণ করলে, 'আমরা দুজনে ঊর্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব— ভ্রূকুটিকুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই। আর, এইখানেই ভাঙা ব্যাবসাকে আর-একবার গড়ে তুলব এই কলকাতাতেই বসে।'

যে-যে জিনিস সঙ্গে যাবে, যা রেখে যেতে হবে, শর্মিলা বসে বসে তারই ফর্দ করছিল একটা খাতায়। ডাক শুনতে পেলে, "শর্মিলা! শর্মিলা!" তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে ছুটে গেল স্বামীর ঘরে। অকস্মাৎ অনিষ্টের আশঙ্কা করে কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে।"

বললে, "যাব না নেপালে। গ্রাহ্য করব না সমাজকে। থাকব এইখানেই।"

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কী হয়েছে।"

শশাঙ্ক বললে, "কাজ আছে।"

সেই পুরাতন কথা— কাজ আছে। শর্মিলার বুক দুরুদুরু করে উঠল।

"শর্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এত অধঃপতন কল্পনা করতেও পার?"

শর্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বললে, "কী হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বলো।"

শশাঙ্ক বললে, "আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে, সে কথা ঢাকা দিয়ো না।"

শর্মিলা বললে, "আচ্ছা, বেশ।"

শশাঙ্ক বললে, "সেইদিনকার মতোই আজ থেকে আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, শুনে রাখো। একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।"

শর্মিলা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বললে, "তুমিও আমাকে বিশ্বাস কোরো। কাজ বুঝিয়ে দিয়ো আমাকে, তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।"

বাইরে থেকে আওয়াজ এল "চিঠি"। উর্মির হাতের অক্ষরে দুখানা চিঠি। একখানি শশাঙ্কের নামে—

আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলেতে। বাবার আদেশমত ডাক্তারি শিখে আসব। ছয়-সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্যে ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইল মনে।

শর্মিলার চিঠি—

দিদি, শতসহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি, মাপ কোরো। যদি সেটা অপরাধ না হয় তবে তাই জেনেই সুখী হব। তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে। কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর, সুখ যদি না হয় তো নাই হল। ভুল করতে ভয় করি।

—

প্রবন্ধ

স্বদেশ

স্বদেশ

নূতন ও পুরাতন

আমরা পুরাতন ভারতবর্ষীয় ; বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত। আমি অনেক সময়ে নিজের মধ্যে আমাদের সেই জাতিগত প্রকাণ্ড প্রাচীনত্ব অনুভব করি। মনোযোগপূর্বক যখন অন্তরের মধ্যে নিরীক্ষণ করে দেখি তখন দেখতে পাই, সেখানে কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তরে বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি। যেন জগতের প্রাতঃকালে আমরা কাছারির কাজ সেরে এসেছি, তাই এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন আর-সকলে কার্যে নিযুক্ত তখন আমরা দ্বার রুদ্ধ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি : আমরা আমাদের পুরা বেতন চুকিয়ে নিয়ে কর্মে ইস্তফা দিয়ে পেন্সনের উপর সংসার চালাচ্ছি। বেশ আছি।

এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। বহুকালের যে ব্রহ্মত্রটুকু পাওয়া গিয়েছিল তার ভালো দলিল দেখাতে পারি নি বলে নূতন রাজার রাজত্বে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ আমরা গরিব। পৃথিবীর চাষারা যে-রকম খেটে মরছে এবং খাজনা দিচ্ছে আমাদেরও তাই করতে হবে। পুরাতন জাতিকে হঠাৎ নূতন চেষ্টা আরম্ভ করতে হয়েছে।

অতএব চিন্তা রাখো, বিশ্রাম রাখো, গৃহকোণ ছাড়ো ; ব্যাকরণ ন্যায়শাস্ত্র শ্রুতিস্মৃতি এবং নিত্যনৈমিত্তিক গার্হস্থ্য নিয়ে থাকলে আর চলবে না ; কঠিন মাটির ঢেলা ভাঙো, পৃথিবীকে উর্বরা করো এবং নব-মানব রাজার রাজস্ব দাও ; কালেজে পড়ো, হোটেলে খাও এবং আপিসে চাকরি করো।

হায়, ভারতবর্ষের পুরপ্রাচীর ভেঙে ফেলে এই অনাবৃত বিশাল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আমাদের কে এনে দাঁড় করালে। আমরা চতুর্দিকে মানসিক বাঁধ নির্মাণ করে কালস্রোত বন্ধ করে দিয়ে সমস্ত নিজের মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। চঞ্চল পরিবর্তন ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মতো নিশিদিন গর্জন করত, আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে গতিশীল নিখিল-সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বসেছিলুম। এমন সময় কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত

ছারখার করে দিলে। পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।

মনে করো আমাদের চতুর্দিকে হিমাদ্রি এবং সমুদ্রের বাধা যদি আরো দুর্গম হত তা হলে এক-দল মানুষ একটি অজ্ঞাত নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে স্থির-শান্ত-ভাবে এক-প্রকার সংকীর্ণ পরিপূর্ণতা লাভের অবসর পেত। পৃথিবীর সংবাদ তারা বড়ো একটা জানতে পেত না এবং ভূগোলবিবরণ সম্বন্ধে তাদের নিতান্ত অসম্পূর্ণ ধারণা থাকত; কেবল তাদের কাব্য, তাদের সমাজতন্ত্র, তাদের ধর্মশাস্ত্র, তাদের দর্শনতত্ত্ব অপূর্ব শোভা সুষমা এবং সম্পূর্ণতা লাভ করতে পেত; তারা যেন পৃথিবী-ছাড়া আর-একটি ছোটো গ্রহের মধ্যে বাস করত; তাদের ইতিহাস, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সুখ-সম্পদ তাদের মধ্যেই পর্যাপ্ত থাকত। সমুদ্রের এক অংশ কালক্রমে মৃত্তিকাস্তরে রুদ্ধ হয়ে যেমন একটি নিভৃত শান্তিময় সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয়; সে কেবল নিস্তরঙ্গভাবে প্রভাতসন্ধ্যার বিচিত্র বর্ণচ্ছায়ায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং অন্ধকার রাত্রে স্তিমিত নক্ষত্রালোকে স্তম্ভিতভাবে চিররহস্যের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকে।

কালের বেগবান প্রবাহে, পরিবর্তন-কোলাহলের কেন্দ্রস্থলে, প্রকৃতির সহস্র শক্তির রণরঙ্গভূমির মাঝখানে সংক্ষুব্ধ হয়ে খুব একটা শক্ত-রকম শিক্ষা এবং সভ্যতা লাভ হয় সত্য বটে; কিন্তু নির্জনতা নিস্তব্ধতা গভীরতার মধ্যে অবতরণ করে যে কোনো রত্ন সঞ্চয় করা যায় না তা কেমন করে বলব।

এই মথ্যমান সংসারসমুদ্রের মধ্যে সেই নিস্তব্ধতার অবসর কোনো জাতিই পায় নি। মনে হয় কেবল ভারতবর্ষই এক কালে দৈবক্রমে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই বিচ্ছিন্নতা লাভ করেছিল এবং অতলস্পর্শের মধ্যে অবগাহন করেছিল। জগৎ যেমন অসীম মানবের আত্মাও তেমনি অসীম; যাঁরা সেই অনাবিষ্কৃত অন্তর্দেশের পথ অনুসন্ধান করে-ছিলেন তাঁরা যে কোনো নূতন সত্য এবং কোনো নূতন আনন্দ লাভ করেন নি তা নিতান্ত অবিশ্বাসীর কথা।

ভারতবর্ষ তখন একটি রুদ্ধদ্বার নির্জন রহস্যময় পরীক্ষাকক্ষের মতো ছিল; তার মধ্যে এক অপরূপ মানসিক সভ্যতার গোপন পরীক্ষা চলছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগে যেমন আলকেমি-তত্ত্বান্বেষীরা গোপন গৃহে নিহিত থেকে বিবিধ অদ্ভুত যন্ত্রতন্ত্রযোগে চির-জীবনরস (Elixir of Life) আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন, আমাদের জ্ঞানীরাও সেইরূপ গোপন সতর্কতা-সহকারে আধ্যাত্মিক চিরজীবন -লাভের উপায় অন্বেষণ করে-ছিলেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন, 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্' এবং অত্যন্ত দুঃসাধ্য উপায়ে অন্তরের মধ্যে সেই অমৃতরসের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

তার থেকে কী হতে পারত কে জানে। আলকেমি থেকে যেমন কেমিস্ট্রির উৎপত্তি হয়েছে তেমনি তাঁদের সেই তপস্যা থেকে মানবের কী এক নিগূঢ় নূতন শক্তির আবিষ্কার হতে পারত তা এখন কে বলতে পারে।

কিন্তু হঠাৎ দ্বার ভগ্ন করে বাহিরের দুর্দান্ত লোক ভারতবর্ষের সেই পবিত্র পরীক্ষাশালার মধ্যে বলপূর্বক প্রবেশ করলে এবং সেই অন্বেষণের পরিণামফল সাধারণের কাছে অপ্রকাশিতই রয়ে গেল। এখনকার নবীন দুরন্ত সভ্যতার মধ্যে এই পরীক্ষার তেমন প্রশান্ত অবসর আর কখনো পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

পৃথিবীর লোক সেই পরীক্ষাগারের মধ্যে প্রবেশ করে কী দেখলে। একটি জীর্ণ তপস্বী; বসন নেই, ভূষণ নেই, পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। সে যে কথা বলতে চায় এখনো তার কোনো প্রতীতিগম্য ভাষা নেই, প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণ নেই, আয়ত্তগম্য পরিণাম নেই।

অতএব হে বৃদ্ধ, হে চিরাতুর, হে উদাসীন, তুমি ওঠো, পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন করো অথবা দিবাশয্যায় পড়ে পড়ে আপনার পুরাতন যৌবনকালের প্রতাপ ঘোষণাপূর্বক জীর্ণ অস্থি আস্ফালন করো— দেখো, তাতে তোমার লজ্জা নিবারণ হয় কি না।

কিন্তু আমার ওতে প্রবৃত্তি হয় না। কেবলমাত্র খবরের কাগজের পাল উড়িয়ে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে যাত্রা আরম্ভ করতে আমার সাহস হয় না। যখন মৃদু মৃদু অনুকূল বাতাস দেয় তখন এই কাগজের পাল গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু কখন সমুদ্র থেকে ঝড় আসবে এবং দুর্বল দম্ভ শতধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

এমন যদি হত, নিকটে কোথাও উন্নতি-নামক একটা পাকা বন্দর আছে, সেইখানে কোনোমতে পৌঁছোলেই তার পরে দধি এবং পিষ্টক, দীয়তাং এবং ভুজ্যতাং, তা হলেও বরং একবার সময় বুঝে আকাশের ভাবগতিক দেখে অত্যন্ত চতুরতা-সহকারে পার হবার চেষ্টা করা যেত। কিন্তু যখন জানি উন্নতিপথে যাত্রার আর শেষ নেই, কোথাও নৌকা বেঁধে নিদ্রা দেবার স্থান নেই, ঊর্ধ্বে কেবল ধ্রুবতারা দীপ্তি পাচ্ছে এবং সম্মুখে কেবল তটহীন সমুদ্র, বায়ু অনেক সময়েই প্রতিকূল এবং তরঙ্গ সর্বদাই প্রবল, তখন কি বসে বসে কেবল ফুল্‌স্‌ক্যাপ কাগজের নৌকা নির্মাণ করতে প্রবৃত্তি হয়।

অথচ তরী ভাসাবার ইচ্ছা আছে। যখন দেখি মানবস্রোত চলেছে; চতুর্দিকে বিচিত্র কল্লোল, উদ্দাম বেগ, প্রবল গতি, অবিশ্রাম কর্ম, তখন আমারও মন নেচে ওঠে। তখন ইচ্ছা করে বহু বৎসরের গৃহবন্ধন ছিন্ন করে একেবারে বাহির হয়ে পড়ি। কিন্তু তার পরেই রিক্ত হস্তের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি পাথেয় কোথায়। হৃদয়ে সে অসীম

আশা, জীবনে সে অভ্রান্ত বল, বিশ্বাসের সে অপ্রতিহত প্রভাব কোথায়। তবে তো পৃথিবীপ্রান্তে এই অজ্ঞাতবাসই ভালো, এই ক্ষুদ্র সন্তোষ এবং নির্জীব শান্তিই আমাদের যথালাভ।

তখন বসে বসে মনকে এই বলে বোঝাই যে, আমরা যন্ত্র তৈরি করতে পারি নে, জগতের সমস্ত নিগূঢ় সংবাদ আবিষ্কার করতে পারি নে, কিন্তু ভালোবাসতে পারি, ক্ষমা করতে পারি, পরস্পরের জন্যে স্থান ছেড়ে দিতে পারি। দুঃসাধ্য দুরাশা নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াবার আবশ্যক কী। নাহয় এক পাশেই পড়ে রইলুম, 'টাইম্‌স্‌'-এর জগৎপ্রকাশক স্তম্ভে আমাদের নাম নাহয় না'ই উঠল।

কিন্তু দুঃখ আছে, দারিদ্র্য আছে, প্রবলের অত্যাচার আছে, অসহায়ের ভাগ্যে অপমান আছে ; কোণে বসে কেবল গৃহকর্ম এবং আতিথ্য করে তার কী প্রতিকার করবে।

হায়, সেই তো ভারতবর্ষের দুঃসহ দুঃখ। আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব। রূঢ় মানবপ্রকৃতির চিরন্তন নিষ্ঠুরতার সঙ্গে! যিশুখ্রীস্টের পবিত্র শোণিতস্রোত যে অনুর্বর কাঠিন্যকে আজও কোমল করতে পারে নি সেই পাষাণের সঙ্গে! প্রবলতা চিরদিন দুর্বলতার প্রতি নির্মম, আমরা সেই আদিম পশুপ্রকৃতিকে কী করে জয় করব? সভা করে? দরখাস্ত করে? আজ একটু ভিক্ষা পেয়ে? কাল একটা তাড়া খেয়ে? তা কখনোই হবে না।

তবে প্রবলের সমান প্রবল হয়ে? তা হতে পারে বটে। কিন্তু যখন ভেবে দেখি য়ুরোপ কতখানি প্রবল, কত কারণে প্রবল— যখন এই দুর্দান্ত শক্তিকে একবার কায়মনে সর্বতোভাবে অনুভব করে দেখি, তখন আর কি আশা হয়। তখন মনে হয়, এসো ভাই, সহিষ্ণু হয়ে থাকি এবং ভালোবাসি এবং ভালো করি। পৃথিবীতে যতটুকু কাজ করি তা যেন সত্যসত্যই করি, ভান না করি। অক্ষমতার প্রধান বিপদ এই যে, সে বৃহৎ কাজ করতে পারে না বলে বৃহৎ ভানকে শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে। জানে না যে মনুষ্যত্ব-লাভের পক্ষে বড়ো মিথ্যার চেয়ে ছোটো সত্য ঢের বেশি মূল্যবান।

কিন্তু উপদেশ দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। প্রকৃত অবস্থাটা কী তাই আমি দেখতে চেষ্টা করছি। তা দেখতে গেলে যে পুরাতন বেদ পুরাণ সংহিতা খুলে বসে নিজের মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ করে একটা কাল্পনিক কাল রচনা করতে হবে তা নয়, কিম্বা অন্য জাতির প্রকৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাযোগে আপনাদের বিলীন করে দিয়ে আমাদের নবশিক্ষার ক্ষীণভিত্তির উপর প্রকাণ্ড দুরাশার দুর্গ নির্মাণ করতে হবে তাও নয় ; দেখতে হবে এখন আমরা কোথায় আছি। আমরা যেখানে অবস্থান করছি

এখানে পূর্বদিক থেকে অতীতের এবং পশ্চিমদিক থেকে ভবিষ্যতের মরীচিকা এসে পড়েছে ; সে দুটোকেই সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সত্য-স্বরূপে জ্ঞান না করে একবার দেখা যাক আমরা যথার্থ কোন্‌ মৃত্তিকার উপরে দাঁড়িয়ে আছি।

আমরা একটি অত্যন্ত জীর্ণ প্রাচীন নগরে বাস করি ; এত প্রাচীন যে এখানকার ইতিহাস লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে ; মনুষ্যের হস্তলিখিত স্মরণচিহ্নগুলি শৈবালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ; সেইজন্যে ভ্রম হচ্ছে যেন এ নগর মানব-ইতিহাসের অতীত, এ যেন অনাদি প্রকৃতির এক প্রাচীন রাজধানী। মানব-পুরাবৃত্তের রেখা লুপ্ত করে দিয়ে প্রকৃতি আপন শ্যামল অক্ষর এর সর্বাঙ্গে বিচিত্র আকারে সজ্জিত করেছে। এখানে সহস্র বৎসরের বর্ষা আপন অশ্রুচিহ্নরেখা রেখে গিয়েছে এবং সহস্র বৎসরের বসন্ত এর প্রত্যেক ভিত্তিছিদ্রে আপন যাতায়াতের তারিখ হরিদ্বর্ণ অঙ্কে অঙ্কিত করেছে। এক দিক থেকে একে নগর বলা যেতে পারে, এক দিক থেকে একে অরণ্য বলা যায়। এখানে কেবল ছায়া এবং বিশ্রাম, চিন্তা এবং বিষাদ বাস করতে পারে। এখানকার ঝিল্লিমুখরিত অরণ্যমর্মরের মধ্যে, এখানকার বিচিত্রভঙ্গী জটাভারগ্রস্ত শাখাপ্রশাখা ও রহস্যময় পুরাতন অট্টালিকা-ভিত্তির মধ্যে, শতসহস্র ছায়াকে কায়াময়ী ও কায়াকে মায়াময়ী বলে ভ্রম হয়। এখানকার এই সনাতন মহাছায়ার মধ্যে সত্য এবং কল্পনা ভাইবোনের মতো নির্বিরোধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, প্রকৃতির বিশ্বকার্য এবং মানবের মানসিক সৃষ্টি পরস্পর জড়িত-বিজড়িত হয়ে নানা আকারের ছায়াকুঞ্জ নির্মাণ করেছে। এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা, এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে কিন্তু মনে করে তা কর্ম। জগতের মধ্যাহ্ন-সূর্যালোক ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কেবল ছোটো ছোটো মানিকের মতো দেখায়, প্রবল ঝড় শত শত সংকীর্ণ শাখাসংকটের মধ্যে প্রতিহত হয়ে মৃদু মর্মরের মতো মিলিয়ে আসে। এখানে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, আশা ও নৈরাশ্যের সীমাচিহ্ন লুপ্ত হয়ে এসেছে ; অদৃষ্টবাদ এবং কর্মকাণ্ড, বৈরাগ্য এবং সংসারযাত্রা একসঙ্গেই ধাবিত হয়েছে। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক, ব্রহ্ম এবং মৃৎপুত্তল, ছিন্নমূল শুষ্ক অতীত এবং উদ্‌ভিন্নকিশলয় জীবন্ত বর্তমান সমান সমাদর লাভ করেছে। শাস্ত্র যেখানে পড়ে আছে সেইখানে পড়েই আছে, এবং শাস্ত্রকে আচ্ছন্ন করে যেখানে সহস্র প্রথাকীটের প্রাচীন বল্মীক উঠেছে সেখানেও কেউ, অলস ভক্তিভরে, হস্তক্ষেপ করে না। গ্রন্থের অক্ষর এবং গ্রন্থকীটের ছিদ্র দুই-ই এখানে সমান সম্মানের শাস্ত্র। এখানকার অশ্বত্থবিদীর্ণ ভগ্ন মন্দিরের মধ্যে দেবতা এবং উপদেবতা একত্রে আশ্রয় গ্রহণ করে বিরাজ করছে।

এখানে কি তোমাদের জগৎযুদ্ধের সৈন্যশিবির স্থাপন করবার স্থান! এখানকার

ভগ্ন ভিত্তি কি তোমাদের কলকারখানা, তোমাদের অগ্নিশ্বসিত সহস্রবাহু লৌহদানবের কারাগার নির্মাণের যোগ্য! তোমাদের অস্থির উদ্যমের বেগে এর প্রাচীন ইষ্টকগুলিকে ভূমিসাৎ করে দিতে পার বটে, কিন্তু তার পরে পৃথিবীর এই অতিপ্রাচীন শয্যাশায়ী জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই নিশ্চেষ্ট নিবিড় মহানগরারণ্য ভেঙে গেলে সহস্র মৃত বৎসরের যে একটি বৃদ্ধ ব্রহ্মদৈত্য এখানে চিরনিভৃত আবাস গ্রহণ করেছিল সেও যে সহসা নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে।

এরা বহুদিন স্বহস্তে গৃহনির্মাণ করে নি, সে অভ্যাস এদের নেই, এদের সমধিক চিন্তাশীলগণের সেই এক মহৎ গর্ব। তারা যে কথা নিয়ে লেখনীপুচ্ছ আস্ফালন করে সে কথা অতি সত্য, তার প্রতিবাদ করা কারো সাধ্য নয়। বাস্তবিকই অতিপ্রাচীন আদিপুরুষের বাস্তভিত্তি এদের কখনো ছাড়তে হয় নি। কালক্রমে অনেক অবস্থা-বৈসাদৃশ্য, অনেক নূতন সুবিধা-অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে; কিন্তু সবগুলিকে টেনে নিয়ে মৃতকে এবং জীবিতকে, সুবিধা এবং অসুবিধাকে প্রাণপণে সেই পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত এক ভিত্তির মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে। অসুবিধার খাতিরে এরা কখনো স্পর্ধিতভাবে স্বহস্তে নূতন গৃহ নির্মাণ বা পুরাতন গৃহসংস্কার করেছে এমন গ্লানি এদের শত্রুপক্ষের মুখেও শোনা যায় না। যেখানে গৃহছাদের মধ্যে ছিদ্র প্রকাশ পেয়েছে সেখানে অযত্নসম্ভূত বটের শাখা কদাচিৎ ছায়া দিয়েছে, কালসঞ্চিত মৃত্তিকাস্তরে কথঞ্চিৎ ছিদ্ররোধ করেছে।

এই বনলক্ষ্মীহীন ঘন বনে, এই পুরলক্ষ্মীহীন ভগ্ন পুরীর মধ্যে, আমরা ধুতিটি চাদরটি পরে অত্যন্ত মৃদুমন্দভাবে বিচরণ করি, আহারান্তে কিঞ্চিৎ নিদ্রা দিই, ছায়ায় বসে তাস-পাশা খেলি, যা-কিছু অসম্ভব এবং সাংসারিক কাজের বাহির তাকেই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি, যা-কিছু কার্যোপযোগী এবং দৃষ্টিগোচর তার প্রতি মনের অবিশ্বাস কিছুতে সম্যক দূর হয় না, এবং এরই উপর কোনো ছেলে যদি সিকিমাত্রা চাঞ্চল্য প্রকাশ করে তা হলে আমরা সকলে মিলে মাথা নেড়ে বলি : সর্বমত্যন্তং গর্হিতম্।

এমন সময় তোমরা কোথা থেকে হঠাৎ এসে আমাদের জীর্ণ পঞ্জরে গোটা দুই-তিন প্রবল খোঁচা দিয়ে বলছ : ওঠো ওঠো; তোমাদের শয়নশালায় আমরা আপিস স্থাপন করতে চাই। তোমরা ঘুমোচ্ছিলে বলে যে সমস্ত সংসার ঘুমোচ্ছিল তা নয়। ইতিমধ্যে জগতের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। ঐ ঘণ্টা বাজছে, এখন পৃথিবীর মধ্যাহ্নকাল, এখন কর্মের সময়।

তাই শুনে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠে 'কোথায় কর্ম' 'কোথায় কর্ম' করে গৃহের চার কোণে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে এবং ওরই মধ্যে যারা কিঞ্চিৎ স্থূলকায়

স্ফীত স্বভাবের লোক তারা পাশমোড়া দিয়ে বলছে : কে হে! কর্মের কথা কে বলে! তা, আমরা কি কর্মের লোক নই বলতে চাও। ভারি ভ্রম। ভারতবর্ষ ছাড়া কর্মস্থান কোথাও নেই। দেখো-না কেন, মানব-ইতিহাসের প্রথম যুগে এইখানেই আর্য-বর্বরের যুদ্ধ হয়ে গেছে; এইখানেই কত রাজ্যপত্তন, কত নীতিধর্মের অভ্যুদয়, কত সভ্যতার সংগ্রাম হয়ে গেছে। অতএব কেবলমাত্র আমরাই কর্মের লোক, অতএব আমাদের আর কর্ম করতে বোলো না। যদি অবিশ্বাস হয় তবে তোমরা বরং এক কাজ করো— তোমাদের তীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক কোদালখানা দিয়ে ভারতভূমির যুগসঞ্চিত বিস্মৃতির স্তর উঠিয়ে দেখো মানবসভ্যতার ভিত্তিতে কোথায় আমাদের হস্তচিহ্ন আছে। আমরা ততক্ষণ অমনি আর-একবার ঘুমিয়ে নিই।

এই রকম করে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অর্ধ-অচেতন জড় মূঢ় দাম্ভিক -ভাবে ঈষৎ-উন্মীলিত নিদ্রাকষায়িত নেত্রে আলস্যবিজড়িত অস্পষ্ট রুষ্ট হুংকারে জগতের দিবালোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করছে, এবং কেউ কেউ গভীর আত্মগ্লানি-সহকারে শিথিলস্নায়ু অসাড় উদ্যমকে ভূয়োভূয় আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করবার চেষ্টা করছে। এবং যারা জাগ্রতস্বপ্নের লোক, যারা কর্ম ও চিন্তার মধ্যে অস্থিরচিত্তে দোদুল্যমান, যারা পুরাতনের জীর্ণতা দেখতে পায় এবং নূতনের অসম্পূর্ণতা অনুভব করে, সেই হতভাগ্যেরা বারম্বার মুণ্ড আন্দোলন করে বলছে : হে নূতন লোকেরা, তোমরা যে নূতন কাণ্ড করতে আরম্ভ করে দিয়েছ এখনো তো তার শেষ হয় নি, এখনো তো তার সমস্ত সত্যমিথ্যা স্থির হয় নি, মানব-অদৃষ্টের চিরন্তন সমস্যার তো কোনোটারই মীমাংসা হয় নি।

তোমরা অনেক জেনেছ, অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি। আমরা যে বিশ্ব-সংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে একে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ। তোমরা যে নিত্য নূতন অভাব আবিষ্কার করে দরিদ্রের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বাড়াচ্ছ, গৃহের স্বাস্থ্যজনক আশ্রয় থেকে অবিশ্রাম কর্মের উত্তেজনায় টেনে নিয়ে যাচ্ছ, কর্মকেই সমস্ত জীবনের কর্তা করে উন্মাদনাকে বিশ্রামের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছ, তোমরা কি স্পষ্ট জান তোমাদের উন্নতি তোমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

আমরা সম্পূর্ণ জানি আমরা কোথায় এসেছি। আমরা গৃহের মধ্যে অল্প অভাব এবং গাঢ় স্নেহ নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষুদ্র নিকটকর্তব্যসকল পালন করে যাচ্ছি। আমাদের যতটুকু সুখসমৃদ্ধি আছে ধনী দরিদ্রে, দূর ও নিকট সম্পর্কীয়ে, অতিথি অনুচর ও ভিক্ষুকে মিলে ভাগ করে নিয়েছি। যথাসম্ভব লোক যথা-

সম্ভবমত সুখে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, কেউ কাউকে ত্যাগ করতে চায় না, এবং জীবন-ঝঞ্ঝার তাড়নায় কেউ কাউকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় না।

ভারতবর্ষ সুখ চায় নি, সন্তোষ চেয়েছিল, তা পেয়েওছে এবং সর্বতোভাবে সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা স্থাপন করেছে। এখন আর তার কিছু করবার নেই। সে বরঞ্চ তার বিশ্রামকক্ষে বসে তোমাদের উন্মাদ জীবন-উৎপ্লব দেখে তোমাদের সভ্যতার চরম সফলতা সম্বন্ধে মনে মনে সংশয় অনুভব করতে পারে। মনে করতে পারে, কালক্রমে অবশেষে তোমাদের যখন এক দিন কাজ বন্ধ করতে হবে তখন কি এমন ধীরে এমন সহজে এমন বিশ্রামের মধ্যে অবতরণ করতে পারবে। আমাদের মতো এমন কোমল এমন সহৃদয় পরিণতি লাভ করতে পারবে কি। উদ্দেশ্য যেমন ক্রমে ক্রমে লক্ষ্যের মধ্যে নিঃশেষিত হয়, উত্তপ্ত দিন যেমন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে অবগাহন করে, সেই-রকম মধুর সমাপ্তি লাভ করতে পারবে কি। না, কল যে-রকম হঠাৎ বিগড়ে যায়, উত্তরোত্তর অতিরিক্ত বাষ্প ও তাপ সঞ্চয় করে এঞ্জিন যে-রকম সহসা ফেটে যায়, একপথবর্তী দুই বিপরীতমুখী রেলগাড়ি পরস্পরের সংঘাতে যেমন অকস্মাৎ বিপর্যস্ত হয়, সেই-রকম প্রবল বেগে একটা নিদারুণ অপঘাতসমাপ্তি প্রাপ্ত হবে?

যাই হোক, তোমরা এখন অপরিচিত সমুদ্রে অনাবিষ্কৃত তটের সন্ধানে চলেছ— অতএব তোমাদের পথে তোমরা যাও আমাদের গৃহে আমরা থাকি, এই কথাই ভালো।

কিন্তু মানুষে থাকতে দেয় কই? তুমি যখন বিশ্রাম করতে চাও, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই যে তখন অশ্রান্ত। গৃহস্থ যখন নিদ্রায় কাতর, গৃহছাড়ারা যে তখন নানা ভাবে পথে পথে বিচরণ করছে।

তা ছাড়া এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য, পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে। কারণ, তুমিই কেবল একলা থামবে, আর-কেউ থামবে না। জগৎপ্রবাহের সঙ্গে সমগতিতে যদি না চলতে পার তো প্রবাহের সমস্ত সচল বেগ তোমার উপর এসে আঘাত করবে, একেবারে বিদীর্ণ বিপর্যস্ত হবে, কিম্বা অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কালস্রোতের তলদেশে অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও— পৃথিবীর এই-রকম নিয়ম।

অতএব আমরা যে জগতের মধ্যে লুপ্তপ্রায় হয়ে আছি তাতে কারো কিছু বলবার নেই। তবে, সে সম্বন্ধে যখন বিলাপ করি তখন এই-রকম ভাবে করি যে, পূর্বে যে নিয়মের উল্লেখ করা হল সেটা সাধারণত খাটে বটে, কিন্তু আমরা ওরই মধ্যে এমন একটু সুযোগ করে নিয়েছিলুম যে আমাদের সম্বন্ধে অনেক দিন খাটে নি। যেমন মোটের

উপরে বলা যায় জরামৃত্যু জগতের নিয়ম, কিন্তু আমাদের যোগীরা জীবনীশক্তিকে নিরুদ্ধ করে মৃতবৎ হয়ে বেঁচে থাকবার এক উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। সমাধি-অবস্থায় তাঁদের যেমন বৃদ্ধি ছিল না তেমনি হ্রাসও ছিল না। জীবনের গতিরোধ করলেই মৃত্যু আসে, কিন্তু জীবনের গতিকে রুদ্ধ করেই তাঁরা চিরজীবন লাভ করতেন।

আমাদের জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা অনেকটা খাটে। অন্য জাতি যে কারণে মরে আমাদের জাতি সেই কারণকে উপায়স্বরূপ করে দীর্ঘজীবনের পথ আবিষ্কার করেছিলেন। আকাঙ্ক্ষার আবেগ যখন হ্রাস হয়ে যায়, শ্রান্ত উদ্যম যখন শিথিল হয়ে আসে, তখন জাতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা বহু যত্নে দুরাকাঙ্ক্ষাকে ক্ষীণ ও উদ্যমকে জড়ীভূত করে দিয়ে সমভাবে পরমায়ু রক্ষা করবার উদ্‌যোগ করেছিলুম।

মনে হয়, যেন কতকটা ফললাভও হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা যেখানে আপনি থেমে আসে সময়কেও কৌশলপূর্বক সেইখানে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পৃথিবী থেকে জীবনকে অনেকটা পরিমাণে নির্বাসিত করে এমন-একটা মধ্য-আকাশে তুলে রাখা গিয়েছিল যেখানে পৃথিবীর ধুলো বড়ো পৌঁছত না, সর্বদাই সে নির্লিপ্ত নির্মল নিরাপদ থাকত।

কিন্তু একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, কিছুকাল হল নিকটবর্তী কোন্‌-এক অরণ্য থেকে এক দীর্ঘজীবী যোগমগ্ন যোগীকে কলিকাতায় আনা হয়েছিল। এখানে বহু উপদ্রবে তার সমাধি ভঙ্গ করাতে তার মৃত্যু হয়। আমাদের জাতীয় যোগনিদ্রাও তেমনি বাহিরের লোক বহু উপদ্রবে ভেঙে দিয়েছে। এখন অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার আর-কোনো প্রভেদ নেই; কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, বহুদিন বহির্বিষয়ে নিরুদ্যম থেকে জীবনচেষ্টায় সে অনভ্যস্ত হয়ে গেছে। যোগের মধ্যে থেকে একেবারে গোল-যোগের মধ্যে এসে পড়েছে।

কিন্তু কী করা যাবে। এখন উপস্থিতমত সাধারণ নিয়মে প্রচলিত প্রথায় আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। দীর্ঘ জটা ও নখ কেটে ফেলে নিয়মিত স্নানাহার-পূর্বক কথঞ্চিত বেশভূষা করে হস্তপদচালনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

কিন্তু সম্প্রতি ব্যাপারটা এই-রকম হয়েছে যে, আমরা জটা নখ কেটে ফেলেছি বটে, সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে সমাজের লোকের সঙ্গে মিশতেও আরম্ভ করেছি, কিন্তু মনের ভাবের পরিবর্তন করতে পারি নি। এখনো আমরা বলি, আমাদের পিতৃপুরুষেরা শুদ্ধমাত্র হরীতকী সেবন করে নগ্নদেহে মহত্ত্বলাভ করেছিলেন, অতএব আমাদের কাছে বেশভূষা আহারবিহার চালচলনের এত সমাদর কেন। এই বলে আমরা ধুতির কোঁচাটা বিস্তার-পূর্বক পিঠের উপর তুলে দিয়ে দ্বারের সম্মুখে বসে কর্মক্ষেত্রের প্রতি অলস অনাসক্ত দৃষ্টিপাত-পূর্বক বায়ু সেবন করি।

এটা আমাদের স্মরণ নেই যে, যোগাসনে যা পরম সম্মানার্হ সমাজের মধ্যে তা বর্বরতা। প্রাণ না থাকলে দেহ যেমন অপবিত্র, ভাব না থাকলে বাহ্যানুষ্ঠানও তদ্রূপ।

তোমার-আমার মতো লোক যারা তপস্যাও করি নে, হবিষ্যও খাই নে, জুতোমোজা পরে ট্র্যামে চড়ে পান চিবোতে চিবোতে নিয়মিত আপিসে ইস্কুলে যাই; যাদের আদ্যোপান্ত তন্ন তন্ন করে দেখে কিছুতেই প্রতীতি হয় না এরা দ্বিতীয় যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ গৌতম জরৎকারু বৈশম্পায়ন কিম্বা ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ছাত্রবৃন্দ— যাদের বালখিল্য তপস্বী বলে এ-পর্যন্ত কারো ভ্রম হয় নি, একদিন তিন সন্ধ্যা স্নান করে একটা হরীতকী মুখে দিলে যাদের তার পরে একাদিক্রমে কিছুকাল আপিস কিম্বা কলেজ কামাই করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে এ-রকম ব্রহ্মচর্যের বাহ্যাড়ম্বর করা, পৃথিবীর অধিকাংশ উদ্‌যোগপরায়ণ মানুষজাতীয়ের প্রতি খর্ব নাসিকা সীট্‌কার করা, কেবলমাত্র যে অদ্ভুত, অসংগত, হাস্যকর তা নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষতিজনক।

বিশেষ কাজের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। পালোয়ান লেংটি পরে, মাটি মেখে ছাতি ফুলিয়ে চলে বেড়ায়, রাস্তার লোক বাহবা-বাহবা করে— তার ছেলেটি নিতান্ত কাহিল এবং বেচারা, এবং এন্‌ট্রেন্স্‌ পর্যন্ত পড়ে আজ পাঁচ বৎসর বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট আপিসের অ্যাপ্রেন্টিস, সেও যদি লেংটি পরে, ধুলো মাখে এবং উঠতে বসতে তাল ঠোকে এবং ভদ্রলোক কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে 'আমার বাবা পালোয়ান', তবে অন্য লোকের যেমনি আমোদ বোধ হোক, আত্মীয়বন্ধুরা তার জন্যে সবিশেষ উদ্‌বিগ্ন না হয়ে থাকতে পারে না। অতএব হয় সত্যই তপস্যা করো নয় তপস্যার আড়ম্বর ছাড়ো।

পুরাকালে ব্রাহ্মণেরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিলেন, তাঁদের প্রতি একটি বিশেষ কার্যভার ছিল। সেই কার্যের বিশেষ উপযোগী হবার জন্যে তাঁরা আপনাদের চারি দিকে কতকগুলি আচরণ-অনুষ্ঠানের সীমারেখা অঙ্কিত করেছিলেন। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁরা আপনার চিত্তকে সেই সীমার বাহিরে বিক্ষিপ্ত হতে দিতেন না। সকল কাজেরই এইরূপ একটা উপযোগী সীমা আছে যা অন্য কাজের পক্ষে বাধামাত্র। ময়রার দোকানের মধ্যে অ্যাটর্নি নিজের ব্যবসায় চালাতে গেলে সহস্র বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত না হয়ে থাকতে পারেন না এবং ভূতপূর্ব অ্যাটর্নির আপিসে যদি বিশেষ কারণ-বশত ময়রার দোকান খুলতে হয় তা হলে কি চৌকিটেবিল কাগজপত্র এবং স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ল-রিপোর্টের প্রতি মমতা প্রকাশ করলে চলে।

বর্তমান কালে ব্রাহ্মণের সেই বিশেষত্ব আর নেই। কেবল অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং ধর্মালোচনায় তাঁরা নিযুক্ত নন। তাঁরা অধিকাংশই চাকরি করেন, তপস্যা করতে কাউকে দেখি নে। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, ব্রাহ্মণেতর জাতির কোনো কার্যবৈষম্য দেখা

যায় না, এমন অবস্থায় ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকার কোনো সুবিধা কিম্বা সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কিন্তু সম্প্রতি এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম যে কেবল ব্রাহ্মণকেই বদ্ধ করেছে তা নয়। শূদ্র, শাস্ত্রের বন্ধন যাঁদের কাছে কোনো কালেই দৃঢ় ছিল না তাঁরাও, কোনো-এক অবসরে পূর্বোক্ত গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে বসে আছেন; এখন আর কিছুতেই স্থান ছাড়তে চান না।

পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধমাত্র জ্ঞান ও ধর্মের অধিকার গ্রহণ করাতে স্বভাবতই শূদ্রের প্রতি সমাজের বিবিধ ক্ষুদ্র কাজের ভার ছিল, সুতরাং তাঁদের উপর থেকে আচারবিচার মন্ত্রতন্ত্রের সহস্র বন্ধনপাশ প্রত্যাহরণ করে নিয়ে তাঁদের গতিবিধি অনেকটা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। এখন ভারতব্যাপী একটা প্রকাণ্ড লূতাতন্তুজালের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই হস্তপদবদ্ধ হয়ে মৃতবৎ নিশ্চল পড়ে আছেন। না তাঁরা পৃথিবীর কাজ করছেন, না পারমার্থিক যোগসাধন করছেন। পূর্বে যে-সকল কাজ ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেছে, সম্প্রতি যে কাজ আবশ্যক হয়ে পড়েছে তাকেও পদে পদে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

অতএব বোঝা উচিত, এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচারবিচার নিয়ে খুঁত খুঁত করে বসনের অগ্রভাগটি তুলে ধ'রে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত ক'রে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না— যেন এই বিশাল বিশ্বসংসার একটা পঙ্ককুণ্ড, শ্রাবণ মাসের কাঁচা রাস্তা, পবিত্র ব্যক্তির কমলচরণতলের অযোগ্য। এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসার, সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থ-ভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।

সাধারণ পৃথিবীর স্পর্শ সযত্নে পরিহার ক'রে, মহামান্য আপনাটিকে সর্বদা ধুয়েমেজে ঢেকেঢুকে, অন্য সমস্তকে ইতর আখ্যা দিয়ে ঘৃণা করে আমরা যে-রকম ভাবে চলেছিলুম তাকে আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা বলে— এই-রকম অতিবিলাসিতায় মনুষ্যত্ব ক্রমে অকর্মণ্য ও বন্ধ্য হয়ে আসে।

জড়পদার্থকেই কাঁচের আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখা যায়। জীবকেও যদি অত্যন্ত পরিষ্কার রাখবার জন্য নির্মল স্ফটিক-আচ্ছাদনের মধ্যে রাখা যায় তা হলে ধূলি রোধ করা হয় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যও রোধ করা হয়, মলিনতা এবং জীবন দুটোকেই যথাসম্ভব হ্রাস করে দেওয়া হয়।

আমাদের পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, আমরা যে একটি আশ্চর্য আর্য-পবিত্রতা লাভ

করেছি তা বহু সাধনার ধন, তা অতিযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য; সেইজন্তই আমরা ম্লেচ্ছ যবনদের সংস্পর্শ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে চেষ্টা করে থাকি।

এ সম্বন্ধে ছুটি কথা বলবার আছে। প্রথমত আমরা সকলেই যে বিশেষরূপে পবিত্রতার চর্চা করে থাকি তা নয়, অথচ অধিকাংশ মানবজাতিকে অপবিত্র জ্ঞান করে একটা সম্পূর্ণ অন্তায় বিচার, অমূলক অহংকার, পরস্পরের মধ্যে অনর্থক ব্যবধানের সৃষ্টি করা হয়। এই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে এই বিজাতীয় মানবঘৃণা আমাদের চরিত্রের মধ্যে যে কীটের ন্যায় কার্য করে তা অনেকে অস্বীকার করে থাকেন। তাঁরা অম্লানমুখে বলেন, কই, আমরা ঘৃণা কই করি! আমাদের শাস্ত্রেই যে আছে বসুধৈব কুটুম্বকম্। শাস্ত্রে কী আছে এবং বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যায় কী দাঁড়ায় তা বিচার্য নয়, কিন্তু আচরণে কী প্রকাশ পায় এবং সে আচরণের আদিম কারণ যাই থাক্ তার থেকে সাধারণের চিত্তে স্বভাবতই মানবঘৃণার উৎপত্তি হয় কি না, এবং কোনো-একটি জাতির আপামর সাধারণে অপর সমস্ত জাতিকে নির্বিচারে ঘৃণা করবার অধিকারী কি না, তাই বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আর-একটি কথা, জড়পদার্থই বাহ্য মলিনতায় কলঙ্কিত হয়। শখের পোশাকটি পরে যখন বেড়াই তখন অতি সন্তর্পণে চলতে হয়। পাছে ধুলো লাগে, জল লাগে, কোনো-রকম দাগ লাগে, অনেক সাবধানে আসন গ্রহণ করতে হয়। পবিত্রতা যদি পোশাক হয় তবেই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় পাছে এর ছোঁওয়া লাগলে কালো হয়ে যায়, ওর হাওয়া লাগলে চিহ্ন পড়ে। এমন একটি পোশাকি পবিত্রতা নিয়ে সংসারে বাস করা কী বিষম বিপদ। জনসমাজের রণক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে এবং রঙ্গভূমিতে ঐ অতি পরিপাটি পবিত্রতাকে সামলে চলা অত্যন্ত কঠিন হয় বলে শুচিবায়ুগ্রস্ত দুর্ভাগা জীব আপন বিচরণ-ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ করে আনে, আপনাকে কাপড়টা-চোপড়টার মতো সর্বদা সিন্দুকের মধ্যে তুলে রাখে, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ কখনোই তার দ্বারা সম্ভব হয় না।

আত্মার আন্তরিক পবিত্রতার প্রভাবে বাহ্য মলিনতাকে কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষা না করলে চলে না। অত্যন্ত রূপপ্রয়াসী ব্যক্তি বর্ণবিকারের ভয়ে পৃথিবীর ধুলামাটি জলরৌদ্র বাতাসকে সর্বদা ভয় করে চলে এবং ননির পুতুলটি হয়ে নিরাপদ স্থানে বিরাজ করে। ভুলে যায় যে, বর্ণসৌকুমার্য সৌন্দর্যের একটি বাহ্য উপাদান, কিন্তু স্বাস্থ্য তার একটি প্রধান আভ্যন্তরিক প্রতিষ্ঠাভূমি— জড়ের পক্ষে এই স্বাস্থ্য অনাবশ্যক, সুতরাং তাকে ঢেকে রাখলে ক্ষতি নেই। কিন্তু আত্মাকে যদি মৃত জ্ঞান না কর তবে কিয়ৎপরিমাণে মলিনতার আশঙ্কা থাকলেও তার স্বাস্থ্যের উদ্দেশে, তার বল উপার্জনের উদ্দেশে, তাকে সাধারণ জগতের সংস্রবে আনা আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক বাবুয়ানা কথাটা কেন ব্যবহার করেছিলুম এইখানে তা বুঝা যাবে। অতিরিক্ত বাহ্যসুখপ্রিয়তাকেই বিলাসিতা বলে, তেমনি অতিরিক্ত বাহ্যপবিত্রতা-প্রিয়তাকে আধ্যাত্মিক বিলাসিতা বলে। একটু খাওয়াটি শোওয়াটি বসাটির ইদিক-ওদিক হলেই যে সুকুমার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হয় তা বাবুয়ানার অঙ্গ। এবং সকল-প্রকার বাবুয়ানাই মনুষ্যত্বের বলবীর্যনাশক।

সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পরিমাণে নিরাপদ সে কথা অস্বীকার করা যায় না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয়, সে কথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক সেখানে স্বাধীনতা অধিক এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দু'ই প্রবল। যদি মানুষের নখদন্ত উৎপাটন করে আহার কমিয়ে দিয়ে দুই বেলা চাবুকের ভয় দেখানো হয় তা হলে একদল চলৎশক্তিরহিত অতিনিরীহ পোষা প্রাণীর সৃষ্টি হয়, জীবস্বভাবের বৈচিত্র্য একেবারে লোপ হয়; দেখে বোধ হয় ভগবান এই পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে নির্মাণ করেছেন, জীবের আবাসভূমি করেন নি।

কিন্তু সমাজের যে-সকল প্রাচীন ধাত্রী আছেন তাঁরা মনে করেন সুস্থ ছেলে দুরন্ত হয় এবং দুরন্ত ছেলে কখনো কাঁদে, কখনো ছুটোছুটি করে, কখনো বাইরে যেতে চায়, তাকে নিয়ে বিষম ঝঞ্ঝাট, অতএব তার মুখে কিঞ্চিৎ অহিফেন দিয়ে তাকে যদি মৃতপ্রায় করে রাখা যায় তা হলেই বেশ নির্ভাবনায় গৃহকার্য করা যেতে পারে।

সমাজ যতই উন্নতি লাভ করে ততই তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের জটিলতা স্বভাবতই বেড়ে উঠতে থাকে। যদি আমরা বলি, আমরা এতটা পেরে উঠব না, আমাদের এত উদ্যম নেই, শক্তি নেই— যদি আমাদের পিতামাতারা বলে, পুত্রকন্যাদের উপযুক্ত বয়স পর্যন্ত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিতে আমরা অশক্ত, কিন্তু মানুষের পক্ষে যত সত্বর সম্ভব (এমন-কি, অসম্ভব বললেও হয়) আমরা পিতামাতা হতে প্রস্তুত আছি— যদি আমাদের ছাত্রবৃন্দ বলে, সংযম আমাদের পক্ষে অসাধ্য, শরীরের সম্পূর্ণতা -লাভের জন্য প্রতীক্ষা করতে আমরা নিতান্তই অসমর্থ, অকালে অপবিত্র দাম্পত্য আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং হিঁদুয়ানিরও সেই বিধান— আমরা চাই নে উন্নতি, চাই নে ঝঞ্ঝাট— আমাদের এই-রকম ভাবেই বেশ চলে যাবে— তবে নিরুত্তর হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু এ কথাটুকু বলতেই হয় যে, হীনতাকে হীনতা বলে অনুভব করাও ভালো, কিন্তু বুদ্ধিবলে নির্জীবতাকে সাধুতা এবং অক্ষমতাকে সর্বশ্রেষ্ঠতা বলে প্রতিপন্ন করলে সদ্‌গতির পথ একেবারে আটেঘাটে বন্ধ করা হয়।

সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের প্রতি যদি আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে তা হলে এত কথা

ওঠে না। তা হলে কৌশলসাধ্য ব্যাখ্যা দ্বারা আপনাকে ভুলিয়ে কতকগুলো সংকীর্ণ বাহ্য সংস্কারের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করার প্রবৃত্তিই হয় না।

আমরা যখন একটা জাতির মতো জাতি ছিলুম তখন আমাদের যুদ্ধ বাণিজ্য শিল্প, দেশে বিদেশে গতায়াত, বিজাতীয়দের সঙ্গে বিবিধ বিদ্যার আদানপ্রদান, দিগ্‌বিজয়ী বল এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য ছিল। আজ বহু বৎসর এবং বহু প্রভেদের ব্যবধান থেকে কালের সীমান্ত-দেশে আমরা সেই ভারতসভ্যতাকে পৃথিবী হতে অতিদূরবর্তী একটি তপঃপূত হোমধূমরচিত অলৌকিক সমাধিরাজ্যের মতো দেখতে পাই এবং আমাদের এই বর্তমান স্নিগ্ধচ্ছায়া কর্মহীন নিদ্রালস নিস্তব্ধ পল্লীটির সঙ্গে তার কতকটা ঐক্য অনুভব করে থাকি, কিন্তু সেটা কখনোই প্রকৃত নয়।

আমরা যে কল্পনা করি আমাদের কেবল আধ্যাত্মিক সভ্যতা ছিল— আমাদের উপবাসক্ষীণ পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকে একলা একলা বসে আপন আপন জীবাত্মাটি হাতে নিয়ে কেবলই শান দিতেন— তাকে একেবারে কর্মাতীত অতিসূক্ষ্ম জ্যোতির্ রেখাটুকু করে তোলবার চেষ্টা— সেটা নিতান্ত কল্পনা।

আমাদের সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন প্রাচীন সভ্যতা বহু দিন হল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদের বর্তমান সমাজ তারই প্রেতযোনি মাত্র। আমাদের অবয়ব-সাদৃশ্যের উপর ভর করে আমরা মনে করি আমাদের প্রাচীন সভ্যতারও এইরূপ দেহের লেশমাত্র ছিল না, কেবল একটা ছায়াময় আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাতে ক্ষিত্যপ্‌তেজের সংস্রবমাত্র ছিল না, ছিল কেবল খানিকটা মরুৎ এবং ব্যোম।

এক মহাভারত পড়লেই দেখতে পাওয়া যায় আমাদের তখনকার সভ্যতার মধ্যে জীবনের আবেগ কত বলবান ছিল। তার মধ্যে কত পরিবর্তন, কত সমাজবিপ্লব, কত বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ দেখতে পাওয়া যায়। সে সমাজ কোনো-একজন পরম বুদ্ধিমান শিল্পচতুর লোকের স্বহস্তরচিত অতি সুচারু পরিপাটি সমভাববিশিষ্ট কলের সমাজ ছিল না। সে সমাজে এক দিকে লোভ হিংসা ভয় দ্বেষ অসংযত অহংকার, অন্য দিকে বিনয় বীরত্ব আত্মবিসর্জন উদার মহত্ত্ব এবং অপূর্ব সাধুভাব মনুষ্যচরিত্রকে সর্বদা মথিত ক'রে জাগ্রত করে রেখেছিল। সে সমাজে সকল পুরুষ সাধু, সকল স্ত্রী সতী, সকল ব্রাহ্মণ তপঃপরায়ণ ছিলেন না। সে সমাজে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, দ্রোণ কৃপ পরশুরাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কুন্তী সতী ছিলেন, ক্ষমাপরায়ণ যুধিষ্ঠির ক্ষত্রিয় পুরুষ ছিলেন এবং শত্রুরক্ত-লোলুপা তেজস্বিনী দ্রৌপদী রমণী ছিলেন। তখনকার সমাজ ভালোয়-মন্দয় আলোকে-অন্ধকারে জীবনলক্ষণাক্রান্ত ছিল; মানবসমাজ চিহ্নিত বিভক্ত সংযত সমাহিত কারু-কার্যের মতো ছিল না। এবং সেই বিপ্লবসংক্ষুব্ধ বিচিত্র মানবরৃত্তির সংঘাত দ্বারা সর্বদা

জাগ্রতশক্তিপূর্ণ সমাজের মধ্যে আমাদের প্রাচীন ব্যূঢ়োরস্ক শালপ্রাংশু সভ্যতা উন্নতমস্তকে বিহার করত।

সেই প্রবল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীব ভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি, আমরা সেই সভ্য জাতি, আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্য; আমরা কেবল জপতপ করব, দলাদলি করব; সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে, ভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্যশ্রেণীভুক্ত ক'রে, আমরা সেই মহৎ প্রাচীন হিন্দুনামের সার্থকতা সাধন করব।

কিন্তু তার চেয়ে যদি সত্যকে ভালোবাসি, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করি, ঘরের ছেলেদের রাশীকৃত মিথ্যার মধ্যে গোলগাল গলগ্রহের মতো না করে তুলে সত্যের শিক্ষায় সরল সবল দৃঢ় করে উন্নতমস্তকে দাঁড় করাতে পারি, যদি মনের মধ্যে এমন নিরভিমান উদারতার চর্চা করতে পারি যে চতুর্দিক থেকে জ্ঞান এবং মহত্ত্বকে সানন্দে সবিনয়ে সাদর সম্ভাষণ করে আনতে পারি, যদি সংগীত শিল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করে— দেশে বিদেশে ভ্রমণ করে— পৃথিবীতে সমস্ত তন্ন তন্ন নিরীক্ষণ করে এবং মনোযোগসহকারে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে আপনাকে চারি দিকে উন্মুক্ত বিকশিত করে তুলতে পারি, তা হলে আমি যাকে হিঁদুয়ানি বলে থাকি তা সম্পূর্ণ টিকবে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু প্রাচীনকালে যে সজীব সচেষ্ট তেজস্বী হিন্দুসভ্যতা ছিল তার সঙ্গে অনেকটা আপনাদের ঐক্য সাধন করতে পারব।

এইখানে আমার একটি তুলনা মনে উদয় হচ্ছে। বর্তমান কালে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা খনির ভিতরকার পাথুরে কয়লার মতো। এক কালে যখন তার মধ্যে হ্রাসবৃদ্ধি-আদানপ্রদানের নিয়ম বর্তমান ছিল তখন সে বিপুল অরণ্যরূপে জীবিত ছিল। তখন তার মধ্যে বসন্ত-বর্ষার সজীব সমাগম এবং ফলপুষ্পপল্লবের স্বাভাবিক বিকাশ ছিল। এখন তার আর বৃদ্ধি নেই, গতি নেই বলে যে তা অনাবশ্যক তা নয়। তার মধ্যে বহু যুগের উত্তাপ ও আলোক নিহিতভাবে বিরাজ করছে। কিন্তু আমাদের কাছে তা অন্ধকারময় শীতল। আমরা তার থেকে কেবল খেলাচ্ছলে ঘনকৃষ্ণবর্ণ অহংকারের স্তম্ভ নির্মাণ করছি। কারণ নিজের হাতে যদি অগ্নিশিখা না থাকে তবে কেবলমাত্র গবেষণা দ্বারা পুরাকালের তলে গহ্বর খনন করে যতই প্রাচীন খনিজপিণ্ডসংগ্রহ করে আনো-না কেন তা নিতান্ত অকর্মণ্য। তাও যে নিজে সংগ্রহ করছি তাও নয়। ইংরেজের রানীগঞ্জের বাণিজ্যশালা থেকে কিনে আনছি। তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু করছি কী। আগুন নেই, কেবলই ফুঁ দিচ্ছি, কাগজ নেড়ে বাতাস করছি এবং কেউ বা তার কপালে সিঁদুর মাখিয়ে সামনে বসে ভক্তিভরে ঘণ্টা নাড়ছেন।

নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাকলে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বকে, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে, নিজের ব্যবহারে আনতে পারা যায়।

মৃত মনুষ্যই যেখানে পড়ে আছে সম্পূর্ণরূপে সেইখানকারই। জীবিত মনুষ্য দশ দিকের কেন্দ্রস্থলে। সে ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এবং বিপরীতের মধ্যে সেতুস্থাপন করে সকল সত্যের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তার করে; এক দিকে নত না হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়াকেই সে আপনার প্রকৃত উন্নতি জ্ঞান করে।

১২৯৮

সমাজভেদ

গত জানুয়ারি মাসে 'কণ্টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রে ডাক্তার ডিলন 'ব্যাঘ্র চীন এবং মেষশাবক য়ুরোপ' নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে যুদ্ধ-উপলক্ষে চীনবাসীদের প্রতি য়ুরোপের অকথ্য অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। জঙ্গিস খাঁ, তৈমুর লং প্রভৃতি লোকশত্রুদিগের ইতিহাসবিখ্যাত নিদারুণ কীর্তি সভ্য য়ুরোপের উন্মত্ত বর্বরতার নিকট নতশির হইল।

য়ুরোপ নিজের দয়াধর্মপ্রবণ সভ্যতার গৌরব করিয়া এশিয়াকে সর্বদাই ধিক্‌কার দিয়া থাকে, তাহার জবাব দিবার উপলক্ষ পাইয়া আমাদের কোনো সুখ নাই। কারণ, অপবাদ রটনা করিয়া দুর্বল সবলের কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। কিন্তু সবল দুর্বলের নামে যে অপবাদ ঘোষণা করে তাহা দুর্বলের পক্ষে কোনো-না কোনো সময়ে সাংঘাতিক হইয়া উঠে।

সাধারণত এশিয়া-চরিত্রের ক্রূরতা বর্বরতা দুর্জ্ঞেয়তা য়ুরোপীয় সমাজে একটা প্রবাদবাক্যের মতো। এইজন্য এশিয়াকে য়ুরোপের আদর্শে বিচার করা কর্তব্য নহে, এই একটা ধুয়া আজকাল খৃস্টান-সমাজে বেশি করিয়া উঠিয়াছে।

আমরা যখন য়ুরোপের শিক্ষা প্রথম পাইলাম তখন 'মানুষে মানুষে অভেদ' এই ধুয়াটাই সে শিক্ষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেইজন্য আমাদের নূতন শিক্ষকটির সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রভেদ যাহাতে ঘুচিয়া যায় আমরা সেইভাবেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছিলাম। এমন সময় মাস্টারমশায় তাঁহার ধর্মশাস্ত্র বন্ধ করিয়া বলিলেন, পূর্ব-পশ্চিমে এমন প্রভেদ যে সে আর লঙ্ঘন করিবার জো নাই।

আচ্ছা বেশ, প্রভেদ আছে, প্রভেদ থাক্‌। বৈচিত্র্যই সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করে।

পৃথিবীতে শীতাতপ সব জায়গায় সমান নহে বলিয়াই বায়ু চলাচল করে। সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সার্থক হইয়া আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে থাক্‌; তাহা হইলে সেই স্বাতন্ত্র্যে পরস্পরের নিকট শিক্ষার আদানপ্রদান হইতে পারে।

এখন তো দেখিতেছি, গালাগালি গোলাগুলির আদান-প্রদান চলিয়াছে। নূতন খৃস্টান শতাব্দী এমনি করিয়া আরম্ভ হইল।

ভেদ আছে স্বীকার করিয়া লইয়া বুদ্ধির সহিত, প্রীতির সহিত, সহৃদয় বিনয়ের সহিত, তাহার অভ্যন্তরে যদি প্রবেশ করিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে খৃষ্টীয় শিক্ষায় উনিশ শত বৎসর কী কাজ করিল? কামানের গোলায় প্রাচ্য দুর্গের দেয়াল ভাঙিয়া একাকার করিবে, না চাবি দিয়া তাহার সিংহদ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে?

মিশনারিদের প্রতি চীনবাসীদের আক্রমণ হইতে চানে বর্তমান বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। য়ুরোপ এ কথা সহজেই মনে করিতে পারে যে, ধর্মপ্রচার বা শিক্ষাবিস্তার লইয়া অধৈর্য ও অনৌদার্য চীনের বর্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে। মিশনারি তো চীন রাজত্ব জয় করিতে যায় নাই।

এইখানে পূর্ব-পশ্চিমে ভেদ আছে এবং সেই ভেদ য়ুরোপ শ্রদ্ধার সহিত, সহিষ্ণুতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা করে না; কারণ, তাহার গায়ের জোর আছে।

চীনের রাজত্ব চীনের রাজার। যদি কেহ রাজ্য আক্রমণ করে তবে রাজায় রাজায় লড়াই বাধে, তাহাতে প্রজাদের যে ক্ষতি হয় তাহা সাংঘাতিক নহে। কিন্তু য়ুরোপের রাজত্ব রাজার নহে, তাহা সমস্ত রাজ্যের। রাষ্ট্রতন্ত্রই য়ুরোপীয় সভ্যতার কলেবর; এই কলেবরটিকে আঘাত হইতে রক্ষা না করিলে তাহার প্রাণ বাঁচে না। সুতরাং অন্য কোনো-প্রকার আঘাতের গুরুত্ব তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। বিবেকানন্দ বিলাতে যদি বেদান্তপ্রচার করেন এবং ধর্মপাল যদি সেখানে ইংরেজ বৌদ্ধসম্প্রদায় স্থাপন করেন, তাহাতে য়ুরোপের গায়ে বাজে না, কারণ য়ুরোপের গা রাষ্ট্রতন্ত্র। জিব্রল্টরের পাহাড়টুকু সমস্ত ইংলণ্ড প্রাণ দিয়া রক্ষা করিবে, কিন্তু খৃস্টান ধর্ম সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সে আবশ্যক বোধ করে না।

পূর্বদেশে তাহার বিপরীত। প্রাচ্যসভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে; কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই। শিথিল রাজশক্তি বিপুল চীনের সর্বত্র আপনাকে প্রবলভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিতে পারে না। রাজধানী হইতে সুদূরবর্তী দেশগুলিতে রাজার আজ্ঞা পৌঁছে, রাজপ্রতাপ পৌঁছে না; কিন্তু তথাপি

সেখানে শান্তি আছে, শৃঙ্খলা আছে, সভ্যতা আছে। ডাক্তার ডিলন ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অল্পই বল ব্যয় করিয়া এত বড়ো রাজ্য সংযত রাখা সহজ কথা নহে।

কিন্তু বিপুল চীনদেশ শস্ত্রশাসনে সংযত হইয়া নাই, ধর্মশাসনেই সে নিয়মিত। পিতাপুত্র ভ্রাতাভগিনী স্বামীস্ত্রী প্রতিবেশী-পল্লীবাসী রাজাপ্রজা যাজক-যজমানকে লইয়া এই ধর্ম। বাহিরে যতই বিপ্লব হউক, রাজাসনে যে-কেহই অধিরোহণ করুক, এই ধর্ম বিপুল চীনদেশের অভ্যন্তরে থাকিয়া অখণ্ড নিয়মে এই প্রকাণ্ড জনসমাজকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। সেই ধর্মে আঘাত লাগিলে চীন মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য নিষ্ঠুর হইয়া উঠে। তখন কে তাহাকে ঠেকাইবে। তখন রাজাই বা কে, রাজার সৈন্যই বা কে। তখন চীনসাম্রাজ্য নহে, চীনজাতি জাগ্রত হইয়া উঠে।

একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্তে আমার কথা পরিষ্কার হইবে। ইংরেজপরিবার ব্যক্তিবিশেষের জীবিতকালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আমাদের পরিবার কুলের অঙ্গ। এইটুকু প্রভেদে সমস্তই তফাত হইয়া যায়। ইংরেজ এই প্রভেদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে হিন্দুপরিবারের দরদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না এবং অনেক বিষয়ে অসহিষ্ণু ও অবজ্ঞাপরায়ণ হইয়া উঠিবে। কুলসূত্রে হিন্দুপরিবারে জীবিত মৃত ও ভাবী অজাতগণ পরস্পর সংযুক্ত। অতএব, হিন্দুপরিবারের মধ্য হইতে কেহ যদি কুলত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা পরিবারের পক্ষে কিরূপ গুরুতর আঘাত, ইংরেজ তাহা বুঝিতে পারে না। কারণ, ইংরেজ-পরিবারে দাম্পত্যবন্ধন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধন দৃঢ় নহে। এইজন্য হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ বৈধ হইয়াও সমাজে প্রচলিত হইল না। কারণ, জীবিত প্রাণী যেমন তাহার কোনো সজীব অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না, হিন্দু-পরিবারও সেইরূপ বিধবাকে ত্যাগ করিয়া নিজেকে বিক্ষত করিতে প্রস্তুত নহে। বাল্যবিবাহও হিন্দুপরিবার এইজন্যই শ্রেয়োজ্ঞান করে। কারণ, প্রেমসঞ্চারের উপযুক্ত বয়স হইলেই স্ত্রীপুরুষে মিলন হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত পরিবারের সঙ্গে একীভূত হইবার বয়স বাল্যকাল।

বিধবাবিবাহের নিষেধ এবং বাল্যবিবাহের বিধি অন্য দিকে ক্ষতিকর হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর সমাজসংস্থান যে ব্যক্তি বোঝে সে ইহাকে বর্বরতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। ভারতবর্ষ রক্ষা করিতে গিয়া ইংরেজকে যেমন ব্যয়বাহুল্যসত্ত্বেও জিব্রল্টার মাল্টা সুয়েজ এবং এডেন রক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ পরিবারের দৃঢ়তা ও অখণ্ডতা রক্ষা করিতে হইলে হিন্দুকে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও এই-সকল নিয়ম পালন করিতে হয়।

এইরূপ সুদৃঢ়ভাবে পরিবার ও সমাজ গঠন ভালো কি না সে তর্ক ইংরেজ তুলিতে

পারে। আমরা বলি রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চে রাখিয়া পোলিটিকাল দৃঢ়তা-সাধন ভালো কি না সেও তর্কের বিষয়। দেশের জন্য সমস্ত প্রয়োজনকে উত্তরোত্তর খর্ব করিয়া সৈনিকগঠনে য়ুরোপ প্রতিদিন পীড়িত হইয়া উঠিতেছে, সৈন্যসম্প্রদায়ের অতিভারে তাহার সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হইতেছে। ইহার সমাপ্তি কোথায়। নিহিলিস্ট্‌দের অগ্ন্যুৎপাতে, না পরস্পরের প্রলয়সংঘর্ষে? আমরা স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারকে সহস্র বন্ধনে বদ্ধ করিয়া মরিতেছি ইহাই যদি সত্য হয়, য়ুরোপ স্বার্থ ও স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া চিরজীবী হইবে কি না তাহারও পরীক্ষা বাকি আছে।

যাহাই হউক, পূর্ব ও পশ্চিমের এই-সকল প্রভেদ চিন্তা করিয়া বুঝিয়া দেখিবার বিষয়। য়ুরোপের প্রথাগুলিকে যখন বিচার করিতে হয় তখন য়ুরোপের সমাজতন্ত্রের সহিত তাহাকে মিলাইয়া বিচার না করিলে, আমাদের মনেও অনেক সময় অন্যায় অবজ্ঞার সঞ্চার হয়। তাহার সাক্ষী, বিলাতি সমাজে কন্যাকে অধিক বয়স পর্যন্ত কুমারী রাখার প্রতি আমরা কটাক্ষপাত করি; আমাদের নিকট এ প্রথা অভ্যস্ত নহে বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে নানা-প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া থাকি। অথচ বালবিধবাকে চিরজীবন অবিবাহিত রাখা তদপেক্ষা আশঙ্কাজনক, সে কথা আমরা বিচারের মধ্যেই আনি না। কুমারীর বেলায় আমরা বলি মনুষ্যপ্রকৃতি দুর্বল, অথচ বিধবার বেলায় বলি শিক্ষাসাধনায় প্রকৃতিকে বশে আনা যায়। কিন্তু আসল কথা, এ-সকল নিয়ম কোনো নীতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয় নাই, প্রয়োজনের তাড়নে দাঁড়াইয়া গেছে। অল্প বয়সে কুমারীর বিবাহ হিন্দুসমাজের পক্ষে যেমন প্রয়োজনীয়, চিরবৈধব্যও সেইরূপ। সেইজন্যই আশঙ্কাসত্ত্বেও বিধবার বিবাহ হয় না এবং অনিষ্ট-অসুবিধাসত্ত্বেও কুমারীর বাল্যবিবাহ হয়। আবশ্যকের নিয়মেই য়ুরোপে অধিক বয়সে কুমারীর বিবাহ এবং বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। সেখানে অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকাকে লইয়া স্বাধীন গৃহস্থাপন সম্ভবপর নহে, সেখানে বিধবা কোনো পরিবারের আশ্রয় পায় না বলিয়া তাহার পক্ষে অনেক সময়েই দ্বিতীয়বার বিবাহ নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম য়ুরোপীয় সমাজতন্ত্ররক্ষার অনুকূল বলিয়াই মুখ্যত ভালো, ইহার অন্য ভালো যাহা-কিছু আছে তাহা আকস্মিক, তাহা অবান্তর।

সমাজে আবশ্যকের অনুরোধে যাহা প্রচলিত হয়, ক্রমে তাহার সহিত ভাবের সৌন্দর্য জড়িত হইয়া পড়ে। বয়ঃপ্রাপ্ত কুমার-কুমারীর স্বাধীন প্রেমাবেগের সৌন্দর্য য়ুরোপীয় চিত্তে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে তাহা য়ুরোপের সাহিত্য পড়িলেই প্রতীতি হইবে। সেই প্রেমের আদর্শকে য়ুরোপীয় কবিরা দিব্যভাবে উজ্জ্বল করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পতিব্রতা-গৃহিণীর কল্যাণপরায়ণ ভাবটিই মধুর হইয়া হিন্দুচিত্তকে

অধিকার করিয়াছে। সেই ভাবের সৌন্দর্য আমাদের সাহিত্যে অন্য-সকল সৌন্দর্যের উচ্চে স্থান পাইয়াছে। সে আলোচনা আমরা অন্য প্রবন্ধে করিব।

কিন্তু তাই বলিয়া যে স্বাধীন প্রেমের সৌন্দর্যে সমস্ত য়ুরোপীয় সমাজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে অনাদর করিলে আমাদের অন্ধতা ও মূঢ়তা প্রকাশ হইবে। বস্তুত তাহা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। যদি না করিত তবে ইংরেজি কাব্য উপন্যাস আমাদের পক্ষে মিথ্যা হইত। সৌন্দর্য হিন্দু বা ইংরেজের মধ্যে জাতিভেদ রক্ষা করিয়া চলে না। ইংরেজি সমাজের আদর্শগত সৌন্দর্যকে সাহিত্য যখন পরিস্ফুট করিয়া দেখায় তখন তাহা আমাদের জাতীয় সংস্কারকে অভিভূত করিয়া হৃদয়ে দীপ্যমান হয়। তেমনি আমাদের হিন্দু পারিবারিক আদর্শের মধ্যে যে একটি কল্যাণময়ী সৌন্দর্যশ্রী আছে, তাহা যদি ইংরেজ দেখিতে না পায়, তবে ইংরেজ সেই অংশে বর্বর।

য়ুরোপীয় সমাজ অনেক মহাত্মা লোকের সৃষ্টি করিয়াছে; সেখানে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান প্রত্যহ উন্নতিলাভ করিয়া চলিতেছে; এ সমাজ নিজের মহিমা নিজে পদে পদে প্রমাণ করিয়া অগ্রসর হইতেছে; ইহার নিজের অশ্ব উন্মত্ত হইয়া না উঠিলে ইহার রথকে বাহির হইতে কেহ প্রতিরোধ করিবে এমন কল্পনাই করিতে পারি না। এমন-তরো গৌরবান্বিত সমাজকে শ্রদ্ধার সহিত পর্যবেক্ষণ না করিয়া ইহাকে যাহারা ব্যঙ্গ করে, বাংলাদেশের সেই-সকল সুলভ লেখক অজ্ঞাতসারে নিজের প্রতিই বিদ্রূপ করিয়া থাকে।

অপর পক্ষে বহুশত বৎসরের অনবরত বিপ্লব যে সমাজকে ভূমিসাৎ করিতে পারে নাই, সহস্র দুর্গতি সহ্য করিয়াও যে সমাজ ভারতবর্ষকে দয়াধর্ম-ক্রিয়াকর্তব্যের মধ্যে সংযত করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে, রসাতলের মধ্যে নামিতে দেয় নাই, যে সমাজ হিন্দু-জাতির বুদ্ধিবৃত্তিকে সতর্কতার সহিত এমন ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে যে বাহির হইতে উপকরণ পাইলেই তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে, যে সমাজ মূঢ় অশিক্ষিত জনমণ্ডলীকেও পদে পদে প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরিবার ও সমাজের হিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই সমাজকে যে মিশনারি শ্রদ্ধার সহিত না দেখেন তিনিও শ্রদ্ধার যোগ্য নহেন। তাঁহার এইটুকু বোঝা দরকার যে, এই বিপুল সমাজ একটি বৃহৎ প্রাণীর ন্যায়; আবশ্যক হইলেও, ইহার কোনো-এক অঙ্গে আঘাত করিবার পূর্বে সমগ্র প্রাণীটির শরীরতত্ত্ব আলোচনা করার প্রয়োজন হয়।

বস্তুত সভ্যতার ভিন্নতা আছে; সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত। এই ভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানোজ্জ্বল সহৃদয়তা লইয়া পরস্পর প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই এই বৈচিত্র্যের সার্থকতা। যে শিক্ষা ও অভ্যাসে এই প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয় তাহা

বর্বরতার সোপান। তাহাতেই অন্যায় অবিচার নিষ্ঠুরতার সৃষ্টি করিতে থাকে। প্রকৃত সভ্যতার লক্ষণ কী। সেই সভ্যতা যাহাকে অধিকার করিয়াছে, স সর্বজ্ঞঃ সর্বমেবাবিবেশ : তিনি সকলকে জানেন ও সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। যাহা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সর্বদাই উপহাস করে ও ধিক্‌কার দেয় তাহা হিঁদুয়ানি, কিন্তু হিন্দুসভ্যতা নহে। তেমনি যাহা প্রাচ্যসভ্যতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তাহা সাহেবিয়ানা, কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা নহে। যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ তাহা আদর্শই নহে।

সম্প্রতি য়ুরোপে এই অন্ধ বিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। রাবণ যখন স্বার্থান্ধ হইয়া অধর্মে প্রবৃত্ত হইল তখন লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। আধুনিক য়ুরোপের দেবমণ্ডপ হইতে লক্ষ্মী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছেন। সেইজন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে।

১৩০৮

ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত

অন্যত্র[১] বলিয়াছি কোনো ইংরেজ অধ্যাপক এ দেশে জুরির বিচার সম্বন্ধে আলোচনা-কালে বলিয়াছিলেন যে, যে দেশের অর্ধসভ্য লোক প্রাণের মাহাত্ম্য (Sanctity of Life) বোঝে না, তাহাদের হাতে জুরি-বিচারের অধিকার দেওয়া অন্যায়।

প্রাণের মাহাত্ম্য ইংরেজ আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, সে কথা নাহয় স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল। অতএব সেই ইংরেজ যখন প্রাণ হনন করে তখন তাহার অপরাধের গুরুত্ব আমাদের চেয়ে বেশি। অথচ দেখিতে পাই, দেশীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরেজ খুনি ইংরেজ জজ ও ইংরেজ জুরির বিচারে ফাঁসি যায় নাই। প্রাণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাহাদের বোধশক্তি যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইংরেজ অপরাধী হয়তো তাহার প্রমাণ পায়, কিন্তু সে প্রমাণ দেশীয় লোকদের কাছে কিছু অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে।

এইরূপ বিচার আমাদিগকে দুই দিক হইতে আঘাত করে। প্রাণ যা যাবার সে তো যায়ই, ও দিকে মানও নষ্ট নয়। ইহাতে আমাদের জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহা আমাদের সকলেরই গায়ে বাজে।

ইংলণ্ডে গ্লোব বলিয়া একটি সংবাদপত্র আছে। সেটা সেখানকার ভদ্রলোকেরই কাগজ। তাহাতে লিখিয়াছে— টমি অ্যাট্‌কিন (অর্থাৎ পল্টনের গোরা) দেশী লোককে

১ দ্রষ্টব্য 'অপমানের প্রতিকার', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৫১০

মারিয়া ফেলিবে বলিয়া মারে না, কিন্তু মার খাইলেই দেশী লোকগুলা মরিয়া যায়; এই জন্ত টমি-বেচারার লঘু দণ্ড হইলেই দেশী খবরের কাগজগুলা চাৎকার করিয়া মরে।

টমি অ্যাট্‌কিনের প্রতি দরদ খুব দেখিতেছি, কিন্তু 'স্যাঙ্ক্‌টিটি অফ লাইফ' কোন্‌খানে। যে পাশব আঘাতে আমাদের পিলা ফাটে এই ভদ্রকাগজের কয় ছত্রের মধ্যেও কি সেই আঘাতেরই বেগ নাই। স্বজাতিকৃত খুনকে কোমল স্নেহের সহিত দেখিয়া হত ব্যক্তির আত্মীয়সম্প্রদায়ের বিলাপকে যাহারা বিরক্তির সহিত ধিক্‌কার দেয় তাহারাও কি খুন পোষণ করিতেছে না।

কিছু কাল হইতে আমরা দেখিতেছি, য়ুরোপীয় সভ্যতায় ধর্মনীতির আদর্শ সাধারণত অভ্যাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মবোধশক্তি এই সভ্যতার অন্তঃকরণের মধ্যে উদ্‌ভাসিত হয় নাই। এইজন্ত অভ্যাসের গণ্ডির বাহিরে এই আদর্শ পথ খুঁজিয়া পায় না, অনেক সময় বিপথে মারা যায়।

য়ুরোপীয় সমাজে ঘরে ঘরে কাটাকাটি-খুনাখুনি হইতে পারে না; এরূপ ব্যবহার সেখানকার সাধারণ স্বার্থের বিরোধী। বিষপ্রয়োগ বা অস্ত্রাঘাতের দ্বারা খুন করাটা য়ুরোপের পক্ষে কয়েক শতাব্দী হইতে ক্রমশ অনভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু খুন বিনা অস্ত্রাঘাতে বিনা রক্তপাতে হইতে পারে। ধর্মবোধ যদি অকৃত্রিম আভ্যন্তরিক হয়, তবে সেরূপ খুনও নিন্দনীয় এবং অসম্ভব হইয়া পড়ে।

একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া তোলা যাক।

হেনরি স্যাভেজ ল্যাণ্ডর একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। তিব্বতের তীর্থস্থান লাসায় যাইবার জন্ত তাঁহার দুর্নিবার ঔৎসুক্য জন্মে। সকলেই জানেন, তিব্বতিরা য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ও মিশনারি প্রভৃতিকে সন্দেহ করিয়া থাকে। তাহাদের দুর্গম পথঘাট বিদেশীর কাছে পরিচিত নহে, ইহাই তাহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র; সেই অস্ত্রটি যদি তাহারা জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু অন্তে তাহার নিষেধ মানিবে, সে কাহারো নিষেধ মানিবে না, য়ুরোপের এই ধর্ম। কোনো প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্, শুদ্ধমাত্র বিপদ লঙ্ঘন করিয়া বাহাদুরি করিলে য়ুরোপে এত বাহবা মিলে যে অনেকের পক্ষে সে একটা প্রলোভন। য়ুরোপের বাহাদুর লোকেরা দেশ-বিদেশে বিপদ সন্ধান করিয়া ফেরে। যে-কোনো উপায়ে হোক, লাসায় যে য়ুরোপীয় পদার্পণ করিবে সমাজে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা থাকিবে না।

অতএব তুষারগিরি ও তিব্বতির নিষেধকে ফাঁকি দিয়া লাসায় যাইতে হইবে।

ল্যাণ্ডর সাহেব কুমায়ুনে আলমোড়া হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে এক হিন্দু চাকর আসিয়া জুটিল, তাহার নাম চন্দন সিং।

কুমায়ুনের প্রান্তে তিব্বতের সীমানায় বৃটিশ রাজ্যে শোকা বলিয়া এক পাহাড়ি জাত আছে। তিব্বতিদের ভয়ে ও উপদ্রবে তাহারা কম্পমান। বৃটিশরাজ তিব্বতিদের পীড়ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া ল্যাণ্ডর সাহেব বারম্বার আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শোকাদের মধ্য হইতে সাহেবকে কুলি মজুর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বহুকষ্টে ত্রিশজন কুলি জুটিল।

ইহার পর হইতে যাত্রাকালে সাহেবের এক প্রধান চিন্তা ও চেষ্টা, কিসে কুলিরা না পালায়। তাহাদের পালাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ল্যাণ্ডর তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের পঁচিশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

এই বাহকদল যখন নিঃশব্দ গম্ভীরভাবে বোঝা পিঠে লইয়া করুণাজনক শ্বাসকষ্টের সহিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতেছিল তখন এই ভয় মনে হইতেছিল; ইহাদের মধ্যে কয়জনই বা কোনো কালে ফিরিয়া যাইতে পারিবে।

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এ শঙ্কা যখন তোমার মনে আছে তখন এই অনিচ্ছুক হতভাগ্যদিগকে মৃত্যুমুখে তাড়না করিয়া লইয়া যাওয়াকে কী নাম দেওয়া যাইতে পারে। তুমি পাইবে গৌরব এবং তাহার সঙ্গে অর্থলাভের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। তুমি তাহার প্রত্যাশায় প্রাণপণ করিতে পার, কিন্তু ইহাদের সম্মুখে কোন্ প্রলোভন আছে?

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবচ্ছেদ (vivisection) লইয়া য়ুরোপে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। সজীব জন্তুদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিবার সময়ে যন্ত্রণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবার ঔচিত্যও আলোচিত হয়। কিন্তু বাহাদুরি করিয়া বাহবা লইবার উদ্দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনিচ্ছুক মানুষদের উপরে যে অসহ্য পীড়ন চলে ভ্রমণবৃত্তান্তের গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশ হয়, সমালোচকেরা করতালি দেন, সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, হাজার হাজার পাঠক ও পাঠিকা এই-সকল বর্ণনা বিস্ময়ের সহিত পাঠ ও আনন্দের সহিত আলোচনা করেন। দুর্গম তুষারপথে নিরীহ শোকা বাহকদল দিবারাত্র যে অসহ্য কষ্ট ভোগ করিয়াছে তাহার পরিণাম কী। ল্যাণ্ডর সাহেব নাহয় লাসায় পৌঁছিলেন, তাহাতে জগতের এমন কী উপকার হওয়া সম্ভব যাহাতে এই-সকল ভীত পীড়িত পলায়নেচ্ছু মানুষদিগকে অহরহ এত কষ্ট দিয়া মৃত্যুর পথে তাড়না করা লেশমাত্র বিহিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু কই, এজন্য তো লেখকের সংকোচ নাই, পাঠকের অনুকম্পা নাই!

তিব্বতিরা কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ও হত্যা করিতে পারে, শোকারা সেই কারণে

তিব্বতিদিগকে কিরূপ ভয় করে, তাহাদিগকে তিব্বতিদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বৃটিশরাজ কিরূপ অক্ষম, তাহা ল্যাণ্ডর জানিতেন। ইহাও তিনি জানিতেন, তাঁহার মধ্যে যে উৎসাহ উত্তেজনা ও প্রলোভন কাজ করিতেছে, লোকাদের মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই। তৎসত্বেও ল্যাণ্ডর তাঁহার গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় যে ভাষায় যে ভাবে তাঁহার বাহকদের ভয়দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন তাহা তর্জমা করিয়া দিলাম—

তাহারা প্রত্যেকে হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। কাচির দুই গাল বাহিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, দোলা কোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এবং ডাকু ও অন্য যে-একটি তিব্বতি আমার কাজ লইয়াছিল — যাহারা ভয়ে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিল— তাহারা তাহাদের বোঝার পশ্চাতে লুকাইয়া বসিয়া ছিল। আমাদের অবস্থা যদিও সংকটাপন্ন ছিল তবু আমাদের লোকজনদের এই আতুর দশা দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইহার পরে এই দুর্ভাগারা পলায়নের চেষ্টা করিলে ল্যাণ্ডর তাহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করেন যে, যে-কেহ পলায়নের বা বিদ্রোহের চেষ্টা করিবে তাহাকে গুলি করিয়া মারিব।

কিরূপ তুচ্ছ কারণেই ল্যাণ্ডর সাহেবের গুলি করিবার উত্তেজনা জন্মে অন্যত্র তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। তিব্বতি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ল্যাণ্ডর যখন প্রথম নিষেধ প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি ভান করিলেন, যেন ফিরিয়া যাইতেছেন। একটা উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া দুরবীন কষিয়া দেখিলেন, পাহাড়ের শৃঙ্গের উপর হইতে প্রায় ত্রিশটা মাথা পাথরের আড়ালে উঁকি মারিতেছে। সাহেব লিখিতেছেন—

আমার বড়ো বিরক্তি বোধ হইল। যদি ইচ্ছা হয় তো ইহারা প্রকাশ্যভাবেই আমাদের অনুসরণ করে না কেন। দূর হইতে পাহারা দিবার দরকার কী। অতএব আমি আমার আটশো-গজি রাইফেল লইয়া মাটিতে চ্যাপটা হইয়া শুইলাম এবং যে মাথাটাকে অন্যদের চেয়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির করিলাম।

এই 'অতএব'এর বাহার আছে। লুকাচুরিকে ল্যাণ্ডর সাহেব কী ঘৃণাই করেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গের আর-একটা মিশনারি সাহেব নিজেদের হিন্দু তীর্থযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, প্রকাশ্যে ভারতবর্ষে ফিরিবার ভান করিয়া গোপনে লাসায় যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, কিন্তু পরের লুকাচুরি ইঁহার এতই অসহ্য যে, ভূমিতে চ্যাপটা হইয়া আত্মগোপনপূর্বক তৎক্ষণাৎ আটশো-গজি রাইফেল বাগাইয়া কহিলেন : I only wish to teach these cowards a lesson। 'আমি এই কাপুরুষদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি'। দূর হইতে লুকাইয়া রাইফেল-চালনায় সাহেব যে পৌরুষের পরিচয় দিতেছিলেন তাহার বিচার করিবার কেহ ছিল না। আমাদের ওরিয়েন্টাল্‌দের

অনেক দুর্বলতার কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু চালুনি হইয়া ছুঁচকে বিচার করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদের মতো আমাদের নাই। আসল কথা, গায়ের জোর থাকিলে বিচারাসনের দখল একচেটে করিয়া লওয়া যায়। তখন অন্যকে ঘৃণা করিবার অভ্যাসটাই বদ্ধমূল হইয়া যায়, নিজেকে বিচার করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

আশিয়ায় আফ্রিকায় ভ্রমণকারীরা অনিচ্ছুক ভৃত্য বাহকদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনায় ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগকে যে করিয়া বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যান, তাহা কাহারো অগোচর নাই। অথচ Sanctity of Life সম্বন্ধে এই-সকল পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বোধশক্তি অত্যন্ত সুতীব্র হইলেও কোথাও কোনো আপত্তি শুনিতে পাই না। তাহার কারণ, ধর্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে; স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয় গণ্ডির বাহিরে তাহা বিকৃত হইতে থাকে। এমন-কি, সে গণ্ডির মধ্যেও যেখানে স্বার্থবোধ প্রবল সেখানে দয়াধর্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধ পক্ষের সর্বস্ব জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করিবার বিরুদ্ধে কথা কহা 'সেন্টিমেণ্টালিটি'। য়ুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্সে এক পক্ষ অপর পক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্বদাই দিতেছে। গ্লাডস্টোনও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেলজিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দক্ষিণ-আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ আচরণ চলিতেছে তাহা নিউইয়র্কে প্রকাশিত 'পোস্ট' সংবাদপত্র হইতে গত ২রা জুলাই তারিখের বিলাতি 'ডেলি নিউস'এ সংকলিত হইয়াছে। তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় নিগ্রো স্ত্রীপুরুষকে পুলিসকোর্টে হাজির করা হয়; সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে জরিমানা করে, সেই জরিমানা আদালতে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গেরা শুধিয়া দেয় এবং এই সামান্য টাকার পরিবর্তে তাহারা সেই নিগ্রোদিগকে দাসত্বে ব্রতী করে। তাহার পর হইতে চাবুক লৌহশৃঙ্খল এবং অন্যান্য সকল-প্রকার উপায়েই তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও পলায়ন হইতে রক্ষা করা হয়। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে তো চাবুক মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে দ্বৈধব্য (bigamy) -অপরাধে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। হাজতে থাকার সময় একজন ব্যারিস্টার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করে। কিন্তু কোনো বিচার না হইয়াই নির্দোষ বলিয়া এই স্ত্রীলোকটি খালাস পায়। ব্যারিস্টার

ফি'য়ের দাবি করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্তে এই নিগ্রো স্ত্রীলোকটিকে ম্যাক্রি ক্যাম্পে চৌদ্দ মাস কাজ করিবার জন্ত পাঠায়। সেখানে তাহাকে নয়মাস চাবি তালা দিয়া বন্ধ করিয়া খাটানো হইয়াছে, জোর করিয়া আর-এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমার বৈধস্বামীর সহিত তোমার কোনো কালে মিলন হইবে না। পলায়নের আশঙ্কা করিয়া তাহার পশ্চাতে কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রভু ম্যাক্রিয়া তাহাকে নিজের হাতে চাবুক মারিয়াছে এবং তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, খালাস পাইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে সে মাসে পাঁচ ডলার করিয়া বেতন পাইত।

ডেলি নিউস বলিতেছেন, রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কংগোয় বেলজিয়ামের অত্যাচার প্রভৃতি লইয়া প্রতিবেশীদের প্রতি দোষারোপ করা দুরূহ হইয়াছে।

After all, no great power is entirely innocent of the charge of treating with barbarous harshness the alien races which are subject to its rule.

আমাদের দেশে ধর্মের যে আদর্শ আছে তাহা অন্তরের সামগ্রী, তাহা বাহিরে গণ্ডির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নহে। আমরা যদি Sanctity of Life একবার স্বীকার করি তবে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কোথাও তাহার সীমাস্থাপন করি না। ভারতবর্ষ একসময়ে মাংসাশী ছিল; মাংস আজ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। মাংসাশী জাতি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, জগতে বোধ হয় ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। ভারতবর্ষে দেখিতে পাই অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যাহা উপার্জন করে তাহা দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না। স্বার্থেরও যে একটা ন্যায্য অধিকার আছে, এ কথাটাকে আমরা সর্বপ্রকার অসুবিধা স্বীকার করিয়া যত দূর সম্ভব খর্ব করিয়াছি। আমাদের দেশে বলে, যুদ্ধেও ধর্মরক্ষা করিতে হইবে! নিরস্ত্র, পলাতক, শরণাগত শত্রুর প্রতি আমাদের ক্ষত্রিয়দের যেরূপ ব্যবহার ধর্মবিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে য়ুরোপে তাহা হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার একমাত্র কারণ, ধর্মকে আমরা অন্তরের ধন করিতে চাহিয়াছিলাম। স্বার্থের প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের ধর্মকে গড়িয়া তোলে নাই, ধর্মের নিয়মই আমাদের স্বার্থকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেজন্য আমরা যদি বহির্বিষয়ে দুর্বল হইয়া থাকি, সেই-জন্যই বহিঃশত্রুর কাছে যদি আমাদের পরাজয় ঘটে, তথাপি আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরবলাভ করিয়াছি তাহা কখনোই ব্যর্থ হইবে না— এক দিন তাহারও দিন আসিবে।

১৩১০

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যও মুদ্রিত হইল।

গীতাঞ্জলি

গীতাঞ্জলি ১৩১৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের নিকট গীতাঞ্জলির অনেক অংশের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল; তাহারই সাহায্যে গীতাঞ্জলির অনেক গান ও কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট, এবং রচনা-তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগ্রহে গীতাঞ্জলির অনেক গানের কবির হাতে লেখা প্রেস-কপি রক্ষিত ছিল, তাহা হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

১৩৩৪ সালে প্রকাশিত সংস্করণে 'যাবার দিনে এই কথাটি' গানটি প্রথম গীতাঞ্জলির অন্তর্গত হয়। পাণ্ডুলিপি-পর্যালোচনার ফলে এই গানটির রচনা-তারিখ জানা গিয়াছে ও তদনুসারে ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯-এ প্রকাশিত সংস্করণে কালানুক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানটির পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিও এই খণ্ডে মুদ্রিত হইল।

গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি' গানটি পরবর্তী কোনো সংস্করণে বর্জিত হয়, তদবধি এটি গীতাঞ্জলিতে আর মুদ্রিত হয় না। গানটি প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অন্তর্গত; প্রায়শ্চিত্ত রবীন্দ্র-রচনাবলীর নবম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি হইতে অনেকগুলি গানের মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ মুদ্রিত হইল, গ্রন্থে মুদ্রিত পাঠ হইতে সেগুলি অনেকাংশে পৃথক।—

৫০

নিভৃত প্রাণের পরম দেবতা
যেখানে বসেন একা
সেথাকার দ্বার খোলো হে ভকত,
লভিব তাঁহার দেখা।

শুনেছি কেবলি বাহিরের কথা,
শুনি নি গভীর গোপন বারতা,
নীরব নিবিড় সন্ধ্যাবেলার
আরতি হয় নি শেখা।
করুণা করিয়া বাহু ধরি মোর
আমারে দেখাও তবে—
পূজার থালায় জীবনপ্রদীপ
কেমনে সাজাতে হবে।
যেথা নিখিলের অমর সাধনা
মহাপূজালোক করিছে রচনা
সেথায় কেমনে রাখিয়া আসিব
একটি জ্যোতির রেখা।[১]

৫২

তুমি আমার আপন, তুমি
আছ আমার কাছে,
তোমার মাঝে মোর জীবনের
সব আনন্দ আছে—
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
আমায় দাও সুধাময় সুর,
আমার বাণী করো সুমধুর,
আমার প্রিয়তম তুমি, এই কথাটি
বলতে দাও হে বলতে দাও!
তোমার মধু ঢালো চিত্তে মম,
বাক্য করো সুধাসম,
তুমি আমার প্রিয়তম
এই কথাটি বলতে দাও।

১ এই রচনাটি সংশোধিত আকারে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতীর সেই সংখ্যায় নন্দলাল বসুর একখানি চিত্রও প্রকাশিত হয়, চিত্রটি দেখিয়া গানটি লিখিত, ভারতীতে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই নিখিল আকাশ নিখিল ধরা
তোমারি আনন্দে ভরা,
তুমিই আমার হৃদয়হরা
এই কথাটি বলতে দাও।
আমার দৈন্য বুঝেই ভালোবাস,
দুঃখ দেখেই কাছে আস,
ক্ষুদ্র জেনেই স্নেহে হাস,
এই কথাটি বলতে দাও।

৫৭

আজি বসন্ত আগত দ্বারে।
গোপনে রব না আমি
বৃথা ফিরাব না তারে।
খোলো রে হৃদয়দল খোলো,
ভোলো রে আপনারে ভোলো,
এই সংগীতমুখর আকাশে
গন্ধ বিকাশিয়া তোলো—
এই বাহির ভুবনে দিশাহারা
ছড়াও মাধুরী ভারে ভারে।
ওগো নিবিড় বেদনা বনমাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে,
গগনে কাহার পথ চাহি
ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে।
দখিন পবন কর হানে
বার বার কেন প্রাণে—
আজি সৌরভবিধুর বিভাবরী
কেন জাগে বিনিদ্র নয়ানে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, স্বামী,
তুমি নীরবে ডাকিছ কারে?

গীতিমাল্য

গীতিমাল্য ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গীতিমাল্যের অধিকাংশ গানের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল। তাঁহার পত্নী কমলা দেবীর সৌজন্যে উহা দেখিবার সুযোগ হইয়াছে, ও উহা অবলম্বনে গীতিমাল্যের কোনো কোনো গানের পাঠ ও রচনা-তারিখ সংশোধিত হইয়াছে।

গীতিমাল্যের প্রথম সংস্করণ হইতে 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে'র রচনা-স্থান Vale of Health, Hampstead, এবং রচনা-তারিখ জুলাই ১৯১২ মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। দিনেন্দ্রনাথের সংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত গানের খাতায় ইহার পাণ্ডুলিপি নাই। স্থান-তারিখের এই নির্দেশ যে ভ্রমাত্মক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে 508 W. High Street, Urbana, Illinois, U. S. A. হইতে ২৪ পৌষ ১৩১৯ [৮ জানুয়ারি ১৯১৩] তারিখে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত পত্রটি হইতে রচনার স্থান-তারিখ নির্দেশ করা সম্ভব হইল।—

> নরেন্দ্র সিংহকে কয়েক দিন হল তাঁর স্কুলের বাড়ির অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছি। আমার চিঠি পেয়ে যদি তিনি নিষ্কৃতি দেন তা হলে ভালোই, না যদি দেন তা হলে ঐ ভাঙা সম্পত্তিই প্রসন্নমনে শিরোধার্য করে নিতে হবে। লোকসান জিনিসটাকে মর্মের মধ্যে বিঁধিয়ে রক্ত বিষাক্ত করে তোলবার দরকার নেই— যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা এসেছে তাকে নিয়ে নাও এবং যতটুকু তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পার সেইটুকুই আদায় করে নাও। সংসারের এই-সমস্ত ছোটোখাটো লোকসানের কামড়গুলো পিঁপড়ে লাগার মতো— তারা অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু যদি তাদের লেগে থাকতে দাও তা হলে তারা সমস্তটাকে ক্ষয় করে ফেলে। অতএব ঝেড়ে ফেলে দাও। জীবনের অন্তরতর প্রসন্নতা স্কুলের ভাঙা বাড়ির চেয়ে ঢের বড়ো। আজ সকালে বসে খামকা একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা হল— ধাঁ করে লিখে ফেললুম। লেখা হয়ে গেলে তার পর চেতনা হল এটা আমারই জীবনের ইতিহাস— আমার জীবন-দেবতা হাস্যমুখে সেইটা লিপিবদ্ধ করেছেন। জীবনে কিরকম লাভের ব্যাবসাটা যে আমি ফেঁদেছি তিনি বিষয়ী লোকের কাছে সেইটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ, অনেক ঘোরাঘুরির পর শেষকালে নিঃসম্বল

খরিদ্দারদের কাছে বিনা মূল্যে কিরকম বিক্রিটা হল।—

'কে নিবি গো কিনে আমায় কে নিবি গো কিনে?'
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।

'রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে' গানটির তারিখ প্রথম সংস্করণে আছে '১৩১৫'। এই গানটি গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য দুই পাণ্ডুলিপিতেই কবির স্বহস্তে লিখিত আছে। গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিতে তারিখের নির্দেশ আছে '১৫ আশ্বিন নিশীথে'। গীতিমাল্যের পাণ্ডুলিপিতে তারিখ উল্লিখিত আছে '১৯১০'। তদনুসারে রচনার সাল ১৩১৭ হইবে।

গীতালি

গীতালি ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গীতালির 'আশীর্বাদ' ও ১-৬৭ সংখ্যক গানের পাণ্ডুলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ ও পরবর্তী গানগুলি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর -সংগ্রহ হইতে দেখিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা অবলম্বনে কোনো কোনো রচনার স্থান তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। কোনো কোনো রচনার মূল পাঠ মুদ্রিত পাঠ হইতে বহুলাংশে স্বতন্ত্র; মূল পাঠগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

২৩

কেন আর মিথ্যা আশা বারে বারে।
ওরে তোর সঙ্গে যে কেউ যাবে না রে।
এ তোমার রাত্রিশেষের ভোরের পাখি
তোমারেই একলা কেবল গেল ডাকি—
যা রে তুই বিজন পথে চলে যা রে।
ওদের ওই হৃদয়-কুঁড়ি শিশির-রাতে
বসে রয় চোখের জলের অপেক্ষাতে।
মেটাতে পারবে না যে আঁধার নিশা
তোমার এই ফোটা ফুলের আলোর তৃষা—
সে যে তাই চেয়ে আছে পুবের পারে।

৩০

তীরে কি আর আসবে না তোর তরী।
ঢেউ দেখে তুই মরিস ভয়ে
সেই লাজেতেই মরি।
চেয়ে ঝড়ের মেঘের পানে
শান্তি যে তোর নাই রে প্রাণে—
কাণ্ডারী তোর হাসছে বসে
ডান হাতে হাল ধরি।
মিথ্যা স্বপন তোর
এমনি করে জড়িয়েছে রে ঘুচল না তার ঘোর।

[পরবর্তী স্তবক অপরিবর্তিত]

৫১

খুশি হ তুই আপন মনে।
যেমন আছিস তেমনি থাকিস—
ফিরিস কিসের অন্বেষণে।
চাস নে কিছু, কোস নে কিছু,
চলিস নে আর কারো পিছু,
হৃদয়টি তোর থাক্-না ভরা
শূন্য ফুলের অলখ ধনে।
ওঠে পড়ে আঁধার আলো—
ঢেউ খেলে রে দিবানিশি
চার দিকে তোর মন্দ ভালো।

[পরবর্তী স্তবক অপরিবর্তিত]

৮২

এই-যে ব্যথা এল আমার দ্বারে
এরে আমি ফিরিয়ে দেব না রে।
জাগতে হবে সারা রাতি,

ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি
জ্বালিয়ে নিতে হবে বারে বারে।
আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
ধরার দুঃখ আমায় কেন ডাকে।
ওগো প্রলয়, ওগো রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নই তো ক্ষুদ্র,
ভয় যে আমি ভয় করি নে তারে।

৮৩

আমি পথিক, পথ যে আমার সাথি।
কয় সে কথা দিনের বেলা, গায় সে সকল রাতি।
কত যুগের রথের রেখা
বুকে তাহার আছে লেখা,
কত ক্লান্ত আশা ঘুমায়
ধুলায় আঁচল পাতি।
কবে বাহির হয়েছিলেম
কার আছে তা মনে।
যাত্রা আমার নূতন হল
প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
আমার আশা পথের আশা,
এই পথেরই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
চিরজীবন মাতি।

৮৪

বৃন্ত হতে ছিন্ন করে শুভ্র কমলগুলি
কে এনেছে তুলি।
তবু ওরা চায় যে মুখে সে নহে ভর্ৎসনায়,
শেষ নিমেষের পেয়ালা ভরে অম্লান সান্ত্বনায়,
মরণের অঙ্গনে এসে মাধুরীসংগীত বাজায় ক্লান্তি ভুলি
ঐ-যে কমলগুলি।

এরা তোমার নিমেষ-কালের নিবিড়নন্দন
নীরব চুম্বন—
আমার আঁখি-পল্লবেতে মিলায় মরি মরি
তোমারি সুগন্ধ-খাসে সকল বক্ষ ভরি।
হে কল্যাণলক্ষ্মী, এ যে আমার চিত্তে তব করুণ অঙ্গুলি,
ঐ-যে কমলগুলি।

৯৮

পথের সাথি নমি বারংবার,
পথিকজনের লহ নমস্কার।
ওহে বিদায়, ওহে ক্ষতি,
ধুলার 'পরে চরম নতি,
ক্লান্ত প্রাণের লহ নমস্কার।
ওহে মরণ, হে বিরতি,
ওহে দিনশেষের পতি,
ভাঙা বাসার লহ নমস্কার।
ওহে নব প্রভাতজ্যোতি,
ওহে চিরদিনের গতি,
নব আশার লহ নমস্কার।
জীবন রথের হে সারথি,
ওহে নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার।

স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও গীতালি রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রতিমা দেবীকে উৎসর্গীকৃত, এবং গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত 'আশীর্বাদ' কবিতাটি তাঁহাদের উদ্দেশেই রচিত। এই কবিতাটির মূল পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

আশীর্বাদ

আজ আমি তোমাদের সঁপিলাম তাঁরে—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।

জেগেছি অনেক রাত্রি ভেবেছি অনেক—
ক্ষণেক বা আশা হয়, আশঙ্কা ক্ষণেক।
হৃদয়ের তোলাপাড়া তুফানের ঢেউ—
মনে ভাবি আমি ছাড়া নাই বুঝি কেউ।
এমন করিয়া বল কাটে কত কাল,
মাঝি যে তাহারি হাতে ছেড়ে দিনু হাল।

[পরবর্তী ছয় ছত্র অপরিবর্তিত]

কবিতাটির আরো পরিবর্তনের বিষয় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবিরশ্মি'তে উল্লেখ করিয়াছেন। 'ক্ষণেক বা আশা হয় আশঙ্কা ক্ষণেক' ছত্র পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'সংসারে ক্ষণেক আশা, আশঙ্কা ক্ষণেক'; 'এমন করিয়া বল কাটে কত কাল' ছত্র পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'এ তরী আমারি বলে করেছিনু ভেবে'। এই ছত্র আরো পরিবর্তন করিয়া লিখিয়াছিলেন 'এ তরী আমারি বলে এত মরি ভেবে'। পরের ছত্রে 'হাল'এর পরিবর্তে 'এবে' লিখিয়াছিলেন। 'সংসারে ক্ষণেক আশা, আশঙ্কা ক্ষণেক' ছত্রের পরে যোগ করিয়াছিলেন—

সত্য ঢাকা পড়ে মোর ভয়ে ভাবনায়,
মিথ্যার মুরতি গড়ি ব্যর্থ বেদনায়।
বিশ্ব আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দেই ভরা—
মোর সৃষ্টি মায়া দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে গড়া।

সংযোজন

গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য ও গীতালি কাব্যের পাণ্ডুলিপি-পুস্তকে সমসাময়িক আরো কয়েকটি গানের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে কয়েকটি গান ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, কয়েকটি গান বিভিন্ন গানের সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও রবীন্দ্র-রচনাবলীর কোনো খণ্ডে এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। 'অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া' সংযোজন-বিভাগে সেগুলি মুদ্রিত হইল। রাজা নাটকের গানগুলিও এই পর্বের রচনা কিন্তু সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীতে একবার প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া পুনর্মুদ্রিত হইল না।

অচলায়তন

অচলায়তন ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (পোস্টমার্ক্: শান্তিনিকেতনে ১৪ জুলাই ১৯১১) লেখেন—

> শেষকালে নাটকটা প্রবাসীর কবলের মধ্যেই পড়ল। অনেক লোকের চক্ষে পড়বে এবং এই নিয়ে কাগজপত্রে বিস্তর মারামারি-কাটাকাটি চলবে এই আমার একটা মস্ত সান্ত্বনা।

এই অনুমান ব্যর্থ হয় নাই।

প্রবাসীতে নাটকটি প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আর্য্যাবর্ত্ত' মাসিক পত্রে (কার্তিক ১৩১৮) ইহার একটি সমালোচনা প্রকাশ করেন ; ইহাতে নাটকটির প্রশস্তি ও তিরস্কার দুইই ছিল। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার উত্তর দেন ; পত্রটি 'আর্য্যাবর্ত্তে' (অগ্রহায়ণ ১৩১৮) প্রকাশিত হয় ; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

> নিজের লেখা সম্বন্ধে কোনোপ্রকার ওকালতি করিতে যাওয়া ভদ্ররীতি নহে। সে রীতি আমি সাধারণত মানিয়া থাকি। কিন্তু আপনার মতো বিচারক যখন আমার কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করেন তখন প্রথার খাতিরে ঔদাসীন্যের ভান করা আমার দ্বারা হইয়া উঠে না।
>
> সাহিত্যের দিক দিয়া আপনি অচলায়তনের উপর যে রায় লিখিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপনার নিকট আমি কোনো আপিল রুজু করিব না। আপনি যে ডিগ্রী দিয়াছেন সে আমার যথেষ্ট হইয়াছে।
>
> কিন্তু ওই-যে একটা উদ্দেশ্যের কথা তুলিয়া আমার উপরে একটা মস্ত অপরাধ চাপাইয়াছেন সেটা আমি চুপচাপ করিয়া মানিয়া লইতে পারি না। কেবলমাত্র ঝোঁক দিয়া পড়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ দুই-তিন-রকম হইতে পারে। কোনো কাব্য বা নাটকের উদ্দেশ্যটা সাহিত্যিক বা অসাহিত্যিক তাহাও কোনো কোনো স্থলে ঝোঁকের দ্বারা সংশয়াপন্ন হইতে পারে। পাখি পিঞ্জরের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে ইহা কাব্যের কথা, কিন্তু পিঞ্জরের নিন্দা করিয়া খাঁচাওয়ালার প্রতি খোঁচা দেওয়া হইতেছে এমনভাবে সুর করিয়াও হয়তো পড়া যাইতে পারে। মুক্তির জন্য পাখির কাতরতাকে ব্যক্ত করিতে হইলে খাঁচার

কথাটা একেবারেই বাদ দিলে চলে না। পাখির বেদনাকে সত্য করিয়া দেখাইতে হইলে খাঁচার বদ্ধতা ও কঠিনতাকে পরিস্ফুট করিতেই হয়।

জগতের যেখানেই ধর্মকে অভিভূত করিয়া আচার আপনি বড়ো হইয়া উঠে সেখানেই মানুষের চিত্তকে সে রুদ্ধ করিয়া দেয়, এটা একটা বিশ্বজনীন সত্য। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই কাব্যের বিষয়, এবং আনুষঙ্গিক ভাবে শুষ্ক আচারের কদর্যতা স্বতই সেইসঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে।

ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন্য, গতি দিবার জন্যই, আচারের সৃষ্টি ; কিন্তু কালে কালে ধর্ম যখন সেই-সমস্ত আচারকে নিয়মসংযমকে অতিক্রম করিয়া বড়ো হইয়া উঠে, অথবা ধর্ম যখন সচল নদীর মতো আপনার ধারাকে অন্য পথে লইয়া যায়, তখন পূর্বতন নিয়মগুলি অচল হইয়া শুষ্ক নদীপথের মতো পড়িয়া থাকে— বস্তুত তখন তাহা তপ্ত মরুভূমি, তৃষাহরা তাপনাশিনী স্রোতস্বিনী সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই শুষ্ক পথটাকেই সনাতন বলিয়া সম্মান করিয়া নদীর ধারার সন্ধান যদি একেবারে পরিত্যাগ করা যায় তবে মানবাত্মাকে পিপাসিত করিয়া রাখা হয়। সেই পিপাসিত মানবাত্মার ক্রন্দন কি সাহিত্যে প্রকাশ করা হইবে না, পাছে পুরাতন নদীপথের প্রতি অনাদর দেখানো হয় ?

আপনি যাহা বলিয়াছেন সে কথা সত্য। সকল ধর্মসমাজেই এমন অনেক পুরাতন প্রথা সঞ্চিত হইতে থাকে যাহার ভিতর হইতে প্রাণ সরিয়া গিয়াছে। অথচ চিরকালের অভ্যাস-বশত মানুষ তাহাকেই প্রাণের সামগ্রী বলিয়া আঁকড়িয়া থাকে— তাহাতে কেবলমাত্র তাহার অভ্যাস তৃপ্ত হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের উপবাস ঘুচে না— এমনি করিয়া অবশেষে এমন একদিন আসে যখন ধর্মের প্রতিই তাহার অশ্রদ্ধা জন্মে— এ কথা ভুলিয়া যায় যাহাকে সে আশ্রয় করিয়াছিল তাহা ধর্মই নহে, ধর্মের পরিত্যক্ত আবর্জনা মাত্র।

এমন অবস্থায় সকল দেশেই সকল কালেই মানুষকে কেহ-না-কেহ শুনাইয়াছে যে, আচারই ধর্ম নহে, বাহ্যিকতায় অন্তরের ক্ষুধা মেটে না এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন। অভ্যাসের প্রতি আসক্ত মানুষ কোনো দিন এ কথা শুনিয়া খুশি হয় নাই এবং যে এমন কথা বলে তাহাকে পুরস্কৃত করে নাই— কিন্তু ভালো লাগুক আর না লাগুক এ কথা তাহাকে বারংবার শুনিতেই হইবে।

প্রত্যেক মানুষের একটা অহং আছে ; সেই অহং'এর আবরণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য সাধকমাত্রের একটা ব্যগ্রতা আছে। তাহার কারণ কী। তাহার

কারণ এই, মানুষের নিজের বিশেষত্ব যখন তাহার আপনাকেই ব্যক্ত করিতে থাকে, আপনার চেয়ে বড়োকে নহে, তখন সে আপনার অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে। আপনার অহংকার, আপনার স্বার্থ, আপনার সমস্ত রাগদ্বেষকে ভেদ করিয়া ভক্ত যখন আপনার সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে ভগবানের ইচ্ছাকে ও তাঁহার আনন্দকেই প্রকাশ করিতে থাকেন তখন তাঁহার মানবজীবন সার্থক হয়।

ধর্মসমাজেরও সেইরূপ একটা অহং আছে। তাহার অনেক রীতি-পদ্ধতি নিজেকেই চরমরূপে প্রকাশ করিতে থাকে। চিরন্তনকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের অহংকারকেই সে জয়ী করে। তখন তাহাকে পরাভূত করিতে না পারিলে সত্যধর্ম পীড়িত হয়। সেই পীড়া যে সাধক অনুভব করিয়াছে সে এমন গুরুকে খোঁজে যিনি এই-সমস্ত সামাজিক অহংকে অপসারিত করিয়া ধর্মের মুক্ত স্বরূপকে দেখাইয়া দিবেন। মানবসমাজে যখনই কোনো গুরু আসিয়াছেন তিনি এই কাজই করিয়াছেন।

আপনি প্রশ্ন করিয়াছেন, উপায় কী। 'শুধু আলো, শুধু প্রীতি' লইয়াই কি মানুষের পেট ভরিবে। অর্থাৎ আচার-অনুষ্ঠানের বাধা দূর করিলেই কি মানুষ কৃতার্থ হইবে। তাই যদি হইবে তবে ইতিহাসে কোথাও তাহার কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না কেন।

কিন্তু এরূপ প্রশ্ন কি অচলায়তনের লেখককে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হইয়াছে। অচলায়তনের গুরু কি ভাঙিবার কথাতেই শেষ করিয়াছেন। গড়িবার কথা বলেন নাই? পঞ্চক যখন তাড়াতাড়ি বন্ধন ছাড়াইয়া উধাও হইয়া যাইতে চাহিয়াছিল তখন তিনি কি বলেন নাই 'না, তা যাইতে পারিবে না— যেখানে ভাঙা হইল এইখানেই আবার প্রশস্ত করিয়া গড়িতে হইবে'? গুরুর আঘাত নষ্ট করিবার জন্য নহে, বড়ো করিবার জন্যই। তাঁহার উদ্দেশ্য ত্যাগ করা নহে, সার্থক করা। মানুষের স্থূল দেহ যখন মানুষের মনকে অভিভূত করে তখন সেই দেহগত রিপুকে আমরা নিন্দা করি, কিন্তু তাহা হইতে কি প্রমাণ হয় প্রেতত্ব লাভই মানুষের পূর্ণতা। স্থূল দেহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই দেহ মানুষের উচ্চতর সত্তার বিরোধী হইবে না, তাহার অনুগত হইবে, এ কথা বলার দ্বারা দেহকে নষ্ট করিতে বলা হয় না।

অচলায়তনে মন্ত্রমাত্রের প্রতি তীব্র শ্লেষ প্রকাশ করা হইয়াছে এ কথা কখনোই সত্য হইতে পারে না, যেহেতু মন্ত্রের সার্থকতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য মননে সাহায্য করা। ধ্যানের

বিষয়ের প্রতি মনকে অভিনিবিষ্ট করিবার উপায় মন্ত্র। আমাদের দেশে উপাসনার এই-যে আশ্চর্য পন্থা সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা ভারতবর্ষের বিশেষ মাহাত্ম্যের পরিচয়।

কিন্তু সেই মন্ত্রকে মনন-ব্যাপার হইতে যখন বাহিরে বিক্ষিপ্ত করা হয়, মন্ত্র যখন তাহার উদ্দেশ্যকে অভিভূত করিয়া নিজেই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাহার মতো মননের বাধা আর কী হইতে পারে। কতকগুলি বিশেষ শব্দসমষ্টির মধ্যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই বিশ্বাস যখন মানুষের মনকে পাইয়া বসে তখন সে আর সেই শব্দের উপরে উঠিতে চায় না। তখন মনন ঘুচিয়া গিয়া সে উচ্চারণের ফাঁদেই জড়াইয়া পড়ে। তখন চিত্তকে যাহা মুক্ত করিবে বলিয়াই রচিত তাহাই চিত্তকে বদ্ধ করে। এবং ক্রমে দাঁড়ায় এই, মন্ত্র পড়িয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করা, মন্ত্র পড়িয়া শত্রু জয় করা ইত্যাদি নানাপ্রকার নিরর্থক দুশ্চেষ্টায় মানুষের মূঢ় মন প্রলুব্ধ হইয়া ঘুরিতে থাকে। এইরূপে মন্ত্রই যখন মননের স্থান অধিকার করিয়া বসে তখন মানুষের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শুষ্ক জিনিস আর কী হইতে পারে। যেখানে মন্ত্রের এরূপ ভ্রষ্টতা সেখানে মানুষের দুর্গতি আছেই। সেই-সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন-জাল হইতে মানুষ আপনাকে উদ্ধার করিয়া ভক্তির সজীবতা ও সরসতা -লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, ইতিহাসে বারংবার ইহার প্রমাণ দেখা গিয়াছে। যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্র যখনই অত্যন্ত প্রবল হইয়া মানুষের মনকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে তখনই তো মানবের গুরু মানবের হৃদয়ের দাবি মিটাইবার জন্য দেখা দেন; তিনি বলেন, পাথরের টুকরা দিয়া রুটির টুকরার কাজ চালানো যায় না, বাহ্য অনুষ্ঠানকে দিয়া অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলে না যে, মন্ত্র যেখানে মননের সহায়, বাহিরের অনুষ্ঠান যেখানে অন্তরের ভাবস্ফূর্তির অনুগত, সেখানে তাহা নিন্দনীয়। ভাব তো রূপকে কামনা করে, কিন্তু রূপ যদি ভাবকে মারিয়া একলা রাজত্ব করিতে চায় তবে বিধাতার দণ্ডবিধি -অনুসারে তাহার কপালে মৃত্যু আছেই। কেননা, সে যত দিনই বাঁচিবে তত দিনই কেবলই মানুষের মনকে মারিতে থাকিবে। ভাবের পক্ষে রূপের প্রয়োজন আছে বলিয়াই রূপের মধ্যে লেশমাত্র অসতীত্ব এমন নিদারুণ। যেখানেই সে নিজেকে প্রবল করিতে চাহিবে সেইখানেই সে নির্লজ্জ, সে অকল্যাণের আকর। কেননা, ভাব যে রূপকে টানিয়া আনে সে যে প্রেমের টান, আনন্দের— রূপ যখন সেই ভাবকে চাপা দেয় তখন সে সেই প্রেমকে আঘাত করে, আনন্দকে আচ্ছন্ন

করে— সেইজন্য যাহারা ভাবের ভক্ত তাহারা রূপের এইরূপ ভ্রষ্টাচার একেবারে সহিতে পারে না। কিন্তু রূপে তাহাদের পরমানন্দ, যখন ভাবের সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন দেখে। কিন্তু শুধু রূপের দাসখত মানুষের সকলের অধম দুর্গতি। যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহারা মানুষকে এই দুর্গতি হইতেই উদ্ধার করিতে আসেন। তাই অচলায়তনে এই আশার কথাই বলা হইয়াছে যে, যিনি গুরু তিনি সমস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া চুরিয়া দিয়া একটা শূন্যতা বিস্তার করিবার জন্য আসিতেছেন না; তিনি স্বভাবকে জাগাইবেন, অভাবকে ঘুচাইবেন, বিরুদ্ধকে মিলাইবেন; যেখানে অভ্যাসমাত্র আছে সেখানে লক্ষ্যকে উপস্থিত করিবেন, এবং যেখানে তপ্ত বালু-বিছানো খাদ পড়িয়া আছে মাত্র সেখানে প্রাণপরিপূর্ণ রসের ধারাকে বহাইয়া দিবেন। এ কথা কেবল যে আমাদেরই দেশের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে; ইহা সকল দেশেই সকল মানুষেরই কথা। অবশ্য এই সর্বজনীন সত্য অচলায়তনে ভারতবর্ষীয় রূপ ধারণ করিয়াছে; তাহা যদি না করিত তবে উহা অপাঠ্য হইত।

মনে করিয়াছিলাম সংক্ষেপে বলিব। কিন্তু 'নিজের কথা পাঁচ কাহন' হইয়া পড়ে; বিশেষত শ্রোতা যদি সহৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ হন। ইতিপূর্বেও আপনার প্রতি জুলুম করিয়া সাহস বাড়িয়া গেছে; এবারেও প্রশ্রয় পাইব এ ভরসা মনে আছে। ইতি ৩রা অগ্রহায়ণ ১৩১৮, শান্তিনিকেতন

আর্য্যাবর্ত্তের যে সংখ্যাতে (অগ্রহায়ণ ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যুত্তর মুদ্রিত হয় সেই সংখ্যাতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোয়ারা' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে, পূর্বসংখ্যা আর্য্যাবর্ত্তে প্রকাশিত তাঁহার অচলায়তন-আলোচনার ও রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্রের আলোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্রোত্তরে লেখেন—

আমার লেখা পড়িয়া অনেকে বিচলিত হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাম; আমি শীতলভোগের বরাদ্দ আশাও করি নাই। অচলায়তন লেখায় যদি কোনো চঞ্চলতাই না আনে তবে উহা বৃথা লেখা হইয়াছে বলিয়া জানিব। সংস্কারের জড়তাকে আঘাত করিব, অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে নিষ্ফলতা। অবস্থাবিশেষে ক্রোধের উত্তেজনাই সত্যকে স্বীকার করিবার প্রথম লক্ষণ, এবং বিরোধই সত্যকে গ্রহণ করিবার আরম্ভ। যদি কেহ এমন অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বলেন ও বিশ্বাস করেন যে, জগতের মধ্যে

কেবল আমাদের দেশেই ধর্মে ও সমাজে কোথাও কোনো কৃত্রিমতা ও বিকৃতি নাই, অথচ বাহিরে দুর্গতি আছে, তবে সত্যের সংঘাত তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে না, তিনি সত্যকে আপনার শত্রু বলিয়া গণ্য করিবেন। তাঁহাদের মন রক্ষা করিয়া যে চলিবে হয় তাহাকে মূঢ় নয় তাহাকে ভীরু হইতে হইবে। নিজের দেশের আদর্শকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ভালোবাসিবে সে'ই তাহার বিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাত করিবে, ইহাই শ্রেয়স্কর। ভালোমন্দ সমস্তকেই সমান নির্বিচারে সর্বাঙ্গে মাখিয়া নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকাকেই প্রেমের পরিচয় বলিতে পারি না। দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে শক্তিকে ধর্মকে চারি দিকে আবদ্ধ করিয়াছে ; সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এ দেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে— সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে, এবং বাহিরের সকল আঘাতের সম্বন্ধেই তাহাকে এমন একান্তভাবে অসহায় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বেদনা কি প্রকাশ করিব না। কেবল মিথ্যা কথা বলিব এবং সেই বেদনার কারণকে দিনরাত্রি প্রশ্রয় দিতেই থাকিব? অন্তরে যে-সকল মর্মান্তিক বন্ধন আছে বাহিরের শৃঙ্খল তাহারই স্থূল প্রকাশ মাত্র। অন্তরের সেই পাপগুলাকে কেবলই বাপু বাছা বলিয়া নাচাইব, আর ধিক্কার দিবার বেলায় ঐ বাহিরের শিকলটাই আছে? আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে। যত লড়াই ঐ শাস্তির সঙ্গে? আর, যত মমতা ঐ পাপের প্রতি? তবে কি এই কথাই সত্য যে আমাদের কোথাও পাপ নাই, আমরা বিধাতার অন্যায় বহন করিতেছি? যদি তাহা সত্য না হয়, যদি পাপ থাকে, তবে সে পাপের বেদনা আমাদের সাহিত্যে কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি যে, সমস্ত অপরাধ বাহিরের দিকেই। আপনার মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু আছে, যেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা করিতেছে, সেদিকে কেবলই আমরা মিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি, আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত-দেশ-ব্যাপী এই বন্দীশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই— এই পাষাণ-প্রাচীরের চারি দিকেই তাহার মাথা

ঠেকিয়া সে কোনো আশার পথ দেখিতেছে না। বাস রে! এমন নীরন্ধ্র বেষ্টন, এমন আশ্চর্য পাকা গাঁথনি! বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু শ্রেয় আছে কি। চারি দিকে তাকাইয়া শ্রেয় কোন্‌খানে দেখা যাইতেছে জিজ্ঞাসা করি। ঘরে বাহিরে কোথায় সে আছে। অচলায়তনে আমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে। ইতিহাসে সর্বত্রই কৃত্রিমতার জাল যখন জটিলতম দৃঢ়তম হইয়াছে তখন গুরু আসিয়া তাহা ছেদন করিয়াছেন। আমাদেরও গুরু আসিতেছেন। দ্বার রুদ্ধ, পথ দুর্গম, বেড়া বিস্তর, তবু তিনি আসিতেছেন। তাঁহাকে আমরা স্বীকার করিব না, বাধা দিব, মারিব; তবু তিনি আসিতেছেন ইহা নিশ্চিত। দোহাই আপনাদের, মনে করিবেন না, অচলায়তনে আমি গালি দিয়াছি বা উপদেশ দিয়াছি। আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় শিকল নাড়া দিয়াছি; সে শিকল আমার, এবং সে শিকল সকলের। নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে। বাজিবে না তো কী! শিকল যে শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়া হউক জানাইতেই হইবে। যে নিজে অনুভব করিতেছে সে অনুভব না করাইয়া বাঁচিবে কী করিয়া। ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরস্ত হইতে পারিব না। গালিকেই আমার চেষ্টার সার্থকতা মনে করিয়া আমি মাথায় করিয়া লইব, আর-কোনো পুরস্কার চাই না। ইতি ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩১৮

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই চিঠিগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহপূর্বক এগুলি আমাদের ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

অধ্যাপক এড্‌ওআর্ড্‌ টমসন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে অচলায়তনে কোনো কোনো ইংরেজি গ্রন্থের ছায়া আছে, এইরূপ উক্তি[১] করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি চিঠিতে (৩ আষাঢ় ১৩৩৪) রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লেখেন—

> Castle of Indolence এবং Faerie Queen আমি পড়ি নি—Princessএর সঙ্গে অচলায়তনের সুদূরতম সাদৃশ্য আছে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের নিজেদের দেশে মঠ-মন্দিরের অভাব নেই— আকৃতি ও প্রকৃতিতে অচলায়তনের সঙ্গে তাহাদেরই মিল আছে।

১ Its fable was probably suggested by *The Princess*, and, more remotely, *The Castle of Indolence* and *The Faerie Queen*— Edward Thompson in RABINDRANATH TAGORE: POET AND DRAMATIST, p. 225.

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে অচলায়তন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

যে বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে। যে বোধে আমাদের মুক্তি 'দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'— দুঃখের দুর্গম পথ দিয়ে সে তার জয়ভেরী বাজিয়ে আসে— আতঙ্কে সে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে তোলে। তাকে শত্রু বলেই মনে করি ; তার সঙ্গে লড়াই করে তবে তাকে স্বীকার করতে হয়। কেননা, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে। তোমাকে কে মান্‌বে।

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন।

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করলে— সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।···

মহাপঞ্চক। আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না, আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পুজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

আমি তো মনে করি আজ য়ুরোপে যে যুদ্ধ বেধেছে সে ঐ গুরু এসেছেন বলে। তাঁকে অনেক দিনের টাকার প্রাচীর, মানের প্রাচীর, অহংকারের প্রাচীর ভাঙতে হচ্ছে। তিনি আসবেন বলে কেউ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তিনি যে সমারোহ করে আসবেন, তার জন্যে আয়োজন অনেক দিন থেকে চলছিল।

—সবুজ পত্র। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

ডাকঘর

ডাকঘর ১৩১৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অচলায়তন গ্রন্থাকারে ডাকঘরের পরে প্রকাশিত হয়; কিন্তু ডাকঘর রচনার পূর্বে অচলায়তন লিখিত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এইজন্য রচনাবলীতে উহা ডাকঘরের পূর্বে মুদ্রিত হইয়াছে।

দুই বোন

দুই বোন ১৩৩৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিচিত্রা মাসিক পত্রে (১৩৩৯ অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন) উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

দুই বোন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র বিচিত্রায় (শ্রাবণ ১৩৪০) মুদ্রিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা সংকলিত হইল—

> তুমি লিখেছ তোমার বান্ধবী আমার কল্পিত 'দুই বোন' এর ভাগ্যবিভ্রাটের যত দোষ চাপিয়েছেন শশাঙ্কের ঘাড়ে। তিনি লক্ষ্য করেন নি যে দোষটা প্রকৃতি মায়াবিনীর। মানুষের চলবার বাঁধা রাস্তায় সেই নিষ্ঠুর চোরা-ফাঁদ পেতে রাখে, অসন্দিগ্ধমনে চলতে চলতে হঠাৎ পথিক এমন জায়গায় পা ফেলে যেখানটাতে ঢাকা গর্ত। শশাঙ্কের সংসারযাত্রার রাস্তাটা দেখতে ছিল মজবুত, কিন্তু শশাঙ্কের চলনের পক্ষে ছিল পিছল। হতভাগা ঘাড়মোড় ভেঙে পড়বার পূর্বে সে কথাটা তার আপনার কাছেও যথেষ্ট গোচর হয় নি। দিনগুলো চলছিল ভালোই, কিন্তু যে সাঁকো বেয়ে চলছিল তার বাঁধনে ছিল ফাঁক। কেননা, শশাঙ্কে শর্মিলায় ভিতরে ভিতরে জোড় মেলে নি, অথচ ফাটলটা উপর থেকে ধরা পড়ে নি চোখে। হঠাৎ বাইরে থেকে মড়্‌মড়্‌ করে চাড় লাগবার আগে সে কথা কি ওরা কেউ জানতে পেরেছিল। যখন জানা গেছে তখন তো কপাল ভেঙেছে। পরামর্শদাতা বলবে ফাটা কপালে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ভালোমানুষের মতো সেই সাবেক রাস্তায় উঁছোট খেতে খেতে লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে চলা কর্তব্য। শশাঙ্ক সেইভাবেই চলত। কিন্তু শর্মিলা বলে বসল তেমন চলায় কোনো পক্ষেই সুখ নেই। স্পর্ধাপূর্বক আপন বিশেষ প্ল্যান অনুসারে ভাগ্যকে সংশোধন করবার প্রস্তাব জানালে। কিন্তু ভাগ্যলিপির উপরে কলম চালানো এত সহজ নয়। সে কথাটা বুঝেছিল ঊর্মিমালা। ভূমিকাম্পনিক কেন্দ্রের উপরে কাঁচা

মাল-মসলায় তৈরি নড়নড়ে বাসায় আশ্রয় নিতে সে নারাজ। তাই সে দিলে দৌড়। তার পরে কী ঘটল তা কে বলবে? কালক্রমে উপরকার কাটার দাগটা হয়তো মিলিয়ে গেল, কিন্তু মাঝে মাঝে নাড়া খেয়ে ভিতরকার ছেঁড়া স্নায়ুর ব্যথাটা কি আজও টন্‌টনিয়ে ওঠে না। ব্যথা যারা পায় তাদেরই উপরে আমরা জজিয়তি করি, কিন্তু ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি সব সময়ে তারাই নিজে? বজ্রাঘাতে ম'ল মানুষটা, তুমি বললে কিনা পূর্বজন্মের পাপের ফল। ওটাতে কেবল দোষ দেবার অন্ধ ইচ্ছারই প্রমাণ হয়, দোষের প্রমাণ হয় না।

তুমি লিখেছ তোমার বান্ধবী আমার গল্পটার সব কটি পাত্রের 'পরেই বিমুখ। সংখ্যা অতি অল্প, তিনটিমাত্র প্রাণী, তবু তারা একজনও তাঁর মনের মতো নয়। তা নিয়ে দুঃখিত হবার কারণ নেই। কেননা, অভিব্যক্তিতত্ত্বের প্রাকৃতিক নির্বাচনপ্রণালী সাহিত্যে এবং সমাজে একই নয়। সমাজে যাদের আমরা বন্ধুর কোঠায় গণ্য করি নে সাহিত্যে তারা সমাদর পেয়েছে, এ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। আদর্শ মানবচরিত্রের মাপে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা-বিচার বাংলা-দেশের সমালোচক-শ্রেণী ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। মনে আছে এমন তর্ক একদা প্রায়ই শোনা যেত যে, আদর্শ সতী নারী হিসাবে ভ্রমর এবং সূর্যমুখীর চরিত্রে আধরতি পরিমাণে শ্রেষ্ঠতার তারতম্য কোন্ কথা কোন্ ভঙ্গিটুকু নিয়ে। অল্প বয়স সত্ত্বেও মনে আক্ষেপ হত যে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং ইত্যাদি। সাহিত্য যে শ্রেয়স্তত্ত্বের নিখুঁত ছাঁচে ঢালাই করা পুতুল গড়বার কারখানা নয় এ কথাও কি বোঝাতে হবে। ম্যাক্‌বেথ নাটকে দুটি-মাত্র প্রধান পাত্র, ম্যাক্‌বেথ ও লেডি ম্যাক্‌বেথ। বলা বাহুল্য, দুজনের কাউকেই সুকুমারমতি পাঠকদের চরিত্রগঠনযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা চলবে না। অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড্ ক্লিয়োপ্যাট্রা শেক্‌সপীয়রের প্রধান নাটকের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ক্লিয়োপ্যাট্রা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যাদের মধ্যে স্থান পাবার অধি-কারিণী হলেও তাকে সাধ্বীর আদর্শ বলা চলবে না। আর, অ্যাণ্টনি আপন চরিত্রের অনিন্দ্য আদর্শে আধুনিক উচ্চ দরের বাংলা নভেলের নায়কদের সমশ্রেণীভুক্ত নয়, এ কথা মানতেই হবে। তথাপি এও না মেনে চলবে না যে, শেক্‌সপীয়রের নাটকটি উঁচুদরের বাংলা নভেলের চেয়ে অন্তত কোনো অংশে হীন নয়। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্রকে তুচ্ছ করতে পারি নে, কিন্তু মহত্ত্বে তাঁর ন্যূনতা ছিল। কারই বা না ছিল? স্বয়ম্বরসভার ব্যাপারে ভীষ্মই কি ক্ষমার যোগ্য। এমন-কি, কবির প্রিয়পাত্র পাণ্ডবদের আচরণে কলঙ্ক খুঁজে বের করবার জন্যে

অধিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আধুনিক বাংলাদেশে বেদব্যাস জন্মান নি, সে তাঁর পুণ্যফলে।

অপর পক্ষ থেকে তর্ক করতে পারেন যে, সাহিত্যে সমাজধর্ম ও শাশ্বত-ধর্মের ত্রুটি দেখা দেয়, তার শোকাবহ পরিণাম প্রমাণ করবার জন্যেই। অর্থাৎ, এইটুকু দেখাবার জন্যে যে স্খলনের পথ আরামের পথ নয়। কিন্তু দেখতে পাই, আজকাল তাতেও ভালোমানুষ লোকের ক্ষোভ-শান্তি হয় না। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ বা বিমলা গৌরবজনক সিদ্ধিলাভ করে নি, কিন্তু তবু লেখক সেদিন সমালোচকের দরবারে দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলেন না। তারস্বরে ফরমাশ এই যে, যেমন করেই হোক, শ্রেষ্ঠ আদর্শ রচনা করতেই হবে। ছেলেমানুষি আবদার একেই বলে, যে চায় লালায়িত রসনা দিয়ে কেবলই চিনির পুতুল লেহন করতে।

'দুই বোন' গল্পটা সম্বন্ধে আমার নিজের ব্যাখ্যা কিছু শুনতে চেয়েছ। গল্পের ভূমিকাতেই ভিতরের কথাটা ফাঁস করে দিয়েছি। সাধারণত মেয়েরা পুরুষের সম্বন্ধে কেউ বা মা, কেউ বা প্রিয়া, কেউ বা দুইয়ের মিশোল। বাংলা-দেশে অনেক পুরুষ আছে যারা বৃদ্ধবয়স পর্যন্তই মাতৃ-অঙ্কের আবহাওয়ায় সুরক্ষিত। তারা স্ত্রীর কাছে মায়ের লালনটাই উপভোগ্য বলে জানে। বিবাহে যাবার আগে বর বলে যায়, মা, তোমার দাসী আনতে যাচ্ছি। অর্থাৎ স্ত্রী আসে মায়ের পরিশিষ্ট হয়ে— Alma Mater-এর পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রীর মতোই। ছেলে মায়ের কাছ থেকে আশৈশব যে-সকল সেবায় অভ্যস্ত বধূ এসে তারই অনুবৃত্তিতে দীক্ষিত হয়। অল্প স্ত্রীই এমন সুযোগ পায় যাতে নিজের স্বতন্ত্র রীতিতেই স্বামীর পূর্ণতা সাধন করতে পারে, সংসারকে সম্পূর্ণ আপন প্রতিভায় নূতন করে তোলে।

আবার এমন পুরুষও নিশ্চয়ই আছে যারা আর্দ্র আদরের আবেশে আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন থাকতে ভালোই বাসে না। তারা স্ত্রীকে চায় স্ত্রীরূপেই, তারা চায় যুগলের অনুসঙ্গ। তারা জানে স্ত্রী যেখানে যথার্থ স্ত্রী, পুরুষ সেখানেই যথার্থ পৌরুষের অবকাশ পায়। নইলে তাকে লালনরসলালায়িত শিশুগিরি করতে হয়। মায়ের দাসীকে নিয়ে থাকার মতো এমন দৌর্বল্য পুরুষের জীবনে আর কিছু নেই।

শশাঙ্ক স্ত্রীর মধ্যে নিত্যস্নেহসতর্ক মাকে পেয়েছিল। তাই তার অন্তর ছিল অপরিতৃপ্ত। এমন অবস্থায় ঊর্মি তার কক্ষপথে এসে পড়াতে সংঘাত

লাগল, ট্র্যাজেডি ঘটল। অপর পক্ষে অতিনির্ভরলোলুপ মেয়ে সংসারে অনেক আছে। তারা এমন পুরুষকে চায় যারা হবে তাদের প্রাণযাত্রার মোটর-রথের শোফার। তারা চায় পতিগুরুকে, পদধূলির কাঙালিনী তারা। কিন্তু তার বিপরীতজাতীয় মেয়েও নিশ্চয় আছে যারা অতিলালন-অসহিষ্ণু প্রকৃত পুরুষকেই চায় যাকে পেলে তার নারীত্ব প্রতিপূর্ণ হয়। দৈবক্রমে ঊর্মি সেই জাতের। শুরুতেই চালককে নিয়ে, গুরুকে নিয়ে, তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে সে এমন পুরুষকে পেলে যার চিত্ত নিজের অজ্ঞাতসারে খুঁজছিল স্ত্রীকেই। যার সঙ্গে তার লীলা সম্ভব আপন জীবনের সমভূমিতেই, যে তার যথার্থ জুড়ি।

ভাগ্যের অঘটন শোধরাতে গিয়ে সামাজিক অঘটন দারুণ হয়ে উঠল—এই হচ্ছে ব্যাপারটা। উপসংহারে বলে রাখি, সব মেয়ের মধ্যেই মা আছে, প্রিয়া আছে। কোন্‌টা মুখ্য কোন্‌টা গৌণ, কোন্‌টা এগিয়ে আছে কোন্‌টা পিছিয়ে, তাই নিয়েই তাদের স্বাতন্ত্র্য। ২৭ মার্চ ১৯৩৩

স্বদেশ

স্বদেশ ১৩১৫ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর দ্বাদশ ভাগ রূপে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে 'নূতন ও পুরাতন' 'নববর্ষ' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' 'দেশীয় রাজ্য' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' 'ব্রাহ্মণ' 'সমাজভেদ' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' এই কয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছিল। 'নূতন ও পুরাতন' 'সমাজভেদ' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' ব্যতীত স্বদেশের অন্যান্য প্রবন্ধ রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ইতিপূর্বেই অন্য গ্রন্থের (আত্মশক্তি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড। ভারতবর্ষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড) অন্তর্গত হইয়াছে, এইজন্য পুনর্মুদ্রিত হইল না।

'নূতন ও পুরাতন' প্রবন্ধটি 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র প্রথম খণ্ডের (বৈশাখ ১২৯৮) প্রথম অংশ। 'সমাজভেদ' ও 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বর্ণানুক্রমিক সূচী